বাঁধা পথের বাঁধন ছেড়ে

রবীন চক্রবর্তী

বাঁধা পথের বাঁধন ছেড়ে

বাঁধা পথের বাঁধন ছেড়ে

রবীন চক্রবর্তী

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড

ভূমিকা

উত্তরপ্রদেশের কানপুর শহর সংলগ্ন আরমাপুর নামে যে জায়গায় আমার শৈশব এবং কৈশোর কেটেছে তা ছিল এক ছোট্ট ভারতবর্ষ। প্রতিরক্ষা বিভাগের চাকরিসূত্রে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে এখানে এসে হাজির হয়েছিলেন নানা জাতির, নানা ধর্মের, নানা ভাষাভাষী মানুষ। সরকারি আবাসনের যে-কোনও পাড়াতেই খুঁজে পাওয়া যেত দাস, ঘোষ, রাও, পিল্লাই, মহাপাত্র, সিং, আনসারি, ত্রিপাঠী বা চোপড়া পদবিধারী পরিবারদের। আরমাপুর থেকে একটু দূরে গেলেই সবুজ কৃষিজমিতে ঘেরা একের পর এক গ্রাম। কাছেপিঠের ঝিলে শীতকালে এসে উপস্থিত হত পরিযায়ী বিহঙ্গের দল। সম্ভবত এই পটভূমিকায় বেড়ে ওঠার ফলেই মানুষ এবং প্রকৃতি আমার আকর্ষণের বিষয় হয়ে ওঠে।

পরবর্তীকালে যখন কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র ছিলাম তখন থেকেই আরম্ভ হল আমার ঘুরে বেড়ানো। তৎকালীন কলেজ অধ্যক্ষ শ্রী অমৃতলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি পরিচয়পত্র সম্বল করে একা একাই ঘুরে বেড়িয়েছিলাম উত্তর ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে। খরচ বাঁচাতে মাথা খাটিয়ে কতরকম পন্থাই না অবলম্বন করতে হয়েছিল। ট্রাকচালকের পাশে বসে পাড়ি দিয়েছি দীর্ঘপথ। রাত কাটিয়েছি পথ সংলগ্ন ধাবার ছারপোকা ভরা খাটিয়াতে, যার ভাড়া ছিল এক টাকা।

চাকরিজীবনে প্রবেশ করে কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে বেড়াবার দল গড়লাম। সবাই 'ভ্রমণ পাগল'। বেশ ভালোই ঘোরাঘুরি চলছিল। যথাসময়ে 'পাগল'রা একে একে গার্হস্থ্যজীবনে প্রবেশ করে সুস্থ হয়ে উঠল। আমার মধ্যে কিন্তু পাগলামি কমার কোনও লক্ষণ দেখা দিল না। নানারকম কৌশল করে অফিস থেকে ছুটি নিয়ে আর মিষ্টবাক্য এবং নানাবিধ উৎকোচের সাহায্যে গিন্নিকে সন্তুষ্ট করে আমার ভ্রমণ চলতেই থাকল। এইভাবেই একসময় খুঁজে পেলাম ভারতের দুই প্রান্তে একান্তে পড়ে থাকা দুই স্বর্গলোক; উত্তর-পূর্ব ভারত এবং লাদাখ। প্রথমবার অপার বৈচিত্রে ভরা উত্তর-পূর্বের কয়েকটি রাজ্য ঘুরে এমনই প্রভাবিত হলাম যে প্রবল উৎসাহ নিয়ে কলম ধরলাম নিজের ভ্রমণ-অভিজ্ঞতাকে ভ্রমণরসিকদের শোনাব বলে। লিখে ফেললাম 'জম্পুই থেকে অচেনা পথে আইজল' শীর্ষক এক ভ্রমণবৃত্তান্ত, যা প্রকাশিত হল 'ভ্রমণ' পত্রিকার জুন, ২০০৩ সংখ্যায়। আরম্ভ হল আমার পর্যটক-জীবনের নতুন অধ্যায়।

এই অধ্যায়ের সার কথাটি হল বাঁধা পথের বাঁধন ছেড়ে একটু অন্য পথে, অন্য ভাবে বেড়ানো এবং সেই ভ্রমণ অভিজ্ঞতার কথা লেখার মাধ্যমে ভ্রমণ-অনুরাগী পাঠকদের কাছে পরিবেশন করা।

এমনই কিছু নির্বাচিত ভ্রমণকাহিনী বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়ে আমাকে বিরল সম্মানে ভূষিত করেছেন স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী। এই বইটি ভ্রমণপ্রিয় মানুষদের ভালো লাগলে আনন্দ পাব।

২৯-১২-২০০৬

রবীন চক্রবর্তী
সুরপাড়া, চন্দননগর

আমার বাবা
৺রণদাচরণ চক্রবর্তীকে
যাঁর উৎসাহই
আমার লেখার প্রেরণা

সূচিপত্র

জম্পুই থেকে অচেনা পথে আইজল

ত্রিপুরা ভ্রমণের শেষ পর্যায়ে জম্পুই পাহাড়ে এসে হাজির হলাম। ত্রিপুরার একমাত্র শৈলাবাস, চিরবসন্তের দেশ জম্পুই আগরতলা থেকে ২২৫ কিলোমিটার দূরে, গড় উচ্চতা তিন হাজার ফুট। ছোট টিলার ওপর নির্মিত ইডেন ট্যুরিস্ট লজে থাকার অভিজ্ঞতা ভোলবার নয়। সবচেয়ে ভালো সময় কাটবে লজের ছাদে চেয়ার নিয়ে বসলে। সামনেই দিগন্তবিস্তৃত মিজো পাহাড়।

জম্পুই পাহাড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বেশ কিছু লুসাই গ্রাম। লুসাইরা প্রধানত মিজোরামের অধিবাসী। ধর্মে খ্রিস্টান লুসাইদের মধ্যে শিক্ষিতের হার শতকরা পঁচানব্বই। জম্পুই পাহাড় কমলালেবুর জন্য বিখ্যাত। প্রায় প্রতিটি গ্রামেই কমলালেবুর বাগান রয়েছে। এখন নভেম্বর মাসের শেষেও গাছে গাছে কমলালেবু ঝুলছে। দাম ওঠানামা করে। এখন দর চলছে পঞ্চাশটা লেবুর দাম একশো টাকা।

আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থল মিজোরামের রাজধানী আইজল। জম্পুই থেকে আইজল যাবার পথ শিলচর হয়ে। অর্থাৎ অনেকটা ঘোরা পথে ৪২৮ কিলোমিটার দূরত্ব পাড়ি দিতে হবে। অথচ ম্যাপ দেখে বোঝা যাচ্ছে জম্পুই থেকে আইজলের ভৌগোলিক অবস্থান খুব একটা দূরে নয়। আমাদের লজের ম্যানেজার নিখিল চাকমা ভ্রমণসূচির কথা শুনে বললেন, শীতের সময় লুসাইদের ভাংমুন গ্রাম থেকে ভোরবেলায় দুয়েকটা টাটা সুমো আইজলের দিকে যাত্রা করে সন্ধের আগেই পৌঁছে যায়, তবে রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ। খবরটা শোনামাত্র আমি আর কল্যাণ চক্রবর্তী ছুটলাম টাটা সুমোর সিট রিজার্ভ করতে। গাড়ির মালিক জানালেন, আজ সন্ধের মধ্যে যদি আইজল থেকে গাড়ি এসে পৌঁছয় তবেই আগামীকাল ভোরে গাড়ি ছাড়বে। কী আর করা! মাথাপিছু তিনশো টাকা দিয়ে দুটো সিট বুক করাই যুক্তিযুক্ত মনে করলাম। ঠিক হল গাড়ি এলেই ইডেন লজে ফোন করে আমাদের জানিয়ে দেওয়া হবে।

হাতে সময় থাকায় ভাংমুন গ্রামটিকে দেখতে বেরোলাম। বেশ বড় গ্রাম। স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সরকারি দপ্তর, দোকান-হাট নিয়ে ছোট শহর বলেই মনে হয়। ক্যাথলিক

চার্চের নির্মাণশৈলী দেখে মুগ্ধ হতেই হবে। স্থানীয় মানুষদের বিশেষ করে কমবয়সী ছেলেমেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদ, আচরণে পাশ্চাত্য প্রভাব চোখে পড়ে। গ্রামের ঘরগুলি বাঁশ ও কাঠ দিয়ে তৈরি। ছাদ টিনের। জম্পুই পাহাড়ের গ্রামগুলিতে জলের সমস্যা বড় প্রবল। সমস্যার আংশিক সমাধানের জন্য প্রায় সব বাড়িতেই বৃষ্টির জল ধরে রাখার ব্যবস্থা করা আছে। বাসস্থান ছোট হলেও যত্ন করে সাজানো। প্রতিটি বাড়ির সামনেই ফুলের বাগান। যার সে সুযোগ নেই সে বারান্দায় টব ঝুলিয়ে ফুল ফোটাচ্ছে। আর এক মাস পরে বড়দিন, তাই অনেক বাড়িতেই নতুন করে রং লাগানো হচ্ছে। স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সমস্যায় পড়া গেল। হিন্দি-ইংরিজি-বাংলা অচল, শুধু মিজো ভাষাই সম্বল। চায়ের সন্ধানে এক দোকানে ঢুকে দেখি সেখানে এক ছাদের নিচে মুদিখানা, চায়ের দোকান, পানের দোকান, কাঁচাবাজার। স্বামী-স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা মিলে দিব্যি সামাল দিচ্ছে। ঘরের একপাশে ডাঁই করা কমলালেবু। এই লেবু যাবে আগরতলা, শিলচরে। স্থানীয় লোকেদের মধ্যে পান খাবার প্রতি প্রবল অনুরাগ লক্ষ করলাম।

রাত আটটায় খবর পেলাম আগামীকাল ভোর সাড়ে পাঁচটায় টাটা সুমো আসবে আমাদের নিতে। সত্যি তাহলে মিজোরাম যাচ্ছি। ভারতবর্ষের এক কোণে পড়ে থাকা এই রাজ্যটি ১৯৬৬ থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত এত অশান্ত ছিল যে মিজোরামে বেড়াতে যাবার কথা ভাবাই যেত না। এখন অবশ্য মিজোরাম সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে সবচেয়ে শান্ত রাজ্য।

২৬ নভেম্বর, ২০০২, মঙ্গলবার ভোর ঠিক সাড়ে পাঁচটায় খালি গাড়ি নিয়ে ড্রাইভার এসে হাজির। এক সুমোচালক সুঠাম দেহী লুসাই যুবক, নাম পুইয়া। ভাঙা ইংরিজি বলতে পারে জেনে আমরা কৃতার্থ বোধ করলাম। জানা গেল অন্য যাত্রীরা যে যার বাড়ির সামনে থেকে উঠবে। পুইয়ার সঙ্গে কথা বলে আরও অনেক কিছু জানা গেল। আমার ধারণা ছিল জম্পুই এক ছোট্ট পাহাড়ি জনপদ যেমন উত্তরাঞ্চলের কৌশানি বা সিকিমের পেলিং। এখন জানলাম জম্পুই পাহাড়ের বিস্তার এক বিশাল এলাকা নিয়ে। উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রসারিত এই পার্বত্য ভূমিতে রয়েছে অসংখ্য উপজাতীয় গ্রাম। এদের মধ্যে প্রধান উপজাতীয় গোষ্ঠী হল লুসাই, রিয়াং, চাকমা, মার এবং কুকি।

আমাদের যাত্রা শুরু হল। অল্প সময়ের মধ্যেই চলে এলাম ভাংমুন গ্রামে। গতকাল এখানেই এসেছিলাম সিট বুক করতে। গাড়ির মালিক এক ঝুড়ি কমলালেবু গাড়ির ছাদে চাপিয়ে দিল। পুইয়া মুচকি হেসে ফিসফিস করে রহস্য ভেদ করল। লেবু চলেছে আইজল, মেয়ের শ্বশুরবাড়ি। তিন-চারজন যাত্রী উঠল। টাটা সুমোতে মোট দশজন ওঠে। পিছনে এবং মাঝের সিটে চারজন করে আর ড্রাইভারের পাশে দুজন।

ভাংমুনের পর খাড়াই পথ উঠে গেছে বেলিয়ানচিপ গ্রামে। গোঁ-গোঁ করতে করতে আমাদের গাড়ি যখন এই লুসাই গ্রামে হাজির হল শীতের সোনালি রোদে চারদিক ঝলমল করছে। গাড়ি থামামাত্র কিছু লোক হৈ হৈ করে ধেয়ে এল। প্রথমে একটু ঘাবড়ে গেছিলাম পরে দেখলাম চারজন যাত্রীকে বিদায় জানাতে পাড়ার সব লোক হাজির। এদের বেশিরভাগ লোকের গায়ে রঙিন মিজো চাদর, মাথায় হাতে তৈরি

বেতের টুপি। কয়েকজনের মুখে বাঁশের তৈরি পাইপে ধূমপানের ব্যবস্থা। অত্যন্ত প্রাণোচ্ছল এই লুসাইরা। পুরুষ এবং মহিলাদের পারস্পরিক ব্যবহার অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ। এদের হেসে গড়িয়ে পড়া দেখে মনে হল বেঁচে থাকার আনন্দ কাকে বলে এরা জানে। আমার পাশে এক নতুন যাত্রী উঠল। বয়স মনে হল চব্বিশ-পঁচিশ। চেহারা দেখেই বোঝা যায় সম্পন্ন পরিবারের শিক্ষিত ছেলে। আলাপ করলাম। নাম বেঞ্জামিন সাইলো। আইজলের স্কুলে শিক্ষকতা করছে বটে কিন্তু মনের বাসনা সর্বভারতীয় আই এ এস পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া। আমরা এই পথে আইজল যাচ্ছি শুনে প্রথমে একটু অবাক হলেও পরে উৎসাহ দিয়ে জানাল, কয়েক জায়গায় রাস্তার অবস্থা শোচনীয় হলেও পথের সৌন্দর্য অসাধারণ।

আমাদের অন্য সহযাত্রীদের দেখে মনে হল ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনেই আইজল চলেছেন। বেলিয়ানচিপকে পিছনে রেখে আমরা এগিয়ে গেলাম। একটা ছোট্ট গ্রামে গাড়ি দাঁড়াতেই একজন এসে বেশ কয়েকটা খাম ধরিয়ে দিল ড্রাইভারের হাতে। বোঝা গেল তাকে পোস্টম্যানের দায়িত্বও পালন করতে হয়। গ্রামটির নাম বাংলা বাড়ি। এখানকার কমলালেবু আয়তনে ছোট হলেও স্বাদে নাকি এক নম্বর। পরের গ্রাম সাবুয়াল। ভাংমুন থেকে এর দূরত্ব ১৬ কিলোমিটার। বেশ বড় গ্রাম। এখানে আছে একটি জলাশয়, তাতে নৌকাবিহারের ব্যবস্থা আছে।

আমার নতুন বন্ধু সাইলোর কাছে জানা গেল, চা-জলখাবারের জন্য গাড়ি দাঁড়াবে ফুলদংশাই গ্রামে। সাবুয়াল থেকে দূরত্ব আট কিলোমিটার। শীতের সকালে গাড়ির জানলার ধারে বসে যেতে দারুণ লাগছিল। পথের দুপাশে সবুজ রঙের একাধিপত্য দৃষ্টিকে আরাম দেয়। পাহাড়ি এলাকা বলে চাষের সুযোগ কম বটে কিন্তু যেখানেই একখণ্ড সমতল জায়গা পাওয়া গেছে সেখানেই পরিশ্রমী পাহাড়ি মানুষ চাষের কাজে উদ্যোগী হয়েছে। অনেক জায়গায় দেখলাম পাকা ধান কাটা হচ্ছে। শুনেছি জম্পুই পাহাড়ে নাকি বিখ্যাত বিন্নি ধানের চাষ হয়।

ফুলদংশাই পৌঁছে দেখি হৈ হৈ ব্যাপার। কারণ আজ সাপ্তাহিক হাটবার। ম্যাটাডোর ভ্যানে মালপত্র চাপিয়ে দোকানিরা এসেছে দূর দূরান্ত থেকে। এদের মধ্যে বিহারি এবং মারোয়াড়িদের সংখ্যাই বেশি। বেশ কয়েকজন বাঙালি ব্যবসায়ীকেও পেয়েছিলাম যারা শিলচর-করিমগঞ্জের লোক। হাট বসেছে গির্জার সামনের মাঠে আর রাস্তার ধারে। বিশালাকার গির্জাটিকে আসন্ন বড়দিন উপলক্ষে সাজানো হচ্ছে। ফুলদংশাইয়ে ত্রিপুরা পর্যটন বিভাগের ট্যুরিস্ট বাংলো আছে বটে তবে পর্যটকের অভাবে তা খালি পড়ে থাকে। চায়ের দোকানে ঢোকার মুখে থমকে দাঁড়ালাম। দোকানের সামনে এক প্রবীণা মহিলা নাতি কোলে নিয়ে বাঁশের মাচার ওপর বসে আছেন। দেখেই বোঝা যায় ইনি রিয়াং উপজাতীয় কোনও পরিবারের কর্ত্রী। বইতে পড়েছিলাম উত্তর-পূর্ব ভারতের বেশ কিছু উপজাতি সমাজ মাতৃতান্ত্রিক, অর্থাৎ পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলার দ্বারাই পরিবার শাসিত হয়। পরনে ত্রিপুরী রমণীর বস্ত্রখণ্ড 'পাছড়া', গায়ে লম্বা হাতা জামা, হাতে, নাকে, গলায়, কানে রুপোর রকমারি অলঙ্কার। অলঙ্কারের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় রুপোর টাকা পর পর সাজিয়ে তৈরি করা গোটা চারেক হার।

ফুলদংশাই ছাড়িয়ে ছ কিলোমিটার যাবার পর চেকপোস্টে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রচুর পুলিশ ঘোরাঘুরি করছে। সাইলো জানাল, জায়গাটার নাম কনপুই। এখানেই ত্রিপুরার সীমানা শেষ, মিজোরামের এলাকা আরম্ভ। এখান থেকে আইজলের দূরত্ব ২১৮ কিলোমিটার। মিজোরাম পুলিশ তন্ন তন্ন করে মালপত্র পরীক্ষা করল। আমরা ইনারলাইন পারমিট দেখাবার জন্য তৈরি ছিলাম কিন্তু আমাদের সঙ্গে কোনও কথাই বলল না। শুধু তাই নয়, আমাদের মালপত্র নিয়েও তাদের তেমন কৌতূহল দেখলাম না। কনপুই পেরিয়ে আমরা এবার মিজোরামে ঢুকে পড়েছি। হয়তো সেই আনন্দেই পিছনের এক যাত্রী গান ধরল। সুরের মধ্যে মাটির ছোঁয়া রয়েছে। গানের ভাষা আমাদের বোধগম্য না হলেও এটা বোঝা গেল গীতিকার বেশ রসিক লোক নইলে মাঝে মধ্যেই অন্যরা হেসে গড়িয়ে পড়বে কেন?

ইতিমধ্যে আমাদের টাটা সুমো কখন যে আস্তে আস্তে উতরাই পথে নামতে আরম্ভ করেছে খেয়াল করিনি। খেয়াল হতেই আবিষ্কার করলাম জম্পুই এবং মিজো পাহাড়ের মাঝে যে উপত্যকা রয়েছে তার দিকেই চলেছি। চারপাশের দৃশ্য দ্রুত পাল্টাতে লাগল। বড় গাছপালা আর দেখা যাচ্ছে না, শুধু লম্বা ঘাসের বন। ঘাস এত লম্বা যে পুরো গাড়িটাই ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। ধারে কাছে কোনও লোকজন বা ঘরবাড়ি চোখে পড়ছে না। রাস্তার চেহারাও পাল্টে গেছে। অনেক জায়গায় রাস্তা ভেঙে মাটি বেরিয়ে পড়েছে। সাইলো জানাল, উগ্রপন্থী কার্যকলাপের জন্য গত দশ-বারো বছর এই রাস্তা একবারও সারানো হয়নি। একটু বেশি বৃষ্টি হলেই অনেক জায়গায় এত কাদা জমে যে গাড়ি আটকে যায়। তাই শীতকালেই নিয়মিত গাড়ি চলাচল সম্ভব হয়।

এক সময় ঘাসবন শেষ হয়ে বাঁশবন আরম্ভ হল। রাস্তার দুধারে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধুই সবুজ বাঁশের জঙ্গল। আয়তনের অনুপাতে মিজোরামেই বাঁশবন সবচেয়ে বেশি। মিজোদের প্রাত্যহিক জীবন, খাদ্যাভ্যাস, সংস্কৃতি আর উৎসবের সঙ্গে বাঁশের ব্যবহার জড়িয়ে আছে। মিজোরামের অর্থনীতিতে বাঁশের গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমানে এই বাঁশ নিয়েই গভীর উদ্বেগ মিজোদের মনে। কারণ হিসেবমতো ২০০৫ সালে বাঁশগাছে ফুল আসার কথা। এমন ঘটনা শেষ ঘটেছিল ১৯৭৬ সালে। বাঁশ গাছে ফুল আসার পর সেই ফুল থেকে সবুজ রঙের ছোট ছোট ফল জন্মায়। এই পুষ্টিকর ফলের লোভে ইঁদুরের দল এসে হাজির হয়। পর্যাপ্ত খাবার পেয়ে মূষিক বাহিনী দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে। পরবর্তীকালে খাবারে টান পড়লে ইঁদুরের দল খেত-খামার উজাড় করে দিয়ে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করে।

বাঁশ নিয়ে চিন্তা-ভাবনায় বাধা পড়ল গাড়ি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়াতে। আমাদের সামনে আরও দুটি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কী ব্যাপার? উল্টোদিক থেকে আসা সিমেন্টের পাইপ বোঝাই এক লরি বিকল হয়ে পথ আগলে রেখেছে। সঙ্কীর্ণ পথের একদিকে পাহাড়ের গা অপরদিকে ঘন জঙ্গল খাদের দিকে নেমে গেছে। দুটো গাড়ি পাশাপাশি যাবার উপায় নেই। আমাদের সারথি পুইয়া কিন্তু হার মানার লোক নয়। লরির কাছে গিয়ে জায়গাটা ভালো করে দেখে অন্য চালকদের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজে নেমে পড়ল। কাজটা হল রাস্তার পাশের জঙ্গল কেটে একটা গাড়ি যাবার জায়গা তৈরি করা। পুইয়া তার সঙ্গীদের নিয়ে 'দাঁও' হাতে কাজে নেমে পড়ল। মাত্র

আধঘণ্টার মধ্যেই সমস্যার সমাধান। যাত্রীদলের প্রবল হর্ষধ্বনি এবং করতালির মধ্যে একে একে বিকল লরিকে পাশ কাটিয়ে রাস্তায় উঠে এল আইজলগামী গাড়িগুলো। নতুন উদ্যমে ছুট লাগাল আইজলের দিকে। এই আনন্দ কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। জলে ভেজা রাস্তা দেখে সাইলো উৎকণ্ঠিত স্বরে জানাল, গতরাতে মনে হচ্ছে বেশ ভালোই বৃষ্টি হয়েছে, কপালে ভোগান্তি আছে। সাইলোর বিপদবার্তা যে এত তাড়াতাড়ি মিলে যাবে আশা করিনি। রাস্তার এক জায়গায় দেখি থকথক করছে কাদা। জায়গাটা আমরা গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে পেরোলাম। খালি গাড়ি নিয়ে পুইয়া যখন এগিয়ে যেতে আরম্ভ করল আমরা চরম উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়ে দেখছি আর ভাবছি এই বুঝি চাকা বসে গেল। পুইয়া কিন্তু নির্বিকার। পান চিবোতে চিবোতে দক্ষ হাতে গাড়ি পার করিয়ে নিয়ে এল। ভাবলাম বাঁচা গেল আর চিন্তা নেই, কিন্তু কিছুদূর যাবার পর রাস্তার অবস্থা দেখে পিলে চমকে উঠল। রাস্তার প্রায় কুড়ি মিটার লম্বা একটা অংশের বর্ণনা দিতে গেলে এককথায় বলা যায় বর্ষাকালে লাঙল টানার পর চাষের জমির যা অবস্থা হয় ঠিক তাই। এর ওপর দিয়ে গাড়ি যাবে নাকি?

আগের মতোই আমরা সাবধানে পায়ে হেঁটে জায়গাটা পেরিয়ে এলাম। খালি গাড়ি নিয়ে পুইয়া আগের মতোই নির্বিকার ভঙ্গিতে এগিয়ে এল। পরম বিস্ময়ে দেখলাম টাটা সুমোর মতো দাপুটে গাড়িকে কর্দমাক্ত মেদিনী কী গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে নিথর করে দিল। গাড়ি যত গোঁ গোঁ করে আর্তনাদ করে পথ ততই যেন তাকে চেপে ধরে। অনেক চেষ্টা করেও বাহাদুর পুইয়া যখন হার মানল আমার সহযাত্রীরা প্রায় সবাই জামা-প্যান্ট গুটিয়ে কাদায় নেমে পড়ল। অবাক হলাম উচ্চশিক্ষিত, সম্পন্ন ঘরের ছেলে সাইলোর উৎসাহ দেখে, কোথা থেকে একটা ছোট বেলচা জোগাড় করে কাদা সরাতে লেগে গেল। গাড়ির পাতাল প্রবেশ ঠেকাতে সকলের যৌথ উদ্যোগ দেখে এই পাহাড়ি মানুষদের অফুরন্ত প্রাণশক্তির পরিচয় পেলাম। প্রায় দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় আমাদের বাহনকে উদ্ধার করে আবার আইজলের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করা গেল। এর পরেও অনেকবার রাস্তায় কাদা পেরোতে হয়েছিল বটে তবে বিপদ ঘটেনি। যে জায়গায় আমাদের গাড়ি আটকা পড়েছিল তার নাম আমাচুরি। এখানে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর আউটপোস্ট রয়েছে।

তুইপুই নদী পেরিয়ে তুইপুইবাড়ি নামে এক বড় মিজো গ্রামের দেখা পেলাম। এখানে আরেক দফা গাড়ি সার্চ করবে নিরাপত্তাবাহিনী। সহযাত্রীদের অনুসরণ করে একটা দোকানে ঢুকলাম চায়ের সন্ধানে। বড় ঘরের একদিকে মুদিখানা আরেকদিকে চা-জলখাবারের ব্যবস্থা। বসামাত্র একটি ছেলে এসে টেবিলে গোটাদশেক ডিম রেখে গেল। যাত্রীদের মধ্যে কয়েকজন ডিম তুলে, খোসা ছাড়িয়ে, তাতে অল্প নুন ছড়িয়ে পটাপট মুখে পুরে দিল। কে কটা খাচ্ছে তা গোনার লোক নেই। দাম দেবার সময় দোকানি খদ্দেরের কথাই মেনে নিচ্ছে। দোকানের মালিককে দেখেই বোঝা যায় ইনি সমতলের লোক। একটু ভালো করে দেখার পর বাঙালি বলে মনে হল। আলাপ করে জানলাম উনি করিমগঞ্জের লোক, এই প্রত্যন্ত মিজো গ্রামে বসবাস এবং ব্যবসা করছেন দশ বছর ধরে। পরবর্তীকালে দেখেছি মিজোরাম, মণিপুর এবং নাগাল্যান্ডের গণ্ডগ্রামেও শিলচর-করিমগঞ্জের মানুষ চুটিয়ে ব্যবসা করছেন।

তুইপুইবাড়ির অবস্থান প্রায় সমান্তরাল দুটি পর্বতশ্রেণীর মাঝামাঝি। একটি জম্পুই পাহাড় অপরটি মিজো পাহাড়। আমরা এবার মিজো পাহাড়ে উঠব। সাইলো জানাল, আমরা ডাম্পা অরণ্যের ভেতর দিয়ে যাব। শুনে দারুণ আনন্দ হল। এ যেন এক অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তি। আমরা যত ওপরে উঠছি জঙ্গল ততই ঘন হতে আরম্ভ করল। বাঁশ গাছের আধিক্য অন্য সব উদ্ভিদকে যেন অদৃশ্য করে দিয়েছে। রাস্তার পাশেই চোখে পড়ছে ফলন্ত পেঁপে আর কলাগাছ। ফল পাড়ার লোক কোথায়!

ডাম্পা অভয়ারণ্যের প্রবেশ পথে কোনও প্রহরী চোখে পড়ল না। তীব্র কৌতূহল নিয়ে জঙ্গল দেখতে দেখতে চলেছি। ডাম্পা অভয়ারণ্যের ৬৮১ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় যেসব পশু-পাখি আছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ধনেশ পাখি, বন মোরগ, ট্রাগোপান, পাহাড়ি ময়না, বুনো শুয়োর, উল্লুক, বাঁদর, হনুমান, বনবেড়াল, বার্কিং ডিয়ার, কালো ভালুক, শজারু, উড়ন্ত কাঠবিড়ালি, প্যাঙ্গোলিন, চিতাবাঘ আর শঙ্খচূড় সাপ। এই জঙ্গলে বাঘ আছে বলেও দাবি করা হয়, যদিও এই দাবি নিয়ে বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাদের বক্তব্য যে কটি ছিল সব চোরাশিকারিদের হাতে মারা পড়েছে।

তবে আমরা শুধু ধনেশ পাখি, জংলী মোরগ আর একটি বৃহদাকৃতি দাঁতাল বন্য বরাহ দেখেই সন্তুষ্ট রইলাম। এর প্রধান কারণ জঙ্গল এত ঘন, বনের ভেতর দৃষ্টি যায় না। মিজোরামের জঙ্গলের খ্যাতি বাঁশ, বেত, অর্কিড, ফার্ন আর ভেষজ গুণসম্পন্ন উদ্ভিদের জন্য। বন থেকে সংগৃহীত প্রচুর পরিমাণ শতমূলী, সর্পগন্ধা, চিরতা এবং নানা প্রজাতির অর্কিড বাইরে রপ্তানি হয়।

এক সময় অভয়ারণ্যের এলাকা পেরিয়ে এলাম। পথের ধারে মাইলস্টোন দেখে জানলাম আইজল ৬৮ কিলোমিটার দূর। সকাল থেকে শুধু বিস্কুট আর কমলালেবু খেয়েই কেটেছে। ঘড়িতে দেখি চারটে বাজে। আরও এক ঘণ্টা পথ চলার পর এক ছোট শহরে প্রবেশ করলাম। জায়গাটার নাম মামি। পশ্চিম ফাইলেং অঞ্চলে অবস্থিত এই শহরটি সম্প্রতি জেলা-সদরের মর্যাদা পেয়েছে। গাড়ি থামতেই যাত্রীরা যে যার চেনা দোকানে ছুটল। আমরা কোথায় যাই? যা আছে কপালে ভেবে একটা খদ্দেরহীন দোকানে ঢুকে পড়লাম। এক মিজো মহিলা দেখি দুটি বাচ্চা ছেলের ঝগড়া থামাতে ব্যস্ত, আমাদের দেখে একটু অবাক হলেন বলে মনে হল। দ্রুত পাশের ঘরে গিয়ে এক পুরুষকে ডেকে নিয়ে এলেন। ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিলেন— মহম্মদ খলিল, করিমগঞ্জের লোক। পেটের ধান্দায় ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসেছিলেন ১৪-১৫ বছর আগে। পরবর্তীকালে মিজো মহিলাকে বিবাহ করে এখানেই থিতু হয়েছেন। স্বামী-স্ত্রী মিলে চটপট পরোটা আর আলুভাজা তৈরি করে আন্তরিকভাবে পরিবেশন করলেন।

আমাদের পরবর্তী যাত্রা-বিরতি ঘটল তুত নামের ছোট্ট গ্রামে। তুত নদীর পাশেই এর অবস্থান। গাড়ি থামতেই কয়েকজন ছেলেমেয়ে এসে কমলালেবু কেনার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। কুড়ি টাকা ডজন। অন্য একটি ছেলে দেখি বোতলে ভরা মধু বিক্রি করছে। তুত পেরোতেই অন্ধকার ঘন হয়ে এল। বাইরের পৃথিবী অদৃশ্য। মাঝে মধ্যে কয়েকঘর দোকান, গৃহস্থ বাড়ির টিমটিমে আলো চোখে পড়ছে। সারাদিনের ধকলে যাত্রীরা প্রায় সবাই হাল্কা ঘুমে ঢুলছে। গাড়ি থামতেই তন্দ্রা ছুটে

গেল। চা-পানের বিরতি। জায়গার নাম লেংপুই। এখানেই রয়েছে বিমানবন্দর।

আলো ঝলমলে একটা শহরে গাড়ি প্রবেশ করতে দেখে ভাবলাম আইজল এসে গেছি। কিন্তু না, এই জমজমাট জনপদের নাম সাইরাং। ঘড়িতে দেখি সাতটা বাজে। এবার চিন্তা আরম্ভ হল। আইজলে শুনেছি সন্ধে ছটার মধ্যেই দোকানপাট বন্ধ হয়ে গিয়ে রাস্তাঘাট জনশূন্য হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় থাকার জায়গা জোগাড় হবে কী করে? সাইলো অভয় দেয়, ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবেই।

দীর্ঘ পথযাত্রার ক্লান্তিতে কখন দু চোখ বন্ধ হয়ে গেছিল জানি না। গাড়ির ঝাঁকুনিতে সম্বিত ফিরে পেয়ে সামনে তাকাতেই সাইলো বলে উঠল 'ওই দেখুন আইজল'। আমরা বেশ কিছুটা নিচে নেমে এসে একটা ব্রিজ পেরিয়ে এবার আইজল শহরের চড়াইপথ ধরলাম। মিজোরামের রাজধানীর বিস্তার যে এত বিশাল তা ধারণা ছিল না। সেটা বোঝা গেল আশ্রয়ের সন্ধানে আইজলের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছোটাছুটির সময়। সহযাত্রীরা যে যার আস্তানায় নেমে পড়ার পর রইলাম শুধু আমরা দুই বন্ধু, সাইলো আর ড্রাইভার পুইয়া। ঘড়িতে রাত সাড়ে আটটা। পথঘাট একেবারে ফাঁকা, কোনও দোকান খোলা নেই। বেশিরভাগ হোটেলের সদর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। প্রচণ্ড ঠান্ডার জন্য গাড়ির কাচ বন্ধ করে দিতে হয়েছে। এমন একটা প্রতিকূল পরিবেশে আমাদের গাড়ি একেকটা হোটেলের সামনে দাঁড়াচ্ছে, সাইলো ভেতরে গিয়ে কথা বলছে আর আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করার পর জানতে পারছি কোনও ঘর খালি নেই। সাইলো হার মানার ছেলে নয়। নিদ্রামগ্ন শৈলনগরীর বিভিন্ন এলাকায় ছোট, বড়, মাঝারি যে হোটেলের দরজা খোলা পাচ্ছে ঢুকে পড়ছে আর ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসছে। জানা গেল আসন্ন বড়দিন উৎসবের জন্য এই স্থানাভাব।

বেশ ঘাবড়ে গেলাম। শেষ পর্যন্ত কি রাস্তায় রাত কাটাতে হবে নাকি? পুইয়ার কিন্তু কোনও বিকার নেই। আমাদের জন্য এত তেল পুড়ছে তার ওপর ভোর রাত থেকে চালকের আসনে বসে কী ধকলটাই না নিয়েছে কিন্তু দেখে বোঝার উপায় নেই। প্রায় শেষ চেষ্টা হিসেবে সাইলো আবার এক হোটেলের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল। নাম দেখলাম রয়্যাল হোটেল। এবার সাইলোর সঙ্গে আমিও ঢুকে পড়লাম। পরদেশী লোক দেখে যদি করুণা হয়। ভেতরে গিয়ে দেখি হোটেল কর্মীরা রাতের আহার সারছে, সাইলো মিজো ভাষায় কী বলল বোঝা গেল না কিন্তু উত্তর বোঝার জন্য ভাষা জ্ঞানের প্রয়োজন হল না। ঘর নেই। কর্মীদের মধ্যে একজনকে দেখে বাঙালি বলে মনে হতে তাকে শুনিয়েই আমি বাংলায় বলে উঠলাম 'বেড়াতে এসে কি এবার রাস্তায় থাকতে হবে?' কথাতে মন্ত্রের মতো কাজ হল। তরুণ কর্মীটি সোজা আমার কাছে এসে বাংলায় প্রশ্ন করল 'কোথা থেকে আসছেন?' সব কথা শোনার পর আমাদের মালপত্র নিয়ে এসে বসতে বলল। বোঝা গেল থাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। সাইলো আর পুইয়াকে বিদায় জানাবার সময় আমাদের মুখে ভাষা ছিল না। শুধু ওদের হাত দুটো ধরে রইলাম। 'বন্ধুভরা বসুন্ধরা' কথাটির তাৎপর্য নতুন করে উপলব্ধি করলাম।

প্রয়োজনীয় তথ্য

মিজোরাম বেড়াবার সেরা সময় নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি।

মিজোরাম ভ্রমণের জন্য ইনারলাইন পারমিট প্রয়োজন। পারমিট ফি ১২০ টাকা। দুকপি ছবি সহ আবেদন করতে হবে নিচের ঠিকানায়:

মিজোরাম হাউস

২৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড

কলকাতা-৭০০ ০১৯

☎ ২৪৭৫-৬৪৩০ (বিড়লা মন্দিরের কাছে)

জম্পুই থেকে টাটা সুমোয় আইজল যেতে আগ্রহীরা ইডেন ট্যুরিস্ট লজের ম্যানেজারের সহযোগিতা পাবেন। আইজলে প্রচুর হোটেল। কয়েকটি হোটেলের নাম জানাচ্ছি। **হোটেল রয়্যাল**, বড়বাজার ☎ ০৩৮৩২-২৩১১৫৭৭, **হোটেল রিজ**, বড়বাজার, **হোটেল পেন্টা**, বড়বাজার, **হোটেল রাজদূত**, ট্রেজারি স্কোয়্যার, **হোটেল রাজি ইন্টারন্যাশনাল**, ট্রেজারি স্কোয়্যার।

মিজোরাম বেড়িয়ে ফিরতি পথে শিলচর (আইজল থেকে ১৮০ কিলোমিটার) দেখে কলকাতার বিমান ধরা যাবে। শিলচর থেকে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল (১৯৪ কিলোমিটার) যেতে পারেন। মণিপুর বেড়াতে ইনারলাইন পারমিট লাগে না।

'ভ্রমণ' জুন ২০০৩

শীতের অরুণাচল

আদিম অরণ্য এবং উপজাতীয় মানুষদের দেখব বলে বেরিয়ে পড়লাম অরুণাচলের দিকে। ভ্রমণসঙ্গী জোটেনি তাই একাই সরাইঘাট এক্সপ্রেস চেপে পৌঁছে গেলাম গুয়াহাটি। দিনটা ছিল ৩০ নভেম্বর, ২০০১। গুয়াহাটি থেকে ডিব্রুগড়, পাশিঘাট, আলং, ইটানগর হয়ে হাজির হলাম পশ্চিম কামেং জেলার সদর বমডিলায়। প্রচণ্ড ঠান্ডা আর খারাপ আবহাওয়ার মধ্যে আশ্রয় পেলাম সার্কিট হাউসে। জগবন্ধু মণ্ডল, অরুণাচল সরকারের একজন উচ্চপদস্থ আধিকারিক যাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ইটানগর থেকে বমডিলার পথে, টাটা সুমোর সহযাত্রী হিসেবে, তিনিই ব্যবস্থা করে দিলেন। সার্কিট হাউসের বিশাল আরামপ্রদ ঘরে আমি একা। থাকার জন্য দক্ষিণা মাত্র পঞ্চাশ টাকা কিন্তু কাঠের মূল্য বাবদ আরও পঞ্চাশ টাকা লাগবে। কাঠ? কাঠ দিয়ে কী হবে? নেপালি চৌকিদার জানাল, 'বোখারি নহি জলাইয়েগা?' ব্যাপারটা অচিরেই বোধগম্য হল। 'বোখারি' মানে ধাতু নির্মিত এক বিশেষ ধরনের পাত্রে কাঠ জ্বালিয়ে ঘর গরম করার ব্যবস্থা, এর সুবিধে হল চিমনির মাধ্যমে ধোঁয়া বাইরে চলে যায় আর প্রয়োজনমতো আগুনের উত্তাপ কমানো বাড়ানো যায়। শীতের রাতে বমডিলা-তাওয়াং অঞ্চলের তাপমাত্রা এত কমে যায় যে বোখারি না জ্বালিয়ে শোবার কথা স্থানীয়রা চিন্তাই করতে পারে না।

সার্কিট হাউসে থাকার একটা বড় সুবিধে হল রান্নার লোক রয়েছে। আপনার পছন্দমতো খাবার তৈরি করতে পাচক আর তার চেলারা এক পায়ে খাড়া।

দুটি লেপের কল্যাণে আর বোখারির উত্তাপে এক ঘুমেই রাত কাবার হয়ে গেল। সকালে বারান্দায় বেরিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। গত রাতের ঝোড়ো হাওয়া, বৃষ্টি আর কুয়াশার নামগন্ধ নেই। আকাশ এত ঘন নীল যে বেশিক্ষণ তাকানো যায় না। সার্কিট হাউসের অবস্থান একটু উঁচুতে, তাই বমডিলা শহরের রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি আর লোকজনের ব্যস্ততা স্পষ্ট চোখে পড়ছিল। প্রাতরাশ সেরে পায়ে হেঁটেই শহর দেখতে বেরলাম। প্রথমে গেলাম আপার মনাস্ট্রি। এটির বয়স বেশি নয়। চিন-ভারত যুদ্ধের পর শান্তির বাণী প্রচার করতে থুম্পটেন জুম্পেন নামে এক লামার উদ্যোগেই এই বৌদ্ধমঠটি নির্মিত হয়। এই প্রসঙ্গে জানাই যে ১৯৬২ সালের যুদ্ধে চিনারা বমডিলা শহরটি দখল করে নিয়েছিল। বমডিলায় অনেক রাস্তার পাশেই নিহত ভারতীয় সৈন্যদের স্মৃতিফলক চোখে পড়বে। আপার মনাস্ট্রি দেখে সত্যি আনন্দ পেলাম। মঠের আবাসিক ছোট ছোট ছাত্রদের সাপ্তাহিক স্নান পর্ব বেশ মজার। প্রতি রবিবারেই মনে হয় এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। বিরাট বিরাট ডেকচিতে জল গরম হচ্ছে আর

ছেলেরা স্নানের অজুহাতে খেলায় মেতেছে।

উতরাই পথে লোয়ার মনাস্ট্রি গিয়ে হাজির হলাম। এটি বমডিলার বাজার এলাকায়। দেখেই বোঝা যায় বেশ প্রাচীন। সুন্দর বাগানের মাঝ দিয়ে হেঁটে গোম্ফায় প্রবেশ করতে হবে। পথের ধারে প্রার্থনা চক্র ঘোরাচ্ছে ভক্তের দল। লম্বা বাঁশের মাথায় প্রার্থনা পতাকা হাওয়ায় উড়ছে। এই গোম্ফাটির স্থানীয় নাম থুবটেক গ্যালিং। আজ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী স্থানীয় মনপা এবং শের দুক পেন উপজাতীয় মানুষদের এক উৎসবের দিন। অনেকটা আমাদের দীপাবলী উৎসবের মতো। প্রচুর ভক্ত এসেছেন শ্রদ্ধা জানাতে এবং প্রধান লামার আশীর্বাদ নিতে। অনেকটা সময় কাটল গোম্ফার ভেতর। এত মানুষ আসছেন পুজো দিতে অথচ কোথাও কোনও বিশৃঙ্খলা নেই।

রবিবার ক্রাফট সেন্টার এবং মিউজিয়াম বন্ধ থাকে। পরদিন তাওয়াং যাবার টাটা সুমোর টিকিট কেটে ফিরে গেলাম সার্কিট হাউস। টিকিটের মূল্য ২৫০ টাকা। একটা গাড়িতে মোট দশজন যাত্রী ওঠে। সেদিন সন্ধেবেলাটা কাটল জগবন্ধুবাবুর সরকারি আবাসে। উনি জেলার ট্রেজারি অফিসার। আমার সঙ্গে আলাপচারিতার জন্য স্থানীয় কয়েকজন প্রবাসী বাঙালিও হাজির ছিলেন। চুটিয়ে আড্ডা হল। অরুণাচল সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অনেক বাঙালি কর্মরত আছেন। অরুণাচল প্রদেশের বেশিরভাগ উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং একাধিক মন্ত্রী যার মধ্যে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীও আছেন সবাই রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্র। বিদায় নেবার সময় জগবন্ধুবাবুর স্ত্রী গোটা ছয়েক আপেল দিলেন। ১০ ডিসেম্বর, ২০০১, সোমবার সকাল নটা নাগাদ রওনা দিলাম তাওয়াংয়ের উদ্দেশে। দূরত্ব ১৮০ কিলোমিটার। যাত্রাপথের চড়াই-উতরাই বোঝার জন্য কয়েকটি তথ্যই যথেষ্ট। আমরা যাত্রা শুরু করছি বমডিলা থেকে, যার উচ্চতা ৮,২০০ ফুট। মাত্র ৫ কিলোমিটার দূরেই বমডি গিরিপথ, উচ্চতা প্রায় ৯,৫০০ ফুট। এরপর পথ নেমে গেছে দিরাং— বমডিলা থেকে দূরত্ব ৪২ কিলোমিটার, উচ্চতা ৫,০০০ ফুট। এরপর পথের উচ্চতা বাড়তেই থাকবে। সেলা পাসে আমরা উচ্চতম অংশ অতিক্রম করব, উচ্চতা ১৩,৭২১ ফুট। এরপর পথের উচ্চতা ক্রমশ কমতে থাকবে। তাওয়াং পৌঁছে, অর্থাৎ সেলা পাস থেকে আরও ১০০ কিলোমিটার গিয়ে, আমরা ১০,২০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থান করব।

বমডি গিরিপথ পেরিয়ে কামেং নদীর দেখা পেলাম। এর উৎপত্তিস্থল কাংটো পর্বত, যার উচ্চতা ৭,০৯০ মিটার। আমরা এগিয়ে চলেছি দিরাংয়ের দিকে। ক্রমশ দু-পাশের পাহাড় সরে যেতে লাগল। আমরা এখন কামেং উপত্যকায় ঢুকে পড়েছি। আমাদের টাটা সুমো গিয়ে দাঁড়াল দিরাং শহরের কেন্দ্রস্থলে। 'ছবির মতো' কথাটা হয়তো বহু ব্যবহারে মলিন হয়ে গেছে কিন্তু কথাটির সার্থক প্রয়োগ দিরাংয়ের মতো সুন্দর জায়গার ক্ষেত্রেই হওয়া উচিত। খরস্রোতা কামেং নদীর দুই তীরেই বসতি গড়ে উঠেছে। এর পরেই বিস্তীর্ণ চাষের জমিতে ধান কাটার কাজ চলছে। এ অঞ্চলে প্রচুর ফলের বাগান আছে বলে শুনেছি। দিরাংয়ের খ্যাতি তার অর্কিড সংরক্ষণ কেন্দ্র, ইয়াক রিসার্চ সেন্টার আর উষ্ণপ্রস্রবণের জন্য। দিরাংয়ে চা-পানের বিরতিতে আমার সহযাত্রীদের দেখার সুযোগ হল। আমরা দুজন সমতলের লোক বাকিরা স্থানীয়

অধিবাসী, তার মধ্যে আবার পাঁচজনই মহিলা। মহিলাদের মধ্যে একজন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে হিন্দিতে বাক্যালাপ আরম্ভ করলেন। বেশ পরিষ্কার হিন্দি। অরুণাচলে হিন্দি ভাষার ব্যবহার খুব বেশি। এর একাধিক কারণের অন্যতম হল ছাব্বিশটি প্রধান উপজাতি গোষ্ঠীর বেশিরভাগ মানুষ একে অপরের ভাষা বোঝে না তাই হিন্দিই এদের পারস্পরিক যোগাযোগ এবং ভাব বিনিময়ের মাধ্যম। আরেকটি কারণ হল ১৯৬২ সালের পর নিরাপত্তার দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই রাজ্যে সামরিক বাহিনীর কার্যকলাপ বহুগুণ বেড়ে যায়। উন্নয়নমূলক কাজের সূত্রে যুক্ত স্থানীয় মানুষ হিন্দি শিখতে আগ্রহী হয়। তাই ভাষা সমস্যা না থাকা অরুণাচল ভ্রমণের আরেকটি আকর্ষণীয় দিক। চা-পর্ব মিটিয়ে আমাদের গাড়ি ছুট লাগাল ৩৮ কিলোমিটার দূরের সেলা পাসের দিকে। ইতিমধ্যে আবহাওয়া খারাপ হতে আরম্ভ করেছে। আমার ঠিক পাশের সহযাত্রী বিমান বাহিনীর কর্মী, বাড়ি রাজস্থান। ছুটি কাটিয়ে কর্মস্থলে ফিরছেন, হয়তো সে কারণেই একটু বিষণ্ণ। উনি জানালেন, বেলা বাড়লেই সেলা অঞ্চলের আবহাওয়া প্রতিকূল হতে আরম্ভ করে। বৃষ্টি আর হালকা তুষারপাত অতি স্বাভাবিক ঘটনা। তবে একটা মজার ব্যাপার হল সেলা পাসের দক্ষিণে যখন খারাপ আবহাওয়া দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সেই একই সময়ে তাওয়াং অঞ্চলে হয়তো দেখা যাবে রোদ ঝলমল করছে।

দিরাং থেকে সেলার দিকে যাবার পথে প্রচুর সেনা ছাউনি চোখে পড়ল। ছিমছাম, সাজানো-গোছানো সামরিক শিবিরে সেনাকর্মীদের শৃঙ্খলাবদ্ধ কর্মতৎপরতা দেখে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। একে একে আমরা লোয়ার সাঙ্গে, আপার সাঙ্গে, বৈশাখী ক্যাম্প পেরিয়ে সেলার পদপ্রান্তে উপস্থিত হলাম। এ জায়গার নাম শাংগ্রিলা, উচ্চতা ১১,০০০ ফুট। মেঘ এবং ঘন কুয়াশায় মাঝে মধ্যেই দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয়ে পড়ছে। তার মধ্যেই চোখে পড়ল পথের ধারে পাইন গাছের পাতার ওপর হালকা তুষারের প্রলেপ। পথের উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বরফের পরিমাণও বাড়তে লাগল। এতক্ষণ টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল, এবার হালকা তুষারপাত আরম্ভ হল। চারপাশের দৃশ্য কেমন তা জানার কোনও উপায় রইল না।

আশ্চর্যের ব্যাপার এত উচ্চতায়, এত বরফের মাঝে থেকেও শীতের তীব্রতা অসহনীয় বলে মনে হল না। পথের বিপজ্জনক অংশে সামরিক বাহিনীর লোকেরা বুলডোজার, ক্রেন এবং নানাবিধ যন্ত্রপাতি নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছেন, দেখে মনে বল পেলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই এই উদ্ধার বাহিনীর কাজকর্ম স্বচক্ষে দেখার সুযোগ ঘটল। আমাদের সামনেই সামরিক বাহিনীর একটা ট্রাক বিকল হয়ে পথ আটকে দাঁড়িয়ে গেল। রাস্তার পাশে এত বরফ যে পাশ কাটিয়ে যাবার উপায় নেই। পুরো একটি ঘণ্টা আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে রইল। এমন পরিস্থিতিতে বেড়াবার আনন্দই মাটি হয়ে যাবার কথা, কিন্তু অপ্রত্যাশিত ভাবে সময়টা কেটে গেল দারুণ আনন্দে। বিপদে পড়লে একদল মানুষ একটা পরিবার হয়ে যায়। যেই বোঝা গেল গাড়ি ছাড়তে অনেক দেরি হবে, আমার উপজাতীয় সহযাত্রীরা পোঁটলা-পুঁটলি খুলে নানারকম খাবার বার করে সবাইকে ভাগ করে দিলেন। এতই স্বচ্ছন্দ ছিল তাদের এই আচরণ, মনে হচ্ছিল আমরা পরস্পরকে অনেকদিন থেকেই চিনি। আমি লজেন্স

আর আমসত্ত্ব বার করলাম আর আমার রাজস্থানের সহযাত্রী তার মায়ের তৈরি ছাতুর লাড্ডু বার করে বিতরণ করলেন। এরপর শুরু হল আড্ডা আর হিন্দি সিনেমার গান। কেমন করে সময় কেটে গেল টের পেলাম না।

গিরিপথের উচ্চতম অংশ অর্থাৎ সেলা টপ পেরবার সময় রোমাঞ্চিত বোধ করছিলাম। জানি না শীতের মরসুমে, এত উচ্চতায়, হিমালয়ের আর কোনও গিরিপথ দিয়ে অসামরিক যানবাহন চলাচল করে কিনা। সেলা টপের কাছেই শিবমন্দির রয়েছে কিন্তু প্রতিকূল আবহাওয়ায় দেবদর্শন হল না। কিছুদূর গিয়ে বাঁদিকে সেলা লেক চোখে পড়ল। লেকের জল জমে গেছে। বরফের ওপর থেকে একটা হালকা নীলচে আভা যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

সেলা পাসকে পিছনে ফেলে যতই এগিয়ে যাচ্ছি আবহাওয়ার উন্নতি ঘটতে লাগল। নুরানাং এসে যশোবন্ত গড়ের সামনে যখন গাড়ি দাঁড়াল মেঘের আড়াল থেকে সূর্য বেরিয়ে এল। এই যশোবন্ত গড়ে তৈরি হয়েছে এক বীর সৈনিকের স্মৃতিমন্দির। চিনের আক্রমণ রুখতে যশবন্ত সিং রাওয়াত সিংহবিক্রমে যুদ্ধ করে নিজের প্রাণের বিনিময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি দীর্ঘ সময় আগলে রেখেছিলেন। দিনটা ছিল ১৭ নভেম্বর, ১৯৬২।

জং নামে ছোট্ট এক জনপদে চায়ের জন্য থামতে হল। এমন প্রত্যন্ত গ্রামে, অবেলায়, গরম গরম পুরি জুটবে কল্পনাও করিনি। আমাদের গাড়ি এরপর তাওয়াং গিয়ে থামবে। উদরপূর্তি হলে বোধহয় সৌন্দর্য উপলব্ধির ক্ষমতা বেড়ে যায়, না হলে পথের শোভা বেড়ে গেছে বলে মনে হবে কেন! ওপরে নীল আকাশ, সামনে কালো পিচরাস্তার দু-ধারে সাদা বরফ জমে আছে আর পথ সংলগ্ন পাইন, সিলভার ফার গাছের পাতায় মিহি বরফের গুঁড়ো বেলা শেষের আলো পড়ে ঝকঝক করছে। আমাদের দেশেই যে এমন সুন্দর জায়গা রয়েছে না দেখলে বিশ্বাস হত না। মাইল স্টোনের লেখা দেখে জানা গেল তাওয়াং আর মাত্র কুড়ি কিলোমিটার দূর। মনটা খুশিতে ভরে গেল, অনেকদিনের বাসনা আজ পূর্ণ হতে চলেছে।

উতরাই পথে গাড়ি একটা বাঁক ঘুরতেই মনে হল পৃথিবীর শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেছি। সামনে অনন্ত শূন্য। বিস্তৃত তাওয়াং উপত্যকা তার সমস্ত রূপ নিয়ে চোখের সামনে ধরা দিল। আমরা এক পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে চলেছি আর দূরে অপরদিকের পাহাড়ে তাওয়াং শহর, মাঝখানে তাওয়াং নদীর উপত্যকা। তাওয়াং শহরের এক পাশে, কিছুটা ওপরে অস্তগামী সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত এক প্রাসাদসদৃশ বাড়ি দেখে বেশ চেনা চেনা মনে হল। আরে, ওই তো তাওয়াং মনাস্ট্রি। এই বিখ্যাত বৌদ্ধমঠের ছবি এত দেখেছি যে চিনতে কষ্ট হল না।

আমাদের গাড়ি অনেকটা নামার পর, তাওয়াং চু নদীর ব্রিজ পেরিয়ে আবার চড়াই পথ ধরে অবশেষে তাওয়াং গিয়ে পৌঁছল। তাওয়াং ট্যুরিস্ট লজ মাত্র কয়েক বছর আগে তৈরি হয়েছে। কাচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দেখি সাজানো গোছানো লাউঞ্জ, সুন্দর রিসেপশন কাউন্টার অথচ একজন লোকও নেই। লজের রান্নাঘরে গিয়ে হাজির হলাম। এক বয়স্কা মহিলা এবং এক যুবক উনুনের কাছে বসে, চায়ের গ্লাস হাতে, সুখ-দুঃখের কথা বলছেন। এই যুবকটি হলেন অনিল ভৌমিক, বাড়ি

উত্তর লখিমপুর। পেশায় পাচকের সহকারী। অনিলকে গুরুত্ব না দিলে ঠকতে হবে। শীতের পর্যটকহীন ট্যুরিস্ট লজে অনিলই সর্বেসর্বা। সেই চলল ঘর দেখাতে।

চমৎকার দ্বিশয্যা ঘর। মেঝেতে পুরু কার্পেট, বিছানার কাছে রুম হিটার, বাথরুমে গিজার, আর কী চাই! আরও যে চাওয়ার আছে সেটা মাঝরাতে, শীতে ঘুম ভাঙার পর, টের পেলাম। আরও দুটো রুম হিটার থাকলে ভালো হত। পরদিন ভোরে জানলার পর্দা সরিয়ে দেখি আকাশ একদম পরিষ্কার, সোনালি রোদে চারদিক ঝলমল করছে। প্রাতরাশ সেরে হেঁটেই রওনা দিলাম তাওয়াং মঠের দিকে। ইচ্ছে আছে অনেকক্ষণ সময় কাটাব।

তাওয়াং বেশ বড় শহর। বড় বাণিজ্য কেন্দ্রও বটে। ১৩ এবং ১৪ অক্টোবর, এখানে মহা ধুমধাম সহকারে বুদ্ধ মহোৎসব পালিত হয়েছে। দূর-দূরান্ত থেকে আসা অসংখ্য ভক্ত এবং পর্যটকদের সামাল দিতে নতুন পরিকাঠামো গড়ে ওঠে। গোম্ফা যাবার পথে এক উপজাতীয় পথিকের সঙ্গে আলাপ করলাম। মাথার টুপি বলে দিচ্ছে ইনি মনপা উপজাতির লোক। কালো পশমের গোলাকৃতি টুপি থেকে লম্বা শুঁড় নেমে এসেছে গোটা ছয়েক। ইনিও চলেছেন তাওয়াং মঠে তার ছোট ছেলের সঙ্গে দেখা করতে। ছেলে সেখানে শিক্ষালাভ করছে। আমার ভালোই হল। এই নতুন বন্ধুকে অনুসরণ করে পাকা রাস্তা ছেড়ে পায়ে চলা পথ ধরলাম। নতুন অভিজ্ঞতা হল। কখনও মাঠের ওপর দিয়ে, কখনও কোনও গৃহস্থের উঠোনের মাঝখান দিয়ে কখনও চাষীর সবজিবাগানের পাশ দিয়ে গিয়ে আবার পাকা রাস্তায় উঠলাম। সামনেই তাওয়াং মনাস্ট্রির প্রবেশপথ। প্রার্থনাচক্র ঘোরাচ্ছে ভক্তরা। সারিবদ্ধ প্রার্থনা পতাকা পত পত করে উড়ছে। আমার সঙ্গী জানালেন, খালি হাতে মন্দিরে প্রবেশ করা উচিত নয়। কমপক্ষে এক প্যাকেট ধূপকাঠি বা মোমবাতি অথবা ছোট্ট পবিত্র বস্ত্রখণ্ড যা 'খাতা' নামে পরিচিত, নিলেও চলবে। ধূপকাঠি কিনে বিশাল পাথরের প্রবেশদ্বার দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। বাঁদিকে পরপর কয়েকটি ঘরে ছোট ছোট ছেলেরা সুর করে পড়া তৈরি করছে। কাছেই বসে আছেন গম্ভীর দর্শন লামা শিক্ষক। ডানদিকের মাঠে বেশ কিছু ছেলে দৌড়ঝাঁপ, খেলাধুলো করছে। আমার সঙ্গীর ছেলেটি বাবাকে দেখতে পেয়ে ছুটে এল। চোখেমুখে একরাশ অভিমান। অভিমান তো হবেই। বাবা মা ভাই বোনকে ছেড়ে একটা দশ বছরের বালকের পক্ষে এই প্রবাস জীবন যে অত্যন্ত কঠোর তাতে সন্দেহ নেই।

তাওয়াং মঠের প্রধান বুদ্ধমন্দিরে প্রবেশ করলাম। আট মিটার উঁচু, স্বর্ণকান্তি বুদ্ধমূর্তির সামনে অসংখ্য প্রদীপ, ধূপকাঠি আর মোমবাতি জ্বলছে। দেওয়ালে চড়া রং ব্যবহার করে প্রচুর ছবি আঁকা হয়েছে। ছবির বিষয়বস্তু অশুভ শক্তির পরাজয়। বুদ্ধমূর্তি ছাড়াও রয়েছে অন্যান্য বোধিসত্ত্ব, বৌদ্ধ ধর্মগুরু এবং প্রাচীন লামাদের মূর্তি। বর্তমান দলাই লামার বিরাট ছবিও দেখলাম গভীর ভক্তি সহকারে পূজিত হচ্ছে। চিনের তিব্বত অধিকারের পর দলাই লামা ভারতে আশ্রয় নেবার পথে তাওয়াং মঠে কয়েকদিন কাটিয়েছিলেন।

একটি রণচণ্ডী মূর্তি দেখে আমাদের কালীমূর্তির সঙ্গে মিল খোঁজার চেষ্টা করছিলাম এমন সময় দ্রিম দ্রিম করে ঢাক বেজে উঠল। এর সঙ্গেই আরম্ভ হল

সমবেত কণ্ঠে মন্ত্রপাঠ আর এরপর যখন শিঙা, করতাল, ডমরু আর ঘণ্টা বেজে উঠল পুরো পরিবেশটাই যেন পালটে গেল। ভক্তদের বসার জায়গায় অনেকক্ষণ বসে রইলাম। বাইরের লোক বলতে শুধু আমি। একজন মধ্যবয়স্ক লামা এসে আলাপ পরিচয়ের পর জানালেন, আমি উৎসাহী হলে মনাস্ট্রির নতুন মিউজিয়ামটি তিনি দেখাতে পারেন। আমি তো সঙ্গে সঙ্গে রাজি। শুনেছিলাম তাওয়াং মঠে প্রচুর দুষ্প্রাপ্য পুঁথি, মূর্তি, মুখোশ এবং ঐতিহাসিক সামগ্রী সংরক্ষিত আছে। লামার কাছে জানলাম যে বুদ্ধ মহোৎসবের সময় এই মিউজিয়ামটির উদ্বোধন হয়েছে। নাম দেওয়া হয়েছে গাদেন নামগিয়াল লাসে মিউজিয়াম। লামার সঙ্গে তিনতলায় উঠে, কুড়ি টাকার টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকলাম। এখানে প্রদর্শিত সামগ্রী বৈচিত্রে এবং ঐতিহাসিক মূল্যে অতুলনীয়। একটি ছোট্ট ধাতুনির্মিত বুদ্ধমূর্তি দেখলাম, বয়স এক হাজার বছর। শুধু মূর্তির সংগ্রহ দেখতেই দিন কেটে যাবে। মূর্তি ছাড়া অন্যান্য যেসব বস্তু আছে তা হল প্রাচীন পুঁথি, বিশালাকৃতি রান্নার পাত্র, কাঠের মুখোশ, পুজোর বাসন, দীপদান, নকশাদার কেটলি, থাংকা, নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র, প্রাচীন আমলের তালাচাবি, অস্ত্রশস্ত্র, লামাদের ব্যবহৃত পোশাক এবং ব্যক্তিগত জিনিসপত্র। বেশিরভাগ প্রদর্শিত বস্তুই অন্তত তিনশো বছর প্রাচীন। সবচেয়ে অবাক হয়েছি দুটো হাতির দাঁত দেখে। গজদন্ত এত বিশাল হতে পারে ধারণা ছিল না। মনাস্ট্রির বিস্তৃত প্রাচীর ঘেরা এলাকার মধ্যে ইতস্তত ঘুরে বেরিয়ে একটা চমৎকার বসার জায়গা আবিষ্কার করলাম। এখান থেকে পুরো তাওয়াং শহরটিকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। উপত্যকার চারদিকের উঁচু পাহাড়ে শীতের তুষার বাসা বেঁধেছে। প্রতিদিন এই 'স্নো লাইন' একটু একটু করে নেমে আসবে তাওয়াং শহরের দিকে। তারপর একদিন সকালে উঠে নগরবাসীরা দেখবে পুরো শহরটাই সাদা বরফের চাদরে ঢাকা পড়ে গেছে। শুরু হয়ে যাবে বরফ নিয়ে খেলা আর উৎসব।

প্রায় চারশো বছরের প্রাচীন এই তাওয়াং মঠের গুরুত্ব এবং খ্যাতি লাসার পরেই। পাঁচশো লামার বসবাসের উপযোগী ৬৫টি ছোট-বড় বাসস্থান রয়েছে।

এক বিকট যান্ত্রিক শব্দ কানে আসতে দেখি একটা হেলিকপ্টার নামার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ব্যাগ থেকে বাইনোকুলার বার করে চোখে দিলাম। হেলিকপ্টার নামল শহরের এক প্রান্তে, সামরিক ছাউনিতে। তাওয়াং থেকে ৫৫ কিলোমিটার দূরে, ৪,৩৩১ মিটার উঁচু বুম-লা গিরিপথ অতিক্রম করেই ১৯৬২ সালে চিনের সৈনিকরা ভারতে ঢুকে পড়েছিল।

আমার বাইনোকুলারটিকে কয়েকটি ছেলে কৌতূহল ভরা চোখে দেখছিল। ডাকতেই কাছে এল। দূরবীনের মাধ্যমে দূরের ছোট্ট বাড়িটা যখন হাতের কাছে চলে এল, ছেলেদের সে কী উল্লাস আর আনন্দ। তাওয়াং মঠের কাছেই সম্পূর্ণ মহিলা পরিচালিত একটি মঠ আছে, নাম আন্নি গোম্ফা।

তাওয়াং মনাস্ট্রি দেখে, উতরাই পথে পদব্রজেই পৌঁছে গেলাম ক্রাফট সেন্টারে। সরকারি উদ্যোগে এখানে নানা ধরনের হস্তশিল্পের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তাওয়াং জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে আসা কয়েকজন তরুণের সঙ্গে আলাপ করলাম। একখণ্ড কাঠকে এরা কী অসীম দক্ষতায় দৃষ্টিনন্দন ফুলদানিতে রূপান্তরিত করলেন, চোখের

সামনে না ঘটলে বিশ্বাস হত না। ক্রাফট সেন্টারের কাছেই সরকারি সেলস এম্পোরিয়ামে ঢুকে দেখি কত রকমের সুন্দর জিনিস বিক্রির জন্য সাজানো রয়েছে।

চড়াই পথ ধরে ট্যুরিস্ট লজে ফিরে এলাম। খাওয়া-দাওয়া সারতেই মনে হল শীতটা হঠাৎ বেড়ে গেছে। এর একটাই সমাধান, লেপের মধ্যে আশ্রয় নেওয়া। সন্ধের সময় লজের ম্যানেজার দর্শন দিলেন এবং টাকা-পয়সার হিসেব মিটে যেতেই অদৃশ্য হলেন। শ্রীমান অনিল পুনরায় লজের গুরুদায়িত্ব হাসিমুখে নিজের কাঁধে তুলে নিল। আমার সঙ্গে এখন তার প্রীতির সম্পর্ক। অনিল ইতিমধ্যে আমাকে কথা দিয়েছে আজ রাতে আমার ঘরে দুটো রুম হিটারের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

গুয়াহাটি থেকে প্রতিদিন ভোরে অরুণাচল প্রদেশ রাজ্য পরিবহণের বাস ছাড়ছে বমডিলার উদ্দেশে। টাটা সুমোর জন্য খোঁজ নিন পল্টন বাজার এলাকায়। হাতে সময় থাকলে তেজপুরে (গুয়াহাটি থেকে ১৮৫ কিলোমিটার) একদিন বিশ্রাম নিয়ে পরদিন টাটা সুমোয় চেপে বমডিলা (তেজপুর থেকে ১৬০ কিলোমিটার) যাওয়া যাবে।

কোথায় থাকবেন

ব ম ডি লা য়

সার্কিট হাউস এবং ট্যুরিস্ট লজের জন্য যোগাযোগ করুন:

ডেপুটি কমিশনার, বমডিলা, পিন-৭৯০ ০০১ ☎২২২০২১

সবচেয়ে ভালো **হোটেল-সিফিয়াং পং** ☎২২২৩৭৩

সাধারণ হোটেলের কয়েকটি হল সুইট, দাওয়া, চুকি, এলিট, হোটেল লা।

তা ও য়া ং য়ে

সার্কিট হাউস এবং ইনস্পেকশন বাংলোয় থাকার অনুমতি দেবেন:

ডেপুটি কমিশনার, তাওয়াং ☎২২২২৭২

তাওয়াং ট্যুরিস্ট লজে থাকার অগ্রিম অনুমতি দেবেন:

জেলা পর্যটন আধিকারিক, তাওয়াং ☎২২২৫৮১ (অফিস), ২২২৫৭৬ (বাড়ি)

তাওয়াংয়ে হোটেলের অভাব নেই। তার মধ্যে কয়েকটি হল:

শাংগ্রিলা (☎২২২২৭৫), **প্যারাডাইস** (☎২২২০৬৩), **নিচো** (☎২২২৪৮২), **গোরিচেন** (☎২২২৫৭০), **অ্যালপাইন** (☎২২২৫১৫)।

কখন যাবেন

বমডিলা-তাওয়াং বেড়াবার মরসুম অক্টোবর থেকে এপ্রিল। তবে সেরা সময় নভেম্বর মাস।

ইনারলাইন পারমিট

পারমিটের জন্য ভোটার পরিচয়পত্র সহ আবেদন করতে হবে নিচের ঠিকানায়:

Arunachal Bhawan
Block CE 109/110, Sector-I
Salt Lake City, Kolkata-700 064 ☎2334-1243, 2321-3627

বমডিলার এস টি ডি কোড ০৩৭৮২।

তাওয়াংয়ের এস টি ডি কোড ০৩৭৯৪।

'ভ্রমণ' নভেম্বর ২০০৩

ট্রাকে চেপে কোহিমা থেকে ইম্ফল

নাগাল্যান্ডের কোহিমা থেকে মণিপুরের ইম্ফল এই ১৪২ কিলোমিটার পথ পেরতে গিয়ে এমন নাকানিচোবানি খেতে হবে কে ভেবেছিল? তিন ঘণ্টার পথ পাড়ি দিতে সেদিন সময় লেগেছিল দশ ঘণ্টা। ইম্ফল যাওয়া নিয়ে অল্পবিস্তর সমস্যা হতে পারে এমন একটা ইঙ্গিত অবশ্য আগের দিন খোঁজখবর নেবার সময় পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু তা যে এমন প্রবল আকার ধারণ করবে তা কল্পনাতেও আসেনি।

কোহিমা থেকে যাব ইম্ফল, তবে মুশকিল হল এই দুই জায়গার মধ্যে নিয়মিত ও সরাসরি যাতায়াত করে এমন বাস বা গাড়ি নেই। এমনকী নিজেরা গাড়ি ভাড়া করাও যাবে না কারণ নাগাল্যান্ডের ড্রাইভারদের মণিপুর যেতে প্রবল অনীহা। ব্লু-হিল ট্র্যাভেলস জানাল, তাদের গুয়াহাটি-ইম্ফল বাসে যদি জায়গা খালি থাকে তবে আমরা সেই বাসে যেতে পারব। নাগাল্যান্ড রাজ্য পরিবহণের অফিসে জানতে পারলাম কোহিমা থেকে সরাসরি ইম্ফল যাবার বাস সার্ভিস বর্তমানে বন্ধ থাকলেও আমরা মাও পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে ইম্ফলের বাস পেতে পারি। বাস পালটা-পালটি করতে আমার উৎসাহের অভাব দেখে ডিপোর এক কর্মী বিকল্প পথের সন্ধান দিলেন। সকালের দিকে প্রচুর ট্রাক ইম্ফলের দিকে রওনা দেয়, আমরা ইচ্ছে করলে ট্রাকে চেপেই ইম্ফল পৌঁছে যেতে পারি। এই ভদ্রলোকের কাছেই জানা গেল যে সড়কপথে কোহিমা থেকে ইম্ফল যাত্রা অনিশ্চয়তায় ভরা। রাজনৈতিক বন্‌ধ, ছাত্র বিক্ষোভ, উগ্রপন্থী কার্যকলাপ ছাড়াও নানা কারণে যখন তখন এই পথে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। তাই সড়কপথে ইম্ফল যাবার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা হল গুয়াহাটি থেকে ইম্ফলগামী রাতের বাসে যাত্রা করা।

স্থির হল আগামীকাল ভোরে আমরা প্রথমে চেষ্টা করব গুয়াহাটি-ইম্ফল বাসে ওঠার। তা যদি একান্তই সম্ভব না হয় তবে আমার ভ্রমণসঙ্গী কল্যাণ চক্রবর্তী ও আমি ট্রাকে চেপেই ইম্ফল রওনা দেব।

৭ ডিসেম্বর, ২০০২ ভোর পাঁচটার মধ্যেই পৌঁছে গেলাম বি-ও-সি বাসস্ট্যান্ডে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখি ঝকঝকে গুয়াহাটি-ইম্ফল নাইট সুপার এক্সপ্রেস আসছে। বাস কাছে আসতেই হাত নাড়তে লাগলাম। বাস গতি না কমিয়েই সোজা ইম্ফলের দিকে উধাও হয়ে গেল। একটু হতাশ হলাম বটে তবে ঘাবড়ে গেলাম না। ঘাবড়ে গেলাম এক ঘণ্টা পর। এই এক ঘণ্টায় মোট কটা বাস আমাদের নাকের ডগা দিয়ে

চলে গেল গোনা হয়নি। হঠাৎ খেয়াল হল আশপাশের লোকজন অবাক হয়ে আমাদের কাণ্ডকারখানা দেখছে। এদের মধ্যেই একজন আমাদের উদ্ধার করতে এগিয়ে এলেন। সব শুনে জানালেন বাসের আশা ত্যাগ করে ট্রাকে উঠে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। উনি নিজেই উদ্যোগী হয়ে একটা ইম্ফলগামী ট্রাকে আমাদের তুলে দিলেন।

ড্রাইভারের কেবিনেই জায়গা হয়ে গেল। ড্রাইভার মণিপুরী, নাম নবকুমার সিং। চেহারা দেখলে মনে হয় মাঝবয়সী এক বাউল, গালে দাড়ি, মাথায় চুলের ঝুঁটি, গলায় তুলসীর মালা আর দুচোখে গভীর প্রশান্তি। কেবিনের অন্য দুজন যাত্রী মাও পর্যন্ত যাবে। ঘড়িতে সাড়ে ছটা বাজে। মনে মনে একটা হিসেব কষে নিলাম। ১৪২ কিলোমিটার যেতে খুব বেশি হলে পাঁচ ঘণ্টা লাগবে, অর্থাৎ মধ্যাহ্নভোজন ইম্ফলেই হবে।

কোহিমা শহর ছাড়িয়ে একটা ছোট্ট ঝরনার কাছে ট্রাক দাঁড়িয়ে পড়ল। আমরা ঝরনার ধারে বসে সঙ্গে আনা খাবার দিয়ে প্রাতরাশ সারলাম। প্রায় এক ঘণ্টা পর আবার গাড়ি ছাড়ল। এই ট্রাকটি আসছে আসামের তেজপুর থেকে।

আমরা চলেছি ৩৯ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে। কোহিমা থেকে কুড়ি কিলোমিটার পাহাড়ি পথ পেরিয়ে ছোট্ট নাগা গ্রাম জাখামা। এই জাখামা থেকেই হাঁটা পথ চলে গেছে নাগাল্যান্ডের অন্যতম সুন্দর জায়গা জুকো উপত্যকায়। ৭,৮০০ ফুট উঁচু এই উপত্যকাটিকে বলা হয় ট্রেকারদের স্বর্গ। সবুজ ঘাসে ঢাকা এই পার্বত্য ভূমিতে রয়েছে অসংখ্য রডোডেনড্রন গাছ যা গ্রীষ্মের আগমনে সাদা, হলুদ আর লাল রঙের ফুলে ঢাকা পড়ে যায়। জাখামা ছাড়িয়ে কিছুদূর গিয়ে আমাদের ট্রাক পথের ধারে দাঁড়িয়ে পড়ল। চালক নবকুমার জানাল, পিছন থেকে সেনাবাহিনীর কনভয় আসছে, তাদের পথ ছেড়ে দিতে হবে। একটু পরেই মোট ২৩টি গাড়ির এক লম্বা কনভয় আমাদের পাশ দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ ধরে মণিপুরের দিকে এগিয়ে গেল।

পাহাড়ি পথ ধরে আমরা চলেছি। তবে এই পাহাড় আমাদের অতিপরিচিত হিমালয়ের পাহাড় নয়। নাগা পাহাড়, খাসি পাহাড় আর মিজো পাহাড় হিমালয়ের অংশ নয়। এইসব পাহাড়ের উচ্চতা অপেক্ষাকৃত কম হলেও এদেরও একটা আলাদা সৌন্দর্য আছে। চলার পথে ছোট ছোট নাগা গ্রাম চোখে পড়ছে। লোকজনের বেশভূষা এবং ভাবভঙ্গিতে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব প্রকাশ পাচ্ছে। প্রচুর ছেলেমেয়েকে দেখলাম স্কুলে যাচ্ছে। পরনে সুন্দর ইউনিফর্ম, পিঠে স্কুল ব্যাগ আর চলায় পাহাড়ি ঝরনার ছন্দ।

জাখামা ছাড়িয়ে প্রায় দশ কিলোমিটার যাবার পর নিরাপত্তারক্ষীদের হাতে একদফা তল্লাশির পর নাগাল্যান্ড-মণিপুর সীমান্তে পৌঁছনো মাত্র পাঁচ-ছয়জন অস্ত্রধারী পুলিশ আমাদের ট্রাক ঘিরে ফেলে সবাইকে নেমে আসতে আদেশ করল। ড্রাইভারের কেবিন থেকে আমাদের দুই বন্ধুকে নামতে দেখে নাগাল্যান্ড পুলিশ তো অবাক। চেকপোস্টের ভারপ্রাপ্ত প্রবীণ নাগা অফিসারটি আমাদের সব কথা শুনে সাদরে তাঁর অফিস ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। আমাদের জন্য চা-বিস্কুট চলে এল। এই নাগা ভদ্রলোকের নাম বেনডাং আও। উনি কথায় কথায় জানালেন যে, আমাদের ট্রাকে করে বেআইনি মাল পাচার হচ্ছে বলে খবর আছে, তাই খুব ভালো করে পরীক্ষা করার পরেই ট্রাকটিকে ছাড়া হবে। বেশ কয়েক ঘণ্টার ধাক্কা। আমাদের

চিন্তাগ্রস্ত দেখে তিনি ভরসা দিয়ে বললেন, চিন্তার কিছু নেই, দেখছি আপনাদের ইম্ফল যাবার কী ব্যবস্থা করা যায়।

আমরা নিশ্চিন্ত মনে চেকপোস্টের আশপাশে ঘুরে বেড়ালাম। এই জায়গাটির নাম খুজামা। অদূরেই মণিপুরের এলাকা আরম্ভ হয়েছে। কাছেই বেশ বড় পুলিশ ক্যাম্প চোখে পড়ল। ক্যাম্পের সামনেই নবকুমার সিং এবং তার ট্রাকের সন্ধান পেলাম। আমাদের দেখে নবকুমার বলল, আপনারা অন্য গাড়িতে ইম্ফল চলে যান। ভেবেছিলাম আও সাহেব তাঁর প্রভাব খাটিয়ে খুব সহজেই আমাদের ইম্ফলগামী কোনও বাসে তুলে দেবেন, কিন্তু বাস্তবে তা ঘটল না। কোনও বাসেই সিট খালি নেই। শেষপর্যন্ত একটা ট্রাকেই আমাদের জায়গা হল। ফুড কর্পোরেশনের এই ট্রাকটি গমের বস্তা নিয়ে ইম্ফল চলেছে। নতুন উদ্যমে আমরা মণিপুরের দিকে রওনা দিলাম।

ঠিকমতো গুছিয়ে বসার আগেই মণিপুরের মাও শহরে চলে এসেছি। কোহিমা থেকে ৩৬ কিলোমিটার দূরে এই বড় শহরটির অধিবাসীরা সবাই নাগা। কোহিমার সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। শহরের ভেতর দিয়ে যাবার সময় বেশ কয়েকটি বড় আবাসিক স্কুল চোখে পড়ল।

আমাদের এই ট্রাকের চালক এবং খালাসি দুজনেই নেপালি। ড্রাইভার পরশুরাম গুরুং এমনিতে বেশ হাসিখুশি মানুষ কিন্তু তাঁকে নিয়ে সমস্যা হল তাঁর ইম্ফল যাবার কোনও তাড়া নেই। শুধু তাই নয় প্রতিটি পথসংলগ্ন গ্রামেই তাঁর পরিচিত লোকের বাস। চলার পথে দেখা হয়ে গেলে দুটো প্রাণের কথা না বললে কী চলে! একের পর এক গাড়ি যখন আমাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে পরশুরাম তখনও হয়তো তাঁর প্রিয় কুকুরের অকালমৃত্যুর কাহিনী তাঁর এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়কে শুনিয়ে চলেছে। ধৈর্যের অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে একে একে পেরিয়ে গেলাম তাডুবি, মারামবাজার আর লাইরাউচং। এরপর থেকেই রাস্তার অবস্থা খারাপ হতে আরম্ভ করল। আমাদের ট্রাকভর্তি গমের বস্তা, তাই প্রথম থেকে তার গতি ছিল কচ্ছপের মতো, এবার ভাঙাচোরা রাস্তায় উঠে ট্রাক চলল শামুকের গতিতে। এই বেহাল রাস্তার ধারেই একসময় চোখে পড়ল বেশ কিছু ঘরবাড়ির জটলা। আমাদের ট্রাক গিয়ে দাঁড়াল এক শ্রীহীন ঘরের সামনে। টিনের ওপর কাঁচা হাতে বড় বড় করে লেখা 'হোটেল পশুপতিনাথ'। ট্রাকের চালক এবং তাঁর খালাসি এখন মধ্যাহ্নভোজন সারবেন। আমরা দুই বন্ধু চা আর পাউরুটি দিয়ে লাঞ্চ করে কাছেপিঠে ঘুরে বেড়ালাম। স্থানীয় বাসিন্দারা সবাই নেপালি, বেশ কিছু মোষের খাটাল দেখলাম। এখান থেকে দুধ যায় নিকটবর্তী বড় শহর সেনাপতিতে। একটা নতুন তথ্যও পাওয়া গেল। সেনাপতি থেকে ইম্ফলের বাস পাওয়া যাবে।

সেনাপতি শহরে পৌঁছলাম বেলা একটা নাগাদ। ট্রাক থেকে নেমে বাস টার্মিনাসে গিয়ে দেখি কয়েকটি বাস দাঁড়িয়ে আছে। লোকের ভিড়ে পথচলা দায়। যে বাসটি ইম্ফল যাবে তাতে দাঁড়াবার জায়গা নেই। পরবর্তী গাড়ির সঠিক খবর কেউ দিতে পারল না। একজন দোকানদার জানাল মাও থেকে ইম্ফল যাবার বাসের আসার সময় হয়ে গেছে। এই মাও শহরের ওপর দিয়েই আমরা এসেছি, আমাদের উচিত ছিল সেখানেই ইম্ফলের বাসে উঠে বসা। একটু পরেই সেই বাস এসে হাজির হল।

বাসে ভর্তি যাত্রী। নামল দশজন, উঠল পনেরো জন। বাসের দরজা বন্ধ করাই সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। সব মিলিয়ে সে এক চরম বিশৃঙ্খল অবস্থা।

দেখতে দেখতে বাস টার্মিনাস ফাঁকা হয়ে এল। চোখে পড়ল দূরে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটি মারুতি গাড়ি। সেনাপতি থেকে ইম্ফলের দূরত্ব ৬০ কিলোমিটার। কিন্তু গাড়ির ড্রাইভাররা এমন দর হাঁকল যে পিছিয়ে এলাম।

ইতিমধ্যে ইম্ফল যাওয়ার দিনের শেষ বাসটিও চলে গেল। অনেকে বললেন যে ট্রাকে কাংপোকপি গিয়ে, সেখান থেকে মিনিবাস করে ইম্ফল যাওয়া যায়।

এবার সত্যিই অবাক কাণ্ড। পেয়ে গেলাম আমাদের আগের সেই চেকপোস্টে আটকে যাওয়া ট্রাকটি। সেনাপতি থেকে কাংপোকপি ১৫ কিলোমিটার দূর। কাংপোকপি গিয়ে দেখি গোটা তিনেক মিনিবাস দাঁড়িয়ে আছে। খুব সহজেই বসার জায়গা পাওয়া গেল।

কাংপোকপি শহরের চেহারা পশ্চিমবঙ্গের আর পাঁচটা মফস্বল শহরের মতো। সকালে নাগাল্যান্ডের ছেলেমেয়েদের স্কুলে যেতে দেখেছিলাম, আর এখন এই বেলা শেষে মণিপুরী ছাত্রছাত্রীদের দেখলাম স্কুল থেকে বাড়ি ফিরতে। আমাদের মিনিবাস তখন ইম্ফল উপত্যকার মাঝখান দিয়ে ৪৫ কিলোমিটার দূরের ইম্ফল শহরের দিকে চলেছে। ভারি বিচিত্র এই উপত্যকা, প্রায় ২,২৫০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই সমতল ভূমির চারদিকেই পাহাড়। এই পাহাড়েই বাস করে বিভিন্ন উপজাতির নাগারা। এরা প্রায় সবাই খ্রিস্টান। উপত্যকার অধিবাসীরা পরিচিত মৈতেই নামে। এরা বৈষ্ণব মতাবলম্বী। উপত্যকার মানুষের সঙ্গে পাহাড়ি নাগাদের দ্বন্দ্ব কয়েক শতাব্দী প্রাচীন। এই ঐতিহাসিক বৈরিতার আগুন এখনও পুরোপুরি নেভেনি, তাই মাঝে মধ্যেই পরিস্থিতি অশান্ত হয়ে ওঠে। পথের দুধারেই বিস্তীর্ণ খেত পাকা ধানে পূর্ণ হয়ে আছে। অনেক জায়গায় ধান কাটার কাজ চলছে। আমাদের বাস একে একে পেরিয়ে গেল মতবুং বাজার, সেকমাই বাজার, লাওয়াং আর সাংগাম। এরপর ঘরবাড়ি এবং লোকজনের সংখ্যা বাড়তে আরম্ভ করল। বুঝতে পারলাম বাস ঢুকছে ইম্ফল শহরে।

বাস থেকে নেমে খোঁজ নিয়ে জানলাম আমাদের গন্তব্য থাঙ্গলবাজার যেতে হলে রিকশা নিতে হবে। রিকশাস্ট্যান্ডে গিয়ে দেখি বেশিরভাগ রিকশাচালকের মুখ রুমাল দিয়ে ঢাকা। রাস্তার ধুলো এড়াতেই এই ব্যবস্থা। থাঙ্গলবাজার পৌঁছে মনে হল এ কোথায় এলাম! রাস্তার লোকজন, দোকানদার, মারোয়াড়ি ভোজনালয় আর হনুমানজির মন্দির দেখে মনে হচ্ছিল আমরা ইম্ফলে নয়, উত্তর ভারতের কোনও শহরে উপস্থিত হয়েছি। ব্যবসার সূত্রে কয়েক পুরুষ ধরে মারোয়াড়ি বিহারি এবং উত্তরপ্রদেশের বহু মানুষ ইম্ফলে বাস করছেন। থাঙ্গলবাজার এলাকায় এরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। আমরা উঠলাম নবনির্মিত নির্মলা হোটেলে। দ্বিশয্যার ঘরভাড়া ৩৩০ টাকা থেকে শুরু। ইম্ফলের বিখ্যাত খইরামবান্দবাজার এখান থেকে বেশি দূরে নয়। এই বাজারটির বৈশিষ্ট্য হল এখানকার সব বিক্রেতাই মহিলা। ইম্ফল শহরের মণিপুরী অধিবাসীরা এর নাম দিয়েছেন 'নুপি কেউ থেল' অর্থাৎ মহিলা বাজার। অনেকে আবার বলেন 'ইমা মার্কেট' বা মায়েদের বাজার। বাজারে গিয়ে দেখলাম সত্যি তাই। প্রমীলাদের এখনও যাঁরা অবলা বলে মনে করেন, এই বাজার দেখার পর

অবশ্যই তাঁদের ধারণা পাল্টাবে। মহিলা বিক্রেতাদের পরনে লুঙির মতো এক বস্ত্রখণ্ড, গায়ে চাদর, কপালে আর নাকে রসকলি, মুখে পান আর আচরণ অত্যন্ত সপ্রতিভ। মাছের বাজারে রকমারি মাছ নিয়ে বসা পসারিনী মাছি তাড়াচ্ছে লাঠির মাথায় বাঁধা কাপড় নাড়িয়ে। ছোট আকারের মাছ বিক্রি হচ্ছে ওজনের বদলে ডজন দরে। সবজিবাজারেও ওজনের পরিবর্তে কৌটোর মাপে বিক্রি হচ্ছে কড়াইশুঁটি, কাঁচালঙ্কা, রসুন, উচ্ছে আর আমড়া। বাজারের একটি অংশে পর পর শুধু শুকনো মাছের দোকান। আবার আরেক জায়গায় পান-সুপুরির বাজার। বস্তা বস্তা গোটা সুপুরি রাখা আছে বিক্রির জন্য। বাজারের এক ধারে বিক্রি হচ্ছে জামাকাপড়, মণিপুরী চাদর, বেডকভার আর মশারি। এতই বৈচিত্রময় এই বাজার যে দুঘণ্টা সময় দেখতে দেখতে কেটে গেল।

প্রাতরাশ সেরে হাজির হলাম নির্মলা হোটেলের কাছেই ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে। ইম্ফল থেকে গাড়িতে মৈরাং লোকটাক ঘুরে আসার ভাড়া ৮০০ টাকা।

সকাল নটা নাগাদ রওনা দিলাম মৈরাংয়ের দিকে। ইম্ফল শহর ছাড়িয়ে আমরা সোজা দক্ষিণ দিকে চলেছি। পথে চোখে পড়ল মহিলা ট্রাফিক পুলিশ দক্ষ হাতে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করছে। ইম্ফল বিমানবন্দর পেরিয়ে যাবার পর জনবসতি পাতলা হতে আরম্ভ করল, তারপর শুধুই ধানখেত আর সবজিবাগান। মাঝে মধ্যে ছোট ছোট গ্রাম। পুকুর সংলগ্ন মাটির বাড়ির চালে লাউ গাছ; ঠিক যেন গ্রামবাংলার ছবি।

মৈরাংয়ের পথে প্রথম উল্লেখযোগ্য জনপদ নামবলবাজার পেরিয়ে আমাদের গাড়ি গিয়ে থামল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত সৈনিকদের স্মৃতির উদ্দেশে জাপানি উদ্যোগে তৈরি 'ইন্ডিয়া পিস মেমোরিয়াল'-এর সামনে। সুন্দর বাগানের মাঝখান দিয়ে পথ চলে গেছে স্মৃতিসৌধের দিকে। নির্মিত হয়েছে 'স্মৃতি-প্রাচীর'।

ইম্ফল থেকে লোকটাকের পথে প্রথম বড় জনপদ বিষ্ণুপুর এক প্রাচীন ঐতিহাসিক শহর। ইম্ফল থেকে দূরত্ব ২৭ কিলোমিটার। রাজা কিয়াম্বার আমলে ১৪৬৭ খ্রিস্টাব্দে তৈরি এখানকার বিখ্যাত বিষ্ণুমন্দিরটি দেখতে বড় রাস্তা ছেড়ে একটু ভেতরে ঢুকতে হল। নির্মাণশৈলীতে চিনা প্রভাব স্পষ্ট বোঝা যায়। প্রায় সাতশো বছর আগে চিনারা একবার মণিপুর আক্রমণ করে ব্যর্থ হয়। অনেক চিনা সৈন্যকে বন্দী করা হয়। পরবর্তী সময়ে এরা মণিপুরেই স্থায়ীভাবে থেকে যায় এবং এদের কাছ থেকেই মণিপুরীরা গুটিপোকার চাষ এবং ইট তৈরি করা শেখে। বিষ্ণুপুরের আরেকটি খ্যাতি পাথরের তৈরি জিনিসপত্রের জন্য।

বিষ্ণুপুর থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরে ফুবালা যাবার পর দূরের লোকটাক লেকের এক ঝলক দৃশ্য চোখে পড়ল। এখানে প্রচুর মৎস্যজীবীর বাস, যারা লোকটাকের ওপর নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর ফুবালাতে রাত্রিবাসের জন্য যে সুন্দর বাংলোটি তৈরি হয়েছিল তা এখন নিরাপত্তাবাহিনীর দখলে। এখানে না থেমে আমরা আরও ৫ কিলোমিটার এগিয়ে গিয়ে পৌঁছে গেলাম মৈরাং শহরে। মৈরাং মোটামুটি বড় শহর। রাস্তায় লোকজন এবং যানবাহনের ভিড়ে আমাদের গাড়িকে ঘন ঘন দাঁড়াতে হচ্ছিল।

মৈরাং শহরের অবস্থান লোকটাকের পাশে হলেও বিশাল এই জলাশয়ের সৌন্দর্য ভালোভাবে উপভোগ করতে হলে মৈরাং থেকে আরও তিন কিলোমিটার দূরের

সেন্দ্রা দ্বীপে যেতে হবে। আমাদের অ্যাম্বাসাডর কিছুক্ষণের মধ্যেই এক অপ্রশস্ত পথ ধরে এক টিলার দিকে এগিয়ে চলল। পথের দুপাশেই জল। এই পথটি তৈরি হবার পর এখন জল না পেরিয়ে সেন্দ্রা দ্বীপে যাওয়া যাচ্ছে। টিলার পাদদেশে চোখে পড়ল বেশ কয়েকটি বাস দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভার দেবেন্দ্র জানাল, আজ রবিবার তাই প্রচুর লোকজন এসেছে বনভোজন করতে। আমাদের গাড়ি সোজা উঠে গেল টিলার ওপর। গিয়ে দেখি লোকে লোকারণ্য। একাধিক কলেজের ছেলেমেয়েরা এসেছে পিকনিক করতে। একদিকে রান্নার ব্যবস্থা আর অন্যদিকে খেলাধুলো-গানবাজনার আসর বসেছে।

এগিয়ে গেলাম লোকটাক ভিউ পয়েন্টে। দিগন্তবিস্তৃত লোকটাকের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ছোট ছোট পাহাড়। পাহাড় না বলে টিলা বলাই ভালো। টিলার কোলে জেলেদের কুঁড়ে ঘর দেখা যাচ্ছে। আর দেখা যাচ্ছে জলের ওপর বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো অগুনতি গোলাকৃতি ভূখণ্ড। এই টুকরো টুকরো দ্বীপগুলি আসলে মানুষের তৈরি ভাসমান বাগান। ঘনসংবদ্ধ গুল্ম, পানা, শর, জলজ ঘাস আর উদ্ভিদ মিলে সৃষ্টি হয়েছে ফুমদি। এই ফুমদির ওপর প্রয়োজনমতো মাটি ফেলে দিব্যি সবজিবাগান তৈরি করেছে লোকটাকের মানুষ। শুধু তাই নয়, এর ওপর বাঁশ আর খড় দিয়ে তৈরি ছোট ছোট কুটিরে বাস করছে লোকটাক লেকের ওপর নির্ভরশীল মানুষেরা। বেশ কিছুটা দূরে, জলের ওপর পরিযায়ী পাখিদের উপস্থিতি। মাঝে মধ্যেই একঝাঁক পাখি জল ছেড়ে আকাশে ডানা মেলছে, কিছুক্ষণ চক্কর কেটে আবার নেমে পড়ছে লেকের জলে। লোকটাকের বুকে সবসময় কোনও না কোনও ঘটনা ঘটেই চলেছে। এই দেখা গেল নৌকোর ওপর দাঁড়িয়ে 'চাইনিজ ফিশিং নেট' দিয়ে মাছ ধরছে এক জেলে। একটু পরেই ডিঙি নৌকো বেয়ে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে এক কিশোর। তার ছোট্ট নৌকোয় শোভা পাচ্ছে টাটকা ফুলকপি, মুলো, লাইশাক আর লাল টুকটুকে টমেটো। শীতের নরম রোদ গায়ে মেখে লোকটাক দর্শন এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়ে রইল।

সেন্দ্রা দ্বীপের একধারে ভাসমান রেস্তোরাঁতে চা খেয়ে নৌকোয় উঠে পড়লাম। মাথাপিছু পনেরো টাকায় আধঘণ্টা লোকটাকের জলে ভেসে বেড়াবার এক সুন্দর ব্যবস্থা। নৌকোর মাঝি এক ছোট্ট ভাসমান সবজিবাগানে নৌকো লাগাল। আমরা কয়েকজন বাগানের ওপর উঠে একটু লাফালাফি করে বোঝার চেষ্টা করলাম ভাসমান উদ্যানের বৈশিষ্ট্য, কিন্তু তেমন কিছুই বোঝা গেল না।

ফিরে চললাম মৈরাংয়ের দিকে। মনে শুধু একটাই খেদ। লোকটাক সংলগ্ন বিখ্যাত কৈবুল লামজাও ন্যাশনাল পার্ক আমাদের অদেখা রয়ে গেল। সেন্দ্রা দ্বীপ থেকে এর দূরত্ব পাঁচ কিলোমিটার। পার্কের আয়তন মাত্র ৪০ বর্গ কিলোমিটার হলেও নাচুনে হরিণের জন্য এর খ্যাতি দেশে-বিদেশে। এই প্রজাতির হরিণ ভারতের অন্য কোনও অরণ্যে নেই। মণিপুরীদের কাছে এই হরিণ সাঙ্গাই নামে পরিচিত। ইংরিজিতে নাম দেওয়া হয়েছে Brow Antlered Deer। কৈবুল লামজাও আমাদের না যাবার কারণটি হল সাঙ্গাই হরিণের দেখা পাওয়া যায় ভোরের দিকে আর শেষবেলায়, তাই পার্কের বনবাংলোয় একটা রাত না কাটালেই নয়।

মৈরাং শহরে প্রবেশ করে প্রথমেই গেলাম আজাদহিন্দ বাহিনীর সংগ্রহশালা দেখতে। দোতলা বাড়ির সামনেই রয়েছে নেতাজির মূর্তি। প্রথম মূর্তিটি দুষ্কৃতকারীদের হাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবার পর বর্তমান মূর্তিটি স্থাপিত হয় ২ অক্টোবর, ১৯৯৩। মূর্তির কাছেই রয়েছে এক বাঁধানো বেদি। এই সেই স্থান যেখানে পরাধীন ভারতের মাটিতে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিল আজাদহিন্দ বাহিনী। দিনটা ছিল ১৪ এপ্রিল, ১৯৪৪। আই এন এ মিউজিয়ামের একতলায় আছে পাঠাগার আর দোতলায় রয়েছে একাধিক প্রদর্শনীকক্ষ। দেখলাম প্রচুর দুষ্প্রাপ্য ছবি, নথিপত্র, চিঠি, ঘোষণাপত্র, মানচিত্র আর আজাদহিন্দ বাহিনীর ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র, ইউনিফর্ম ইত্যাদি।

মণিপুরী সমাজে মৈরাং এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এখানেই রয়েছে বনদেবতা থানজিংয়ের প্রাচীন মন্দির। এই মন্দিরকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে মৈতেই সংস্কৃতির এক বিশেষ ধারা খাম্বা-থৈবী নৃত্যশৈলী। প্রতিবছর মে মাসে মৈতেই নারী-পুরুষ খাম্বা-থৈবীর অমর প্রেমকথা নিয়ে রচিত 'লাই-হারাওবা' উৎসব এই নৃত্যকলা এবং সঙ্গীতের মাধ্যমে পালন করেন।

এক ঘণ্টার মধ্যেই ইম্ফল শহরে ফিরে এসে রওনা হলাম গোবিন্দজির মন্দিরের উদ্দেশে। দেবালয়ের সামনে বিশাল মন্দির প্রাঙ্গণ। লোহার কাঠামোর ওপর টিনের আচ্ছাদন দেওয়া এই প্রাঙ্গণে দোল এবং রাস উৎসবের সময় কয়েক হাজার ভক্তের সমাগম হয়। এই গোবিন্দজির মন্দিরকে মণিপুরে বৈষ্ণবধর্মের প্রধান পীঠস্থান বলা হয়। মন্দিরের দুই গম্বুজাকৃতি শীর্ষ দূর থেকে চোখে পড়ে। মন্দিরে রয়েছে কৃষ্ণ, বলরাম এবং জগন্নাথের বিগ্রহ। সন্ধ্যা আরতির সময় মূল মন্দিরের দরজা বন্ধ থাকে। নাটমন্দিরে দুটি সারিতে ভক্তবৃন্দ দেব দর্শনের জন্য অপেক্ষা করে রয়েছেন। আমরাও তাঁদের পাশে বসে পড়লাম।

ঢং ঢং করে বিরাট দড়িটানা ঘণ্টা বেজে উঠতেই মন্দিরের দরজা আস্তে আস্তে খুলতে আরম্ভ করল। সমগ্র মন্দির চত্বর মুখরিত হল ভক্তদের সমবেত কণ্ঠের জয়ধ্বনিতে। এই জয়ধ্বনির সঙ্গে যখন মন্দিরা, কাঁসর আর দুন্দুভির শব্দ যুক্ত হল পুরো পরিবেশটাই হয়ে উঠল স্বর্গীয়।

মন্দির দর্শন করে হোটেলে ফেরার পথে কানে এল সহস্র কণ্ঠের উচ্ছ্বাসধ্বনি। শুনলাম কাছের মাঠেই মণিপুরী পোলো খেলা চলছে। গাড়ি থেকে নেমে দেখতে চললাম। 'সোগোল কাংজেই' নামে মণিপুরীদের কাছে পরিচিত এই পোলোতে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের ঘোড়ার ব্যবহার খেলার মধ্যে গতি এবং বৈচিত্র আনতে সাহায্য করেছে। ঘোড়ার পিঠে সওয়ার খেলোয়াড়দের মাথায় কাপড়ের কান ঢাকা পাগড়ি, এক হাতে লম্বা ছড়ি আর অন্য হাতে ঘোড়ার লাগাম। সব মিলিয়ে একদল রণকুশল অশ্বারোহী সৈনিকদের কথা মনে করায়। পোলো ছাড়া আরও কয়েকটি খেলা মণিপুরের নিজস্ব। যেমন হকি এবং মল্লযুদ্ধ মিলিয়ে তৈরি করা খেলা 'মুকনা কাংজেই'। আরেকটি অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা হল মণিপুরী রাগবি যা 'ইউবি লাকপি' নামে পরিচিত। এই খেলাতে রাগবি বল হিসেবে ব্যবহার করা হয় তৈলাক্ত একটি নারকেল। এত সুন্দর একটা দেশ, এত প্রাচীন এবং গৌরবময় অধিবাসীদের

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অথচ উগ্রপন্থী কার্যকলাপের জন্য পর্যটকদের আসা প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে।

পরদিন ইম্ফল শহরেই ঘোরাঘুরি করলাম। টিকেন্দ্রজিৎ পার্কে শহিদ মিনার, স্টেট মিউজিয়াম, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত সৈনিকদের সমাধিক্ষেত্র, চিড়িয়াখানা, কালীবাড়ি, অর্কিড বাগান আর বিশাল এলাকা নিয়ে তৈরি 'খুমান লামপাক স্পোর্টস কমপ্লেক্স' দেখে নিলাম। বিকেলে আরেকবার গেলাম গোবিন্দজির মন্দিরে, সন্ধ্যা আরতি দেখতে।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

কলকাতা থেকে ইম্ফল যাবার সবচেয়ে সহজ উপায় বিমান যাত্রা। অ্যালায়েন্স এয়ার এবং জেট এয়ারওয়েজের বিমান এই আকাশপথে চলাচল করে। জেট এয়ারওয়েজ সম্প্রতি ইম্ফলে এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্য কয়েকটি শহরে অতিরিক্ত উড়ানের ব্যবস্থা করেছেন। যাঁরা স্থলপথে যেতে আগ্রহী তাঁদের প্রথমে ট্রেনে গুয়াহাটি আসতে হবে। সবচেয়ে ভালো গাড়ি সরাইঘাট এক্সপ্রেস। হাওড়া থেকে বুধ, বৃহস্পতি এবং রবিবারে ছাড়ে। গুয়াহাটির পল্টনবাজার থেকে বেশ কয়েকটি পরিবহণ সংস্থার আরামপ্রদ বাস সোজা ইম্ফল যাচ্ছে, ভাড়া ৩৭৫ টাকার মধ্যে। সময় লাগবে ১৬-১৭ ঘণ্টা।

যদিও মণিপুরের অশান্ত পরিস্থিতি পর্যটকদের দূরে সরিয়ে রেখেছে তা সত্ত্বেও হঠাৎ ডাকা 'বন্‌ধ' এবং পথ অবরোধের ঘটনা ছাড়া অন্য কোনও বিপদের মধ্যে আজ পর্যন্ত কোনও পর্যটককে পড়তে হয়নি।

ইম্ফল থেকে ফেরার পথে নাগাল্যান্ডের রাজধানী কোহিমায় ২-৩ দিন থাকা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ইনারলাইন পারমিট জোগাড় করতে হবে নিচের ঠিকানায়:

Deputy Resident Commissioner
Nagaland Bhawan, 11, Shakespeare Sarani
Kolkata-700 071 ☎ 2282-5247, 2282-5226

কোথায় থাকবেন

গুয়াহাটিতে রাত্রিবাসের জন্য পল্টন বাজারে প্রচুর হোটেল আছে। তিনশো টাকার ভেতর দ্বিশয্যার ঘর পাওয়াটা কোনও সমস্যাই নয়।

ইম্ফলেও হোটেলের অভাব নেই।

থাঙ্গলবাজার এলাকায় অবস্থিত কয়েকটি হোটেলের নাম জানাচ্ছি যেখানে ৩৫০-৪০০ টাকার মধ্যে পছন্দসই দ্বিশয্যারঘর পাওয়া যাবে। **হোটেল নির্মলা,** এম জি অ্যাভেনিউ, থাঙ্গালবাজার ☎ ২২২৮৯০৪, ২২২৯০১৪; **হোটেল দিশ ডিলাক্স,** খোয়াথঙ্গ রোড, থাঙ্গালবাজার ☎ ২২২০৬০৮, ২২২০২০৬; **হোটেল প্রিন্স,** থাঙ্গালবাজার ☎ ২২২০৫৮৭; **হোটেল আনন্দ কন্টিনেন্টাল,** খোয়াথং রোড, থাঙ্গালবাজার ☎ ২২২৩৪৩৩; **হোটেল হোয়াইট প্যালেস,** থাঙ্গালবাজার ☎ ২২২০৫৯৯

কখন যাবেন

মণিপুর বেড়াবার মরসুম অক্টোবর থেকে এপ্রিল। সেরা সময় নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাস।

ইম্ফলের এস টি ডি কোড: ০৩৮৫।

'ভ্রমণ' মার্চ ২০০৪

জলপথে অরুণাচল

ব্রহ্মপুত্রের উজান বেয়ে অরুণাচল প্রদেশে যাব বলে ডিব্রুগড় শহরে এসে উপস্থিত হলাম এক শীতের দুপুরে। আসামের চায়ের খ্যাতি ভুবনজোড়া আর এই চা ব্যবসার এক অতি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ডিব্রুগড়। শহরের উত্তরে ব্রহ্মপুত্র আর দক্ষিণে শুধু একের পর এক চা-বাগান। একটা রাত কাটিয়ে কাল ভোরে নৌকোয় উঠতে হবে, তাই আশ্রয় নিলাম প্রায় শতাব্দী-প্রাচীন কুসুম হোটেলে। হোটেলের সামনের অংশটি তার পুরনো চেহারা বজায় রেখেছে। পিছনের অংশটি নবনির্মিত এবং আধুনিক। হোটেলের যে ঘরটি আমার জন্য খুলে দেওয়া হল, শুধু এই ঘরটিতে থাকার জন্যই কলকাতা থেকে কষ্ট করে এতদূরে আসা চলে। দোতলার ওপর পুরো কাঠের তৈরি ছোট্ট কিন্তু পরিচ্ছন্ন ঘরটিতে সিঙ্গল খাট পাতা যা বহু বছর আগে সম্ভবত কোনও চা-বাগানের বাংলোর শোভাবর্ধন করত। ঘরের অন্য আসবাবপত্রও মিউজিয়ামে রাখার যোগ্য। কুসুম হোটেলের অবস্থান মারোয়াড়ি পট্টি এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রায় সবার আদি নিবাস ছিল বিহার, উত্তরপ্রদেশ বা রাজস্থান। ডিব্রুগড়ে বাঙালির সংখ্যাও কম নয়।

বেলা তিনটে নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম শহর দেখতে। বেশ বড় শহর এই ডিব্রুগড়। মেডিক্যাল কলেজ তৈরি হবার পর শহরের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। বড় বড় কোম্পানির সুসজ্জিত শো-রুম দেখে মনে হয় কলকাতায় আছি। রাস্তাঘাটে প্রচুর লোকজন। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানেই নিরাপত্তা বাহিনীর সতর্ক পাহারা। হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেলাম ব্রহ্মপুত্রের কাছে। উদ্দেশ্য, খোঁজ-খবর করা, কাল ভোরে নৌকো কোথা থেকে, কখন ছাড়বে, কত ভাড়া ইত্যাদি। ব্রহ্মপুত্র দর্শন করে হতাশ হলাম। ভেবেছিলাম বিশাল এক জলপ্রবাহ দেখতে পাব, কিন্তু কোথায় কী! বিস্তৃত এক বালুকাময় প্রান্তর চোখের সামনে ভেসে উঠল। সরু সরু কয়েকটা জলের ধারা বয়ে চলেছে। এর মধ্যেই দেখি যাত্রীবোঝাই এক জিপগাড়ি নদীর বুকে নেমে সোজা এগিয়ে চলেছে। জানা গেল, এই জিপ চলেছে ফেরিঘাট। যাত্রীরা সেখানে ব্রহ্মপুত্রের প্রধান জলস্রোত অতিক্রম করে সোনেরিঘাটে পৌঁছবেন। খোঁজ নিয়ে জানলাম ডিব্রুগড় থেকে জলপথে অরুণাচল প্রদেশ যেতে গেলে এখান থেকে আরও দশ কিলোমিটার উজানে গিয়ে যন্ত্রচালিত বড় নৌকোয় উঠতে হবে। তার জন্য জিপের ব্যবস্থা আছে, ভাড়া মাথাপিছু ৩০ টাকা। নৌকোর ভাড়া জনপ্রতি ৮৫ টাকা। সকাল আটটায় ছেড়ে আট ঘণ্টা চলার পর নৌকো পৌঁছবে অরুণাচলের ওরিয়াম ঘাট। সেখানে পাশিঘাট যাবার বাস দাঁড়িয়ে থাকবে, দূরত্ব ৩৭ কিলোমিটার।

হোটেলে ফিরে দেখি রিসেপশন কাউন্টারে একজন সৌম্যদর্শন, প্রবীণ লোক হাসিমুখে এবং অনায়াস দক্ষতায় সবদিক সামাল দিচ্ছেন। পরিচয়ের পর মুহূর্তে আপন করে নিলেন। ইনি হলেন অমল কর। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে অনেকটা শখের বশে হোটেলের কাজে সময় দিচ্ছেন। আমার ভ্রমণসূচি জানতে পেরে উৎসাহ দিয়ে বললেন, 'কোনও চিন্তা নেই, সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

আমার সামনেই পাশিঘাটে হোটেল সিয়াং-কে ফোন করে ঘর বুক করে দিলেন। তারপর ফোন করলেন এক জিপগাড়ির মালিককে। ঠিক হল কাল ভোর সাড়ে ছটায় গাড়ি হোটেল থেকে আমাকে তুলে নেবে।

জলপথে প্রয়োজন হবে ভেবে শুকনো খাবার কিনতে চলে গেলাম 'ওসমান বেকারি'। দোকান তখন বন্ধ হবার মুখে। এক কর্মচারী সবিনয়ে জানাল, আজ আর নয়। আমি ততোধিক মিষ্টি করে বললাম, 'আপনাদের সুনাম শুনে এতদূর থেকে এসেছি।' আমাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দোকানের শাটার বন্ধ করে দেওয়া হল। তিন মিনিটেই কেনাকাটা শেষ, তারপর শুধু গল্প আর আড্ডা। মালিক এবং কর্মীদের যেন বিশ্বাস হতে চায় না চাকরি বা ব্যবসার প্রয়োজন ছাড়া কেউ এভাবে ঘুরে বেড়াতে পারে। বড় এক প্যাকেট বিস্কুট দোকানের তরফ থেকে আমাকে উপহার দেওয়া হল।

৩ ডিসেম্বর ২০০১, সোমবার সকাল সাড়ে ছটায় জিপে চড়ে রওনা দিলাম ফেরিঘাটের উদ্দেশে। গাড়িতে বারো-তেরোজন যাত্রী। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখি জিপ চলেছে ব্রহ্মপুত্রের উঁচু পাড়ের ওপর দিয়ে। আধঘণ্টার মধ্যেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেলাম। নদীর ঘাটে গিয়ে আরেকবার হতাশ হতে হল। অপ্রশস্ত জলরাশির ওপর এক শ্রীহীন জলযান নোঙর করা আছে। চেহারা দেখে বিশ্বাস হচ্ছিল না এই বুড়ো নৌকোই আমাকে নিয়ে যাবে স্বপ্নের দেশ অরুণাচলে। দেখতে দেখতে যাত্রী এবং মালপত্রে নৌকো ভরে উঠল। প্রচুর কেরোসিনের ড্রাম, চাল, ডাল, চিনি, পেঁয়াজের বস্তা আর বনস্পতির টিন তোলা হল। নৌকোর একদিকে কাঠের আচ্ছাদন দেওয়া যাত্রীদের বসার ব্যবস্থা আর টয়লেট। অন্যদিকে ইঞ্জিন ঘর। ইঞ্জিন ঘরের প্রশস্ত ছাদে অনেক খালি বস্তা রাখা ছিল। বেশ কিছু বুদ্ধিমান যাত্রী দেখি বস্তাকে গদি বানিয়ে বসে আছেন। আমিও একজনের পাশে বসে পড়লাম। আলাপ হতে দেরি হল না। আমার নতুন বন্ধুর নাম রহিমুদ্দিন শেখ। বাড়ি ধেমাজি জেলার জোনাই বাজারে।

সকাল আটটায় নৌকোয় প্রাণসঞ্চার হল। ইঞ্জিনের গর্জন শুনে প্রাণ জুড়িয়ে গেল। কী দাপট! 'বুড়ো' বলার জন্য নৌকোর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলাম।

অভিজ্ঞ লোকের কাছে শুনেছি উত্তর-পূর্ব ভারত বেড়াবার পক্ষে সেরা সময় নাকি ডিসেম্বর মাস। কথাটা বোধহয় সত্যি। কী চমৎকার আবহাওয়া। আকাশ একদম পরিষ্কার, বাতাসে হিমের পরশ। নৌকো চলতেই ঠান্ডা হাওয়া সামলাতে উইন্ডচিটার গায়ে দিতে হল। একটু পরেই নৌকো পরস্পর যুক্ত বিভিন্ন জলধারাকে অতিক্রম করে ব্রহ্মপুত্রের প্রায় মাঝখানে চলে এল। আমাদের বাঁদিকে অনেক দূরে, অরুণাচলের নীলাভ শৈলমালা দেখা যাচ্ছে, আর ডানদিকে শুধু চা-বাগান। নদীর জলের রং ঘোলাটে। নদীর বিশালতা এবার অনেকটাই বোধগম্য হচ্ছে। এখন শীতের সময় জল কম বলে অসংখ্য চর জেগে উঠেছে। কয়েকটি চরের আয়তন

এতই বিশাল যে তাদের দ্বীপ বলাই ভালো। এখানে উদ্যোগী কৃষিজীবী চাষের কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে। উর্বর মাটিতে অল্প পরিশ্রমেই সোনার ফসল ফলছে, বর্ষাকালে এইসব ছোট-বড় চর জলের তলায় চলে যায়। ব্রহ্মপুত্র তখন আর নদী থাকে না, সাগর হয়ে যায়। তার সেই ভয়াল রূপ দেখলে বুক কেঁপে উঠবে।

নদী চর নিয়ে ভাবনার জাল ছিন্ন হল ঢং-ঢং করে ঘণ্টার আওয়াজ কানে যেতে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নৌকোর ইঞ্জিনও বন্ধ হয়ে গেল। রহিমুদ্দিন জানালেন, এ হল বিপদ সঙ্কেত, অর্থাৎ জলের গভীরতা বিপজ্জনক ভাবে কমে গেছে। একবার নৌকো যদি জলের তলার মাটিতে আটকে যায় তাহলেই সর্বনাশ, এ সুন্দরবনের নদী নয় যে জোয়ারের জল এসে উদ্ধার করবে। ব্যাপারটা ভালো করে বোঝার জন্য নৌকোর সামনের দিকে চলে গেলাম। একজন লোক লম্বা বাঁশের লগি নিয়ে জলের গভীরতা মেপে সারেংকে নৌকোর গতিপথ নির্ণয় করতে সাহায্য করছে। বিপদ কেটে গিয়ে অবস্থা স্বাভাবিক হতেই সারেংয়ের সঙ্গে আলাপ করলাম। পরদেশি এবং উৎসাহী লোক দেখে কেবিনের দরজা খুলে পাশে বসতে বললেন। সারেংকে এখানকার লোকেরা মাঝি বলে। আমাদের এই মাঝির দেশ ভাগলপুর। ওর মামা ছিলেন এই নদীপথের এক ওস্তাদ কাণ্ডারি। আকাশ দেখে আর বাতাস অনুভব করে উনি নির্ভুল আবহবার্তা ঘোষণা করতেন। ইতিমধ্যে একটি ছেলে এসে চা দিয়ে গেল। যাত্রীরা দাম দিয়ে চায়ের শখ মেটাতে পারেন। যাঁরা দুপুরের খাবার খেতে ইচ্ছুক তাঁদের আগেই অর্ডার দিয়ে দিতে হবে। গরম ভাত, ডাল, তরকারি আর মুরগির ঝোল পাওয়া যাবে, দাম ৪৫ টাকা।

মাঝির সঙ্গে আড্ডায় মেতে ছিলাম তাই খেয়াল করিনি, নদীপথের দৃশ্য কখন যেন বদলে গেছে, এখন আমার সামনে শুধু জল আর জল। মাঝি জানাল, জলের গভীরতা কিন্তু বেশি নয়। মাঝি হঠাৎ আঙুল তুলে বলে উঠল 'ওই দেখুন পাখি'। দূরে, বাঁদিকের জলের ওপর অসংখ্য পাখির মেলা। তাড়াতাড়ি ব্যাগ থেকে বাইনোকুলার বার করে চোখে দিলাম। পাখি চিনতে অসুবিধে হল না। এদের বলা হয় ডোরাশির রাজহাঁস (BAR HEADED GOOSE)। এই পরিযায়ী পাখিটি শীতকালে এই অঞ্চলে উড়ে আসে। গায়ের রং হালকা বাদামি আর মাথার পিছনে দুটো কালো দাগ আছে। আমাদের নৌকো আরও একটু কাছে যেতেই রাজহাঁসের দল একসঙ্গে, বিরাট শব্দ করে, আকাশে উঠে পড়ল কিন্তু উধাও হয়ে গেল না। আকাশে কয়েক চক্কর মেরে দূরে গিয়ে আবার জলে বসে পড়ল। এত সুন্দর পরিবেশে পাখি দেখার আনন্দই আলাদা। এই নদীপথে আর যেসব পাখি আমার চোখে পড়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মেটে হাঁস (GREY DUCK), বালিহাঁস, খুন্তে বক, কোঁচ বক, সাদা কাঁক (GREY HERON), পানকৌড়ি আর মাছরাঙা। এছাড়া আরও কয়েকটি পাখি দেখেছি যাদের চিনতে পারিনি। শীতকালে ব্রহ্মপুত্র পাখিদের কাছে স্বর্গ বিশেষ।

রাজহাঁস দেখে নৌকোর খোলে ঢুকলাম অন্য যাত্রীরা কী অবস্থায় আছেন দেখতে। জায়গাটিকে এককথায় বলা যায় এ যেন নৌকোর অন্দরমহল। মহিলারা বাচ্চা-কাচ্চা সামলাতেই জেরবার। বেশিরভাগ পুরুষ যাত্রী নৌকোর ছাদে বসে তাস খেলায় মশগুল। যাঁরা সে স্বাধীনতাটুকু অর্জন করে উঠতে পারেননি তাঁরা বিরস বদনে

পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি নজর দিচ্ছেন। এখানেই আলাপ হল এক মারোয়াড়ি যুবকের সঙ্গে, নাম রাজেশ আগরবাল। পাশিঘাটের সম্পন্ন ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলে, ডিব্রুগড়ে এক পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এখন সপরিবারে ঘরে ফিরছেন। উনি কথায় কথায় জানালেন যে এই জলপথটি বেশ পুরনো। অরুণাচলে রাস্তাঘাটের অবস্থা যখন খুব খারাপ ছিল তখন এই নৌকোই ছিল পাশিঘাট অঞ্চলের লোকদের একমাত্র ভরসা। ইদানীং সাধারণ যাত্রীরা জলপথে পাশিঘাটে না এসে ডিব্রুগড়ে নদী পেরিয়ে শিলাপাথার দিয়ে সড়কপথেই যাওয়া-আসা করেন। কথাবার্তার মধ্যেই রাজেশবাবু বলে উঠলেন, 'ব্রহ্মপুত্রের ভাঙন দেখুন' মুখ বাড়িয়ে দেখি আমাদের নৌকো চলেছে নদীর ডানতীর ঘেঁসে। আমাদের একেবারে কাছেই দেখা যাচ্ছে এক চা-বাগানের অনেকখানি অংশ নদীগর্ভে হারিয়ে গেছে। বাগানের লোকজন অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে দেখছে। কয়েকটি চা-গাছ ডুবন্ত মানুষের মতো মাটি কামড়ে ঝুলে আছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রযুক্তির ক্ষমতা নেই এই ভাঙনকে ঠেকাবে। ভারতবর্ষে ব্রহ্মপুত্রই বৃহত্তম নদ যার ওপর কোনও বাঁধ নির্মিত হয়নি। ব্রহ্মপুত্র তাই স্বাধীন। সে চলে তার নিজের খেয়ালে।

বেলা একটায় মধ্যাহ্নভোজন পরিবেশিত হল। অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝে এক চলমান জলযানের ছাদে বসে খাবার অভিজ্ঞতা চিরদিন মনে থাকবে। পেটে ভাত পড়লে বোধহয় অনুভূতি দুর্বল আর সুপ্তি প্রবল হয়ে ওঠে। ভাতঘুমের প্রভাব কাটার পর চোখ মেলে দেখি একটা দ্বীপে সারি সারি সবুজ রঙের তাঁবু খাটানো আছে। বেশ কিছু বিদেশি পুরুষ এবং মহিলাকে দেখলাম শিশুসুলভ আনন্দে মেতে আছেন। কয়েকজন মিলে ভলিবল খেলছেন। কেউ কেউ নদীর ধার ধরে জলের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছেন। আমাদের দেখে হাত নাড়লেন। এঁরা বিত্তবান বিদেশি পর্যটকের দল। এঁদের ভারত ভ্রমণের পদ্ধতি একটু অন্যরকম। এঁরা জানে প্রকৃতিকে কী করে উপলব্ধি করতে হয়। এখন দেখতে পাচ্ছি নদীর জল অনেক পরিষ্কার আর জলে স্রোতও অনেক বেশি। বোঝা গেল নৌকো আস্তে আস্তে জলপথ বেয়ে ওপরে উঠছে। যাত্রীদের মধ্যে হঠাৎ একটা চাঞ্চল্য জেগে উঠল। জোনাই ঘাট এসে গেছে। ওরিয়াম ঘাট যাবার পথে শুধু এখানেই নৌকো থামে। নৌকোর বেশিরভাগ যাত্রী নেমে গেলেন। নতুন যাত্রীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন মঙ্গোলীয় চেহারার উপজাতীয় মানুষকে দেখে মনে হল, অরুণাচলের দিকেই যাচ্ছি বটে। জোনাই থেকে ওরিয়াম ঘাট এক ঘণ্টার পথ। এই এক ঘণ্টার মধ্যেই দৃশ্যপট দ্রুত পাল্টাতে লাগল। নদী এখনও বেশ প্রশস্ত বটে কিন্তু প্রকৃতির কী খেয়ালে নদী যেন ডানদিকে হেলে পড়েছে। ফলে জলস্রোতের সবটাই নদীর ডানদিক ঘেঁসে তীব্র বেগে প্রবাহিত হচ্ছে আর নদীর বাঁদিক সোনালি বালিতে পূর্ণ। বড় বড় বনস্পতির কঙ্কাল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। এগুলি হল গত বর্ষার স্মৃতিচিহ্ন। আমাদের জলযান যতই এগিয়ে চলেছে জলের স্বচ্ছতাও যেন বেড়ে চলেছে। মনে বাসনা ছিল ব্রহ্মপুত্রের ওপর দারুণ একটা সূর্যাস্ত দেখব কিন্তু শীতের আদিত্য নেমে গেল বন-পাহাড়ের আড়ালে তাই মনের ইচ্ছা অপূর্ণ রয়ে গেল।

দিনের আলো কমে আসছে। নদী সংলগ্ন জঙ্গল বেশ ঘন বলেই মনে হল। আন্দাজ

করলাম ধারেকাছেই রয়েছে ডি এরিং অভয়ারণ্য, যার খ্যাতি বিভিন্ন প্রজাতির পাখির জন্য। হঠাৎ দেখি ঝোপঝাড় ঠেলে নদীর পাড়ের দিকে গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে আসছে বড়সড় এক প্রাণী, গায়ের রং বাদামি, মাথায় শিং রয়েছে। কী ওটা? সম্বর হরিণ? শিং এত ছোট কেন? হায় কপাল, এ যে দেখছি গৃহপালিত গাভী। তার মানে ধারে কাছে নিশ্চয়ই গ্রাম আছে। যাত্রীরা আরেকবার চঞ্চল হয়ে উঠল। আমাদের নৌকো গিয়ে ভিড়ল অরুণাচলের ওরিয়াম ঘাটে।

পাশিঘাটের ছোট বাস যেন আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিল। যাত্রীরা ওঠা মাত্র ছেড়ে দিল। পাশিঘাটের ভাড়া নিল কুড়ি টাকা। অরুণাচলে প্রবেশ করেছি কিন্তু আমার ইনারলাইন পারমিট ব্যাগ থেকে বার করার প্রয়োজন হল না। পারমিট দেখার লোক কোথায়? আসলে এই পথে স্থানীয় লোকেরাই যাতায়াত করেন, বাইরের লোক কালে-ভদ্রে। ঘড়িতে দেখি চারটে বেজে গেছে, আলো বেশ কমে এসেছে। ওই আলোতেই দেখলাম ছোট্ট উপজাতীয় গ্রাম। কয়েকঘর দোকান-পাট, স্থানীয় মানুষের জটলা, বাচ্চাদের খেলাধুলা। ছোট্ট বাগান শীতের শাক-সবজিতে সবুজ হয়ে আছে, তারপর ঘন জঙ্গল।

পূর্ব সিয়াং জেলার সদর পাশিঘাটে গিয়ে পৌঁছলাম সন্ধে ছটা নাগাদ। প্রায় সমতল শহরটি আলোয় ঝলমল করছে, রাস্তায় লোক চলাচল ভালোই। প্রচুর দোকান, কিন্তু ক্রেতার ভিড় চোখে পড়ল না। হোটেল সিয়াংয়ে আমার জন্য একটি দ্বিশয্যার ঘর খুলে দেওয়া হল। ভাড়া ২০০ টাকা, আমি একা বলে একটু ছাড় পাওয়া যাবে। থাকা-খাওয়ার জন্য হোটেলটিকে মধ্যবিত্ত পর্যটকদের পছন্দ হবে।

একটু বিশ্রাম নিয়ে, চা খেয়ে বাইরে বেরিয়ে চমকে উঠলাম। ঘড়িতে মাত্র সাতটা বাজে, এর মধ্যেই রাস্তাঘাট প্রায় জনশূন্য, বেশিরভাগ দোকান-পাট বন্ধ হয়ে গেছে। মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে একটা শহরের চেহারা এমন আমূল পাল্টে যেতে পারে, আমার ধারণা ছিল না। পরবর্তীকালে এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে উত্তর-পূর্ব ভারতের বেশিরভাগ শহরে। উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম শুধু গুয়াহাটি আর আগরতলা।

বাধ্য হয়ে হোটেলে ফিরে গিয়ে রিসেপশন কাউন্টারে বসা ছেলেটির সঙ্গে আলাপ জমালাম। একা বেড়াবার সমস্যা আছে বটে কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হল মানুষের সাহচর্য এবং বন্ধুত্ব। কাউন্টারে ডিউটিতে রয়েছে রূপেশ ছেত্রী। নেপালি পরিবারের ছেলে হলেও ভালো বাংলা বলে। কথায় কথায় রূপেশকে অনুরোধ করলাম পাশিঘাট ঘুরে দেখার জন্য আগামীকাল একটা সাইকেল যোগাড় করে দিতে। সাইকেল ভাড়া যা লাগবে দেব। চৌকশ ছেলে রূপেশ সাইকেলের বদলে গোটা একটা অটোরিকশার ব্যবস্থাই করে দিল। সিয়াং হোটেলেই আরেক ভদ্রলোক পাশিঘাট ঘুরে দেখতে ইচ্ছুক ছিলেন। রূপেশ আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল। একটি চমৎকার যৌথ-উদ্যোগের সূচনা হল।

ভোরবেলায় লোকজনের হাঁকডাকে ঘুম ভেঙে গেল। বেড টি দিতে আসা ছেলেটি জানাল আমার ঘরের পাশেই বাজার বসেছে। চললাম বাজার দেখতে। রাস্তার ধারে হরেকরকম তরি-তরকারি আর শীতের শাক-সবজি বিক্রি করছে উপজাতীয় স্ত্রী-পুরুষ। নানা ধরনের কন্দ এবং ওল চোখে পড়ল। স্তূপীকৃত আলু, পেঁয়াজ, আদা,

রসুন বিক্রি করছে বিহারি দোকানদার। মাছের বাজারে বাঙালি ব্যবসায়ীদের আধিপত্য। বিরাট আকারের মাগুর, বোয়াল এবং আড় মাছ বিক্রি হচ্ছে। মাছের বাজারে বেশ কয়েকজন প্রবাসী বাঙালিকে দেখলাম যাঁদের নজর ট্যাংরা, পারসে, পুঁটি, মৌরলার মতো ছোট মাছের দিকে। বাজারের একপ্রান্তে দেখি বেশ ভিড়। কাছে গিয়ে দেখি মিথুনের মাংস বিক্রি হচ্ছে। অরুণাচলের বেশ কিছু উপজাতীয় মানুষের কাছে মিথুনের গুরুত্ব অসীম। আদি, আপাতানি, নিশি, মিশমি, আকা, মিজি এবং বাংনি উপজাতির মানুষ যে-কোনও গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মিথুন বলি দিয়ে তার মাংস আত্মীয় এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে বিতরণ করেন। এই প্রাণীটিকে অর্ধ-গৃহপালিত জীব বলা যেতে পারে। গ্রামের নিকটবর্তী জঙ্গলে এরা স্বাধীনভাবে বিচরণ করে এবং মানুষের সান্নিধ্যে এরা অভ্যস্ত। পাশিঘাটের বাজারে মিথুনের মাংস যারা কিনছে তাদের মধ্যে বেশিরভাগ খদ্দের উপজাতীয় আর বাকিরা নিম্নবিত্ত সমতলের মানুষ। বাজারে আমার পরবর্তী অভিজ্ঞতা ইঁদুরের দোকানে। বড় আকারের মেঠো ইঁদুর বিক্রি হচ্ছে ডজন দরে। ইঁদুরগুলিকে মেরে, পাতলা দড়ি মুখে ঢুকিয়ে মালার মতো তৈরি করা হয়েছে। খদ্দের এসে ইঁদুরের শরীর স্বাস্থ্য দেখে দরদাম করছে। শিক কাবাবের মতো কায়দায় তৈরি করা মূষিকের মাংস নাকি অতি উপাদেয়।

বাজার দেখে, চায়ের সন্ধানে এক দোকানে ঢুকলাম। দোকানি উত্তরপ্রদেশের লোক। খদ্দের কম তাই কথা বলার অসুবিধে নেই। তিনি জানালেন, পাশিঘাট থেকে লক্ষ্মী সেদিনই বিদায় নিয়েছেন যেদিন থেকে সুপ্রিম কোর্টের আদেশে কুণ্ডার ব্যবসা বন্ধ করে দিতে হয়েছে। গাছের গুঁড়িকে এখানে কুণ্ডা বলা হয়। সিয়াং নদীর উজানে, গভীর জঙ্গলে, বড় বড় গাছ কেটে গুঁড়িগুলি নদীর জলে ফেলে দেওয়া হত। তীব্র স্রোতে ভেসে সেই গুঁড়ি চলে আসত পাশিঘাটে। পাশিঘাট হয়ে উঠেছিল কাঠ ব্যবসার এক বিরাট কেন্দ্র। স্থানীয় লোকেদের হাতে তখন অঢেল পয়সা। তবে এই লাভদায়ক ব্যবসার পুরোটাই নিয়ন্ত্রণ করত সমতলের মানুষ।

সকাল নটা নাগাদ আমি এবং গণপত জৈন অটোরিকশায় উঠে বসলাম। চালক পাশিঘাট এবং কাছেপিঠের দ্রষ্টব্যস্থল দেখিয়ে নিয়ে আসবে, ভাড়া ১৭০ টাকা। প্রথমেই রওনা দিলাম সবচেয়ে সুন্দর স্পট সিয়াং নদীর দিকে। যাবার পথে পাশিঘাটের বিমানক্ষেত্রটি চোখে পড়ল। আমাদের সামনেই একটা হেলিকপ্টার এসে নামল। কয়েক দশক আগে, যখন অরুণাচলের রাস্তাঘাটের উন্নতি হয়নি, প্রত্যন্ত স্থানে কর্মরত সরকারি কর্মীদের যাওয়া-আসা এবং খাবার-দাবার পাঠানোর একমাত্র বাহন ছিল হেলিকপ্টার।

নদীর তীরে গিয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল। সিয়াং এত সুন্দরী! আকাশের নীলিমা নদীর স্বচ্ছ জলে প্রতিফলিত হয়ে জলধারাকে নীল রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে। নদীর ওপারে হাল্কা নীল পাহাড়ের গায়ে খণ্ড-খণ্ড সাদা মেঘ হেঁটে বেড়াচ্ছে। ওই পাহাড়ের পিছনেই লুকিয়ে আছে আদি-পাশিদের গ্রাম। সিয়াং নদীর উৎপত্তি মানস সরোবরের দক্ষিণ-পূর্বের এক হিমবাহ থেকে। তিব্বতে এর পরিচিতি সাংপো নামে। সাংপো নদী অরুণাচলে প্রবেশ করে নতুন নাম পেল সিয়াং। সিয়াং দিবাং এবং লোহিত নদীর

মিলিত জলধারা আসামের সমতলে নেমে নাম পেল ব্রহ্মপুত্র। পাশিঘাটের খেয়াঘাটে নদী পারাপারের জন্য বড় নৌকোর ব্যবস্থা রয়েছে। ঘাটের কাছে কমলালেবু বিক্রি করছে দুটি মেয়ে। তাদের কাছেই জানলাম এ লেবু খুব মিষ্টি আর এসেছে আলং থেকে। লেবুর দোকানেই আলাপ এক আদি উপজাতীয় দম্পতির সঙ্গে। সোতাইলাম বোনাং ও তার স্ত্রী। দুজনেই রাজ্য সরকারের কর্মী। ভদ্রমহিলার হাতে একটা বেতের চুপড়িতে রাখা ছোট আরশোলার মতো পোকার প্রতি আমার কৌতূহল দেখে উনি জানালেন, এ হল এক ধরনের বিটল। নদীর ধারে পাথরের নীচে পাওয়া যায়। আদি সমাজে খুব সমাদৃত এই পোকা। বিশেষ পদ্ধতিতে রান্না করলে নাকি বেশ মুখরোচক।

পূর্ব ও পশ্চিম সিয়াং জেলার প্রধান উপজাতীয় জনগোষ্ঠী হল আদি। শিক্ষা, সম্পদ এবং জীবনযাত্রার মানে আদিরা অন্যদের থেকে এগিয়ে। প্রকৃতি উপাসক আদিদের প্রধান উৎসব হল সোলুং আর মোপিন। প্রথমটি অনুষ্ঠিত হয় সেপ্টেম্বরের প্রথমে আর দ্বিতীয়টি এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে। উৎসবের দিনে ঘরে তৈরি রাইসবিয়ার আপং ঢালাওভাবে পরিবেশিত হয়।

সিয়াংকে ছেড়ে যেতে মন চাইছিল না, কিন্তু উপায় নেই, অটোচালক তাড়া দিচ্ছে। আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থল সিয়াং নদীর ওপর নির্মীয়মাণ ব্রিজ। এই বিশাল কংক্রিটের সেতুটি তৈরি হয়ে গেলে এই অঞ্চলের মানুষ, বিশেষ করে দিবাং উপত্যকার অধিবাসীরা দারুণ উপকৃত হবেন। এতদিনে হয়তো ব্রিজ তৈরি হয়ে যেত, কিন্তু অর্ধ-সমাপ্ত ব্রিজ গত ১১ জুন, ২০০০-এ এক আকস্মিক জল-প্লাবনে প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এবার আমরা চলেছি ডাঙ্গারিবাবার শিবমন্দির। আমার সফরসঙ্গী গণপত জৈন এতক্ষণ একটু চুপচাপ ছিলেন এবার ঠাকুর-দেবতার নাম শুনে নড়েচড়ে বসলেন। এই শিবমন্দিরটির অবস্থান আলং যাবার পথে। শিবভক্ত সাধু ডাঙ্গারিবাবার নামেই এটি বেশি পরিচিত। গিয়ে দেখলাম মন্দিরটি সম্প্রতি নতুন করে তৈরি হয়েছে। আর পাঁচটা শিবমন্দিরের সঙ্গে এর তেমন কোনও তফাত নেই শুধু একটা ব্যাপারে এই দেবালয়টি একটু আলাদা। মন্দিরের সংলগ্ন বিশাল এবং অদ্ভুত দর্শন এক বটগাছ। গাছের গোড়ায় অসংখ্য বটের ঝুরি প্রকৃতির খেয়ালে বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে। দেখলে মনে হয় যেন এক জটাধারী, ধ্যান-নিমগ্ন নাগা সন্ন্যাসী বসে আছেন।

দেবদর্শন শেষে অটো মুখ ঘোরাল পাশিঘাটের দিকে। গণপতবাবুর ইটানগরে ওষুধের ব্যবসা। ওঁর কিছু কাজ ছিল জেলা হাসপাতালে তাই আমারও সুযোগ হয়ে গেল অরুণাচলের একটা বড় স্বাস্থ্যকেন্দ্র দেখার। বেশ বড় হাসপাতাল এবং যথেষ্ট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। হাসপাতালের শীর্ষপদে একজন বাঙালি ডাক্তার আছেন দেখে গর্ব অনুভব করলাম। এরপর আর অটো থেকে নামা নয়। চালক দূর থেকেই দেখিয়ে দিল জওহরলাল নেহরু কলেজ, সার্কিট হাউস, ডেপুটি কমিশনারের অফিস আর বনদপ্তর। সবশেষে অটো এসে থামল হোটেল সিয়াংয়ে।

দুপুরের খাওয়া সেরেই ছুটলাম সিয়াং নদীর ধারে। সবুজ ঘাসে ঢাকা এক নিরালা জায়গায় বসে পড়লাম।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

কলকাতা বা গুয়াহাটি থেকে বিমান এবং ট্রেনপথে ডিব্রুগড় যাওয়া যাবে। গুয়াহাটি থেকে ডিব্রুগড় আরামপ্রদ বাসেও যাওয়া যায়, দূরত্ব ৪৪০ কিলোমিটার। পাশিঘাট হল অরুণাচলপ্রদেশের অন্যতম প্রবেশদ্বার। এখান থেকে আলং, দাপোরিজো, জিরো হয়ে ইটানগর চলে যাওয়া যাবে। প্রতিটি শহরেই পর্যটকদের থাকার সুব্যবস্থা আছে। যাতায়াতের জন্য রয়েছে বাস এবং চমৎকার টাটা সুমো সার্ভিস।

ইটানগর থেকে বমডিলা এবং তাওয়াং বেড়িয়ে গুয়াহাটি ফিরে গেলে অরুণাচলের অনেকটাই দেখা হয়ে যাবে।

ইনারলাইন পারমিট: পারমিটের জন্য ভোটার পরিচয়পত্র সহ যোগাযোগ করতে হবে নীচের ঠিকানায়:

Arunachal Bhawan
Block CE-109/110, Setor-I
Salt Lake City, Kolkata-700 064
☎ 2334-1243, 2358-4107

পারমিট ফি: ১৫ টাকা

কোথায় থাকবেন

ডিব্রুগড়ে প্রচুর হোটেল। কুসুম হোটেলে থাকার সুবিধে হল এরাই পাশিঘাটে 'হোটেল সিয়াং'-এ থাকার ব্যবস্থা করে দেবেন। এদের কাছেই ওরিয়াম ঘাটগামী নৌকোর সর্বশেষ তথ্য পাওয়া যাবে।

কুসুম হোটেল, ঝালুকপাড়া, ডিব্রুগড়, পিন-৭৮৬ ০০১
☎ (০৩৭৩) ২৩২০১৪৩, ২৩২৩৯৭৮

পাশিঘাটে সার্কিট হাউস এবং জেলা পরিষদ বাংলোয় থাকার অনুমতি দেবেন:

ডেপুটি কমিশনার, পাশিঘাট ☎ (০৩৬৮) ২২২৩৪০

পাশিঘাটে মাঝারি মানের হোটেলের মধ্যে কয়েকটি হল:

হোটেল সিয়াং ☎ (০৩৬৮) ২২২২০৯, **হোটেল অরুণ, হোটেল সাংগো।**

কখন যাবেন

অরুণাচল প্রদেশ বেড়াবার মরসুম অক্টোবর থেকে এপ্রিল মাস। সেরা সময় নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাস।

'ভ্রমণ' সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০০৩

মানালি থেকে লে

কালকা থেকে সকাল সাতটা নাগাদ এক বেসরকারি বাসে চেপে রওনা দিলাম ৩২০ কিলোমিটার দূরের মানালির উদ্দেশে। সুন্দরনগর হয়ে মাণ্ডিতে এসে দেখা হল বিপাশার সঙ্গে। নদী সংলগ্ন পথ ধরেই একে একে পেরিয়ে গেলাম পানডো, আউট, বাজাইরা, কুলু, রাইসন আর কাতরাইন। চলার পথে মাঝে মধ্যেই আপেলের বাগান চোখে পড়ছে। গাছভর্তি আপেল। কয়েকটি গাছের আপেলের রং সবুজ, এদের বলা হয় 'সোনালি আপেল' আর লাল রঙের আপেলগুলি পরিচিত 'রয়্যাল' নামে।

সন্ধের আগেই পৌঁছে গেলাম মানালি। পাহাড়ের কোলে এক আপেল বাগিচার পাশেই হলিডে হোম। তিনতলায় উঠে ঘরের জানালার সামনে দাঁড়াতেই দেহমনের সব ক্লান্তি নিমেষে উধাও। চোখের সামনে অস্তগামী সূর্যের নরম আলোয় কুলু উপত্যকা তার সমস্ত সৌন্দর্য নিয়ে বিরাজমান। পাইনগাছে ঢাকা দুই পর্বতশ্রেণীর মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে চঞ্চলা বিপাশা। নদীর দুই তীরবর্তী চাষের জমি ঘন সবুজ। আকাশে ভাসমান খণ্ড খণ্ড মেঘে রং ছুড়ে প্রভাকর যেন দোল খেলায় মেতেছেন।

নির্দিষ্ট দিনে মানালি থেকে লে যাত্রা সুনিশ্চিত করতে হিমাচল প্রদেশ ট্যুরিজমের কলকাতা অফিস থেকে বাসের টিকিট কেটেছিলাম ১,২০০ টাকা দিয়ে। এর মধ্যে সারচুতে রাতের খাওয়া, তাঁবুতে থাকা এবং পরদিন প্রাতরাশের খরচ ধরা আছে। দুটি রাত মানালিতে কাটিয়ে ১৪ আগস্ট, ২০০৩, ভোর সাড়ে পাঁচটায় পৌঁছে গেলাম মানালির ট্যুরিস্ট অফিসের সামনে। বাস ছাড়বে সকাল ছটায়। ডিপো থেকে বাস এল দেরিতে। বাসের চেহারা এবং বসার ব্যবস্থাও এমন কিছু আহামরি নয়। যাত্রীদের মধ্যে বাঙালির সংখ্যাই বেশি। প্রায় ১৪-১৫ জন। আটজন বিদেশি পর্যটক নিয়ে বাসের মোট যাত্রীর সংখ্যা প্রায় তিরিশ। বেশ কয়েকটি সিট খালি পড়ে রইল।

অতি মনোরম আবহাওয়ার মধ্যে আমাদের বাস ছুটল রোটাং পাসের দিকে। ৪৭৭ কিলোমিটার দীর্ঘ এই মানালি-লে সড়কপথ দিয়ে বাস চলাচল আরম্ভ হয়েছে ১৯৮৯ সাল থেকে। তার আগে লে যাবার একমাত্র পথ ছিল শ্রীনগর থেকে কারগিল হয়ে, যার দূরত্ব ৪৩৪ কিলোমিটার। মানালিকে পিছনে ফেলে রেখে, বিপাশার ধার দিয়ে চলার পথে একে একে পেরিয়ে গেলাম বশিষ্ঠ আশ্রম, নেহরু কুণ্ড, কোঠি আর রাহালা। রাহালার পরেই বাস কঠিন চড়াই পথ ধরল। মানালি থেকে ৩৪ কিলোমিটার দূরে মারি গিয়ে বাস থামল যাত্রীদের প্রাতরাশের জন্য। এখন অফ সিজন তাই দোকানপাটের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। পাউরুটি, ওমলেট দিয়ে

প্রাতরাশ। বাসচালক কাশ্মীরা সিং কাংড়া জেলার লোক। চেহারা রোগা হলেও গোঁফ জোড়াটি বেশ পুষ্ট। কাশ্মীরা সিংয়ের মতে, এই পথে পর্যটকদের আসল পরীক্ষা হয় সারচুতে। উচ্চতাজনিত অসুস্থতার শিকার না হয়ে সারচুর রাতটি যে কাটিয়ে দিতে পারবে তার আর লাদাখ ভ্রমণ নিয়ে চিন্তা নেই। তাংলাং লা বা খারদুং লার মতো উঁচু জায়গায় উঠেও তার কোনও অস্বস্তি হবে না। এই প্রসঙ্গেই সে জানাল, সারচুতে সুস্থ থাকার অন্যতম উপায় হল নিরুদ্বিগ্ন থাকার মানসিক প্রস্তুতি। শারীরিক অস্বস্তি অনুভব করা মাত্র তা নিয়ে অতিরিক্ত উৎকণ্ঠা শুধু অবস্থার অবনতি ঘটাতেই সাহায্য করে। নিজের মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকা চাই যে আমি সুস্থ থাকব। অনেকবারই দেখা গেছে যে একজন অসুস্থ যাত্রীকে দেখে অন্যদের মধ্যেও অসুস্থতার লক্ষণ দ্রুত সংক্রমিত হয়েছে।

মারি থেকে চড়াই পথে ১৭ কিলোমিটার গিয়ে পৌঁছে গেলাম রোটাং পাস (১৩,০৫৪ ফুট)। ইতিপূর্বে একাধিকবার এই বিখ্যাত গিরিপথটির প্রবেশ পথে পা রেখেছি, এবারই প্রথম একে অতিক্রম করে যাব। নাতিদীর্ঘ, প্রায় সমতল পথে পেরিয়ে এলাম পীরপাঞ্জালের এই গিরিশিরা। উতরাই পথ ধরে গড়গড়িয়ে নেমে চললাম লাহুল উপত্যকার দিকে। দূরে, অনেক নিচে বয়ে চলেছে চন্দ্রা নদী। উতরাই পথের শেষে গ্রামফু। অতি ক্ষুদ্র এক জনবসতি। এখানেই পথ দুভাগ হয়েছে। ডানদিকের পথটি গেছে কুনজুম পাস অতিক্রম করে স্পিতির কাজা শহরে, গ্রামফু থেকে দূরত্ব ১৩৫ কিলোমিটার। আমরা বাঁ দিকের পথ ধরলাম। এই পথটিই গেছে কেলং হয়ে লে। গ্রামফু থেকে চন্দ্রা নদীর ধার দিয়ে পাঁচ কিলোমিটার গিয়ে খোকসার গ্রাম। এখানে লোহার ব্রিজ পার হবার সময় চন্দ্রা নদীকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হল। ঘোলা জলের তীব্র প্রবাহ বয়ে চলেছে তান্ডির দিকে, ভাগা নদীর সঙ্গে মিলিত হবার বাসনায়। খোকসার ছাড়িয়ে আরও ১৪ কিলোমিটার গিয়ে পৌঁছে গেলাম শিশু নামে এক বর্ধিষ্ণু পাহাড়ি গ্রামে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা এই জায়গাটি দেখে কারও যদি এখানে দুয়েকদিন থাকার ইচ্ছে হয় তার ব্যবস্থাও করা আছে। পূর্ত দপ্তরের সুন্দর বাংলোটি এককথায় অনবদ্য। গ্রামের ঘরবাড়ি দেখেই বোঝা যায় যে অধিবাসীরা বেশ স্বচ্ছল। বাসের জানালা দিয়েই চোখে পড়ছে পথ সংলগ্ন চাষের জমি সবুজ ফসলে পূর্ণ হয়ে আছে। কোথাও ছেলেমেয়েরা খেত থেকে কড়াইশুঁটি তুলছে আবার কোথাও বা চাষীরা আলুর খেত পরিচর্যা করছে।

শিশুর পরবর্তী উল্লেখযোগ্য জায়গাটি তান্ডি। শিশু থেকে দূরত্ব ২৩ কিলোমিটার। এই তান্ডিতেই চন্দ্রা নদী মিলিত হয়েছে ভাগা নদীর সঙ্গে এবং এদের মিলিত জলধারা পরিচিত হয়েছে চন্দ্রভাগা বা চেনাব নামে। চন্দ্রার তুলনায় ভাগার জল অনেক বেশি পরিষ্কার। তান্ডিতেও পথ আবার দুভাগে বিভক্ত। সোজা পথ ধরলে ৫৪ কিলোমিটার দূরেই উদেপুর এবং উদেপুর থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরে ত্রিলোকনাথের বিখ্যাত মন্দির। সোজা পথে না গিয়ে আমরা ডানদিকের পথটি অনুসরণ করে মাত্র সাত কিলোমিটার গিয়ে পৌঁছে গেলাম লাহুল ও স্পিতির জেলা সদর কেলং শহরে। যাত্রীদের চা পানের সুযোগ করে দিতে বাস দাঁড়িয়েছিল অল্প সময়ের জন্য। খুব আশা নিয়ে বাস থেকে নেমেছিলাম 'লেডি অব কেলং' নামের

বিখ্যাত গিরিশৃঙ্গের দর্শন পাব বলে কিন্তু আকাশে মেঘ থাকায় মনস্কামনা অপূর্ণ রয়ে গেল। কেলং বড় শহর। লোকজনের ভিড়ে বাজার এলাকাটি গম গম করছে।

শিশু থেকে কেলং আসার পথেই চোখে পড়েছিল গাছপালা কমে আসার ফলে ভূ-প্রকৃতির মধ্যে একটা রুক্ষতার ছোঁয়া লেগেছে। কেলং ছাড়িয়ে কিছুদূর যাবার পর মনে হল এ কোথায় এলাম! আশপাশে কোথাও সবুজের চিহ্নমাত্র নেই। আরও একটু যাবার পর মনে হল কোনও এক মন্ত্রবলে পাহাড় পর্বতের রং আমূল পালটে গেছে। লাহুল উপত্যকায় প্রবেশ করার পর থেকে শুধু খয়েরি রঙের প্রাধান্যই চোখে পড়েছিল। এখন দেখছি চারদিকে রং-বেরঙের পাহাড়। হঠাৎ দেখলে মনে হয় সৃষ্টিকর্তার বোধহয় রং নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার শখ হয়েছিল। পাহাড়ের রং যে হলুদ, কমলা, লালচে, মেরুন, বাদামি বা ছাই রঙের হতে পারে, না দেখলে প্রত্যয় হত না। মুগ্ধ চোখে পাহাড়ের এমন অদৃষ্টপূর্ব রূপ দেখতে দেখতেই জিসপা পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম দারচা। কেলং থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই দারচা থেকেই একাধিক ট্রেকিং রুট চলে গেছে জাঁসকার হিমালয়ের অন্দরমহলে। এদের মধ্যে সিংকুন গিরিপথ (৫,১০০ মিটার) পেরিয়ে পদম যাবার পথটি ট্রেকারদের কাছে বিশেষ প্রিয়।

দারচাতে মধ্যাহ্নভোজন সেরে ফেলতে হবে কারণ এরপর খাবার পাওয়া যাবে সেই সারচুতে। বাস রাস্তার ধারে পরপর তাঁবু খাটিয়ে হোটেল খুলে বসেছে লাহুলি এবং তিব্বতি ব্যবসায়ীরা। তাঁবুতেই রয়েছে খাওয়া এবং রাত্রিবাসের ব্যবস্থা। রাতে থাকার খরচ মাথাপিছু মাত্র ৩০-৩৫ টাকা। আহার পর্ব সম্পন্ন করে জায়গাটা ঘুরে দেখলাম। প্রশস্ত ভাগা নদী এখানে বহু ধারায় বিভক্ত হয়ে প্রবাহিত। দারচায় সেই ভাগার সঙ্গে মিলিত হয়েছে আরও দুটি জলধারা, জাঁসকার নালা আর মিলাং নালা।

ভাগা নদীর উৎপত্তিস্থল বরালাচা গিরিপথের অদূরবর্তী সুরজতাল। আমরা এখন বরালাচার দিকেই চলেছি। ভাগা নদীর ওপর দীর্ঘ সেতু পেরিয়ে আমাদের বাস চড়াই পথ ধরল। এই মানালি লে বাসপথের (NH-21) মতো যাত্রাপথ আর দ্বিতীয়টি আছে কিনা সন্দেহ। ৪৭৭ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সড়কপথকে পেরিয়ে যেতে হয়েছে হিমালয়ের বেশ কিছু বিখ্যাত পর্বতমালা এবং গিরিশিরা। বছরে মাত্র চার মাস এই দুর্গম পার্বত্যপথ দিয়ে যানবাহন চলাচল করে। ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল মাস তুষারাবৃত থাকে এই বিশাল ভূখণ্ড। মে মাস থেকেই বরফ গলতে আরম্ভ করে। পাহাড়ের ওপর থেকে বরফ নেমে আসে নিচের গিরিনদীতে। যুগ-যুগান্ত ধরে বরফের ঘর্ষণে প্রতিটি পাহাড়ের মাথা এবং শরীর মসৃণ হয়ে পড়েছে। যে সব পাহাড়ের উচ্চতা অপেক্ষাকৃত বেশি তাদের মাথার ওপর জমে থাকা বরফ সম্পূর্ণ গলে যাবার আগেই আবার শীত এসে হাজির হয়। মরুপ্রায় পার্বত্যভূমিতে তুষারাবৃত গিরিশিখরের অবস্থান লাদাখের এক নিজস্ব ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য।

দারচা থেকে ১৫ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে এক বড় সেনা শিবিরের দেখা পেলাম। জায়গাটার নাম পাতসু। আজ ১৫ আগস্ট তাই সৈনিকরা স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে ব্যস্ত। চেকপোস্টে বাস দাঁড়াতেই একজন জওয়ান বাসে উঠে যাত্রীদের মধ্যে লজেন্স বিতরণ করলেন। পাতসুর পর বাস কঠিন চড়াই পথ ধরল। আস্তে

আস্তে ছাড়িয়ে গেলাম পনেরো হাজার ফুটের উচ্চতা। বাসযাত্রীদের কথাবার্তা, হইচই অনেকক্ষণ আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। এখন দেখছি কিছু কিছু যাত্রী অস্ফুট শব্দে শারীরিক অস্বস্তি প্রকাশ করছেন। দুয়েকজন বমি করে স্বস্তি লাভ করার চেষ্টা করলেন। আমার ঠিক সামনের সিটে বসা এক বিদেশি পর্যটক মাথার যন্ত্রণায় কাহিল হয়ে ব্যাগ থেকে ট্যাবলেট বার করে মুখে দিলেন। এই অবস্থায় সহযাত্রীদের দিকে নজর না দিয়ে জানালার বাইরে তাকানোই ভালো। এক সময় কঠিন চড়াই শেষ হল। আমরা এখন ১৬,০৫০ ফুট উঁচু বরালাচা পাস অতিক্রম করছি। পাতসুর উচ্চতা ছিল ১১,০০০ ফুট, অর্থাৎ মাত্র তিরিশ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে আমাদের বাস পাঁচ হাজার ফুটের চড়াই ভেঙেছে। যাত্রীদের ছবি তোলার সুযোগ দিতে বাস দাঁড়িয়ে পড়ল। গিরিপথের ওপর বরফ নেই বটে তবে পথসংলগ্ন গিরিশিখরগুলি বরফে ঢাকা। তীব্র বাতাসে মাথার টুপি উড়ে গিয়েছিল, ছুটে গিয়ে কুড়িয়ে আনতে গিয়ে হাঁফ ধরে গেল। বেশ লাগছিল চারপাশের দৃশ্য দেখতে কিন্তু ড্রাইভারের তাড়নায় বাসে উঠে পড়তে হল। কাশ্মীরা সিং চাইছে সন্ধের আগেই সারচু পৌঁছে যেতে।

বরালাচা পেরিয়ে বাস উতরাই পথ ধরে পৌঁছে গেল এক শৈলসমুদ্রের মাঝে। পথের দুধারেই লক্ষকোটি ছোট বড় প্রস্তরখণ্ড এমনভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যে মনে হয় একটু আগেই যেন প্রবল ভূমিকম্প হয়ে গেছে। এই প্রস্তরাকীর্ণ এলাকাটি পেরিয়ে আসার পর একটা ছোট টিলার ওপর দর্শন পেলাম আইবেক্স বা পাহাড়ি ছাগলের। সব মিলিয়ে সাত-আটটি প্রাণী পাথরের খাঁজে শ্যাওলা খুঁজে বেড়াচ্ছে। বাহারি শিং-এর দৌলতে পুরুষ আইবেক্সের চেহারা সত্যি দৃষ্টিনন্দন। এমন রুক্ষ, পাথুরে জায়গায় বন্যপ্রাণীর সন্ধান পেয়ে আমাদের সে কী উত্তেজনা। বাস কন্ডাক্টর জানাল, বাস দাঁড় করালেই এরা মুহূর্তে উধাও হবে তাই বাস থামানো যাবে না।

আমরা এখন চলেছি এক বিশাল সমতলভূমির ওপর দিয়ে। পথের দুপাশের শৈলশ্রেণী অনেক দূরে সরে গেছে। বাসপথের অদূরেই একটি জলধারা বয়ে গেছে সারচুর দিকে। এই স্রোতস্বিনীকে বাদ দিলে অবশিষ্ট চরাচরকে মরুভূমি ছাড়া অন্য কিছু বলা যাবে না। মাঝে মধ্যে গোলাকৃতি ঘাসের চাপড়া সদৃশ এক ধরনের উদ্ভিদ চোখে পড়ছে, এছাড়া আর কোথাও সবুজের ছোঁয়া নেই।

সারচুতে পৌঁছবার মুখেই অন্ধকার নেমে এল। হিমাচল পর্যটন দপ্তর এখানে গোটা দশেক তাঁবুতে সরকারি ট্যুরিস্ট বাসের যাত্রীদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। বাস থেকে নামতেই তীব্র ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটায় আপাদমস্তক কেঁপে উঠল। বাসচালক ভরসা দিয়ে জানাল, এই ঝোড়ো হাওয়া এক-দেড় ঘণ্টার মধ্যেই থেমে যাবে।

তিনশয্যাবিশিষ্ট এক তাঁবুতে আমার স্থান হল। একটি ছোট জেনারেটারের সাহায্যে প্রতিটি তাঁবুতে একটি করে আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফোল্ডিং খাটের ওপর পুরু গদি পাতা, তার ওপর দুটি লেপ ভাঁজ করা আছে। এই জনহীন প্রান্তরে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা দেখে বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করলাম। ঠিকমতো গুছিয়ে বসার আগেই গরম চা নিয়ে হাজির হলেন এক কর্মী। আমার তাঁবুর অন্য দুই সঙ্গী হলেন মহারাষ্ট্রের পুনা শহর থেকে আসা বিনোদ দেশাই এবং তার বন্ধু। উচ্চতাজনিত

অসুস্থতায় দুজনেই বেশ কাহিল। ট্যাবলেট খেয়েও তেমন উপকার না পেয়ে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। আমার সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ হোমিওপ্যাথিক ওষুধ 'কোকা-৬' ছিল। সেই 'বিশল্যকরণী' এবার কাজে লাগল। আমার সঙ্গীদের দিয়ে নিজেও মুখে দিলাম।

রাত নটা নাগাদ রাতের খাবার পরিবেশিত হল। স্থানকাল বিচারে চমৎকার মেনু। ভেজিটেবল স্যুপ, আটার রুটি, ছোলার ডাল, ভাত, আলু-ফুলকপির ডালনা আর কাস্টার্ড। রাতের খাবার শেষ করে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলাম অন্য সহযাত্রীদের খোঁজখবর নিতে। ভাগ্যিস বেরিয়েছিলাম, না হলে রাতের সারচু আমার অদেখা রয়ে যেত। সেই ঝোড়ো হাওয়া পুরোপুরি উধাও। তিনদিন আগে পূর্ণিমা ছিল তাই আজ চন্দ্রোদয় ঘটেছে একটু দেরিতে। কিছুক্ষণ আগে এক পর্বতপ্রাচীরের আড়াল থেকে রজনীকান্ত বেরিয়ে এসে সারচুর রুক্ষ প্রান্তরকে জ্যোৎস্না প্লাবিত করছেন। সত্যি, এ এক অপার্থিব শোভা। একটা পাথরের ওপর তন্ময় হয়ে বসেছিলাম, সম্বিৎ ফিরল শীতের দংশনে। তাড়াতাড়ি তাঁবুতে গিয়ে লেপের ভেতর আশ্রয় নিলাম।

ঘুম ভাঙার পর প্রথমেই স্বস্তিবোধ করলাম; যাক সারচুতে রাত্রিবাস পর্ব ভালোভাবেই মিটল। সূচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে আশপাশের তাঁবু থেকে কথাবার্তা কানে আসছে। ভাবলাম অন্য যাত্রীরা বোধহয় ভোর হবার আগেই গোছগাছ সেরে নিচ্ছেন। তাঁবুর অন্য দুই সঙ্গী বোধহয় আমার জেগে ওঠার অপেক্ষাতেই ছিলেন। কোনওরকম ভূমিকা না করে বিনোদ দেশাই বলে উঠলেন, 'আপনার সেই ওষুধটা যদি আরেকবার...। মোমবাতি জ্বেলে ব্যাগ থেকে ওষুধ বার করার সময় আবিষ্কার করলাম ঘড়িতে সাড়ে বারোটা বাজে।

সবদিক বিচার করে দেখলে মানতেই হবে যে উচ্চতাজনিত অসুস্থতার মাথাচাড়া দেবার এক আদর্শ স্থান হল এই সারচু। মানালির উচ্চতা ৬,৭২৬ ফুট। আর সারচুর উচ্চতা ১৪,০০০ ফুটের বেশি। এই এক ধাক্কায় প্রায় আট হাজার ফুট ওপরে উঠে পড়াই উচ্চতাজনিত অসুস্থতার প্রধান কারণ। পার্বত্য অঞ্চলে দশ হাজার ফুটের পর থেকেই বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ কমতে থাকে। বারো হাজার ফুটের উচ্চতা থেকেই নানাবিধ শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে থাকে। সময়মতো চিকিৎসার ব্যবস্থা না হলে অবস্থা গুরুতর হয়ে উঠতে পারে। উচ্চতাজনিত অসুস্থতার হাত থেকে মুক্তির সবচেয়ে কার্যকরী উপায় হল ক্রমবর্ধমান উচ্চতার সঙ্গে শরীরকে খাপ খাওয়ানো। এর সঙ্গেই চিকিৎসক নির্দেশিত ওষুধপত্রের সময়োচিত ব্যবহার শরীরকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।

সকালে টোস্ট, ওমলেট আর চা সহযোগে প্রাতরাশ সম্পন্ন করে রওনা দিলাম লে অভিমুখে। সারচু নালার ওপর লোহার ব্রিজ পেরিয়ে আমাদের বাস লাদাখের সীমানায় প্রবেশ করল। মানালি-লে সড়কপথের সবচেয়ে দুর্গম এবং জনবিরল অংশটি এখন আমরা পাড়ি দেব। এই অংশটি শুরু হয়েছে সারচুর পর থেকে আর শেষ হয়েছে ১৪৪ কিলোমিটার দূরে রুমসে গ্রামে গিয়ে। পথে পেরোতে হবে দুস্তর মরুপ্রায় প্রান্তর, আরেকদিকে গগনচুম্বী গিরিপ্রাচীর। সারচু ছাড়িয়ে বেশ কিছুটা পথ বাস চলল বিশাল চওড়া এক নদীখাতের ধার দিয়ে। নদীর বুক ছাইরঙের মিহি বালি

আর নুড়ি পাথরে ভর্তি, শুধু একপাশ দিয়ে জলধারা বয়ে চলেছে। সারচু থেকে প্রায় একঘণ্টা চলার পর পথসংলগ্ন বোর্ড দেখে জানা গেল সামনেই রয়েছে গাটালুপ-এর কুখ্যাত চড়াই। সংস্কারের অভাবে দীর্ণ পাহাড়ি পথ ধরে, অসংখ্য 'হেয়ারপিন বেন্ড' অতিক্রম করে ক্রমাগত পথারোহণ যেন আর শেষ হতে চাইছিল না। দেখে অবাক হয়ে গেলাম যে বেশ কয়েকজন বিদেশি পর্যটক এই দুর্গম পথ পাড়ি দিচ্ছেন মোটর সাইকেল চেপে। অবশেষে একসময় শেষ হল এই আরোহণ পর্ব, আমরা পৌঁছে গেলাম পাহাড়ের মাথায়। সামনেই চোখে পড়ছে বেশ কয়েকটি তুষারশৃঙ্গ।

সারচু থেকে ৫৮ কিলোমিটার দীর্ঘপথ অতিক্রম করে পৌঁছে গেলাম লাচুলুং লা গিরিপথ, যার উচ্চতা ১৬,৬১৬ ফুট। বলাবাহুল্য, তিব্বতি ভাষায় 'লা' কথার অর্থ গিরিপথ। এই 'লা' থেকেই 'লাদাখ' অর্থাৎ গিরিপথের দেশ। লাচুলুং লা তে বরফ না পেয়ে সবাই যেন একটু হতাশ। বাসচালক ভরসা দিলেন, 'তাংলাং লা-তে বরফ পাবেন।' নতুন উদ্যমে এবার সেই দিকেই ছুটল আমাদের বাহন। উতরাই পথ ধরে নেমে এলাম এক সঙ্কীর্ণ নদী উপত্যকায়। পথের বাঁ দিকে, অনেক নিচ দিয়ে প্রবল বেগে বয়ে চলেছে এক গিরিনদী।

লাচুলুং লা থেকে ২৩ কিলোমিটার দূরে পাং। প্রায় সমতল এই উপত্যকাটি বেশ প্রশস্ত। এখানে যে নদীটি বয়ে গেছে তার নামটি বেশ, দেবরিংমা নালা। নদীর ধারেই লাদাখি এবং তিব্বতিরা বেশ কয়েকটি তাঁবুতে হোটেল খুলে খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করেছেন। বেসরকারি বাস এবং টাটা সুমোর যাত্রীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এখানেই রাত্রিবাস করেন। পাংয়ের পর পথে খাবারের দোকান মিলবে সেই উপসিতে, এখান থেকে দূরত্ব ১১৬ কিলোমিটার। তাই বাসের সব যাত্রীকেই যে-কোনও একটা তাঁবুতে ঢুকে আহারের সন্ধানে উদ্যোগী হতে হল। এই বড় তাঁবুগুলির প্রবেশপথেই রয়েছে রান্নার জায়গা আর লোকজনের বসার ব্যবস্থা। এখানে পাওয়া যাবে চিনি, দুধ দিয়ে তৈরি চা, মাখন, নুন দিয়ে তৈরি তিব্বতি চা, ভাত, আটার রুটি, সব্জি, বানরুটি, ডিমভাজা আর নুডলস। তাঁবুর মাঝখানে কাঠের তাকে সাজানো রয়েছে কেক, বিস্কুট, রকমারি চিপস, ঠান্ডা পানীয় এবং আরও নানারকম শুকনো খাবার। তাঁবুর অবশিষ্ট জায়গাতে রাত্রিবাসের জন্য বিছানা পাতা আছে। লেপের চেহারা দেখে মনে ভরসা জাগে, শীতের সাধ্য কী তাকে ভেদ করে। ভোজনপর্ব সেরে, চায়ের গেলাস হাতে তাঁবুর বাইরে গিয়ে বসেছিলাম। সেখানেই আলাপ হল আমার সহযাত্রী কয়েকজন বিদেশি পর্যটকের সঙ্গে। এরা এসেছেন ইজরায়েল থেকে। এরা লাদাখে মাসদেড়েক থাকবেন। লাদাখের বৌদ্ধ গুম্ফাগুলির রহস্যময় জগৎ এদের যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে। প্রতিটি উল্লেখযোগ্য গুম্ফাতে দুয়েকটা দিন কাটানো এদের ভ্রমণসূচির অঙ্গ।

পাং জায়গাটিকে আমার বেশ মনে ধরেছিল। গোটা একটা দিন আর একটা চাঁদনি রাত এখানে কাটাতে পারলে কী ভালোই না হত! বিদায় নেবার আগে তাঁবু হোটেলের তিব্বতি মালিককে প্রশ্ন করেছিলাম এই অস্থায়ী পান্থনিবাস কতদিন চালু থাকবে। উত্তর পেলাম 'মধ্য অক্টোবরে লে থেকে আসা শেষ বাসটির যাত্রীদের খাইয়ে তবেই আমাদের ছুটি।'

পাং থেকে এই পথের উচ্চতম গিরিবর্ত্ম তাংলাং লার দূরত্ব ৬০ কিলোমিটার। এর মধ্যে ৪৫ কিলোমিটার পথ গিয়েছে এক সমতল মরুপ্রান্তরের ওপর দিয়ে। মানালি-লে সড়কপথের অন্যতম চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা এই 'তেপান্তরের মাঠ' চাক্ষুষ করা। সড়কপথের দুধারের পাহাড়ের শ্রেণী কোথাও দু কিলোমিটার, কোথাও পাঁচ কিলোমিটার দূরে সরে গেছে। রুক্ষ, বালুকাময় ভূমির ওপর মাঝে মধ্যে ছোট বড় প্রস্তরখণ্ড ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এই পাথরের ফাঁক-ফোকর দিয়েই বেরিয়ে পড়ছে বিচিত্র প্রাণী মারমট। অনেকটা মেঠো ইঁদুরের মতো দেখতে অথচ তাদের চেয়ে বেশ কয়েকগুণ বড় এই চঞ্চল প্রাণীটির স্বভাব হল গর্ত থেকে বেরিয়ে দুপায়ে খাড়া হয়ে চারদিক নিরীক্ষণ করা। চলার পথে চোখে পড়ছে গোলাকৃতি ঘাসের চাপড়ার মতো সেই উদ্ভিদটি যা গতকাল সারচুর কাছে আমরা দেখেছি। আজ আরও কাছ থেকে দেখার পর আবিষ্কার করলাম এতে হালকা নীল রঙের ছোট ছোট ফুল ফুটে আছে।

এই বিশেষ অঞ্চলটির আরেকটি আকর্ষণ হল যাযাবর পশুপালকদের উপস্থিতি। রূপসু উপত্যকার এই অধিবাসীরা চাংপা নামে পরিচিত। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এই চাংপাদের জীবনযাত্রা এবং সংস্কৃতিতে তিব্বতের প্রভাব। ঘোড়ার পিঠে চেপে বড় বড় ভেড়ার পাল নিয়ে এই গরমের সময়টা এরা দূরদূরান্তে পাড়ি দেয়। মাঝে মধ্যে বাসের জানালা দিয়েই চোখে পড়ে এদের তাঁবুকেন্দ্রিক জীবনের টুকরো টুকরো ছবি।

একসময় পেরিয়ে গেলাম এই দীর্ঘ প্রান্তর। এবার চড়াই পথ ধরে ১৭,৪৬৯ ফুট উঁচু তাংলাং লার দিকে এগিয়ে যাওয়া। এই পথটিই বিশ্বে দ্বিতীয় উচ্চতম মোটরমার্গ রূপে স্বীকৃত। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে উচ্চতম মোটরপথের শিরোপা পেয়েছে খারদুং লা, যার উচ্চতা ১৮,৩৮০ ফুট। খারদুং লা অতিক্রম করতে হয় লে থেকে নুব্রা উপত্যকা যাবার পথে। তাংলাং লা যাবার পথে কত সমস্যাই না দেখা দেবে এমন একটা ধারণা মনে বদ্ধমূল ছিল। বাস্তবে তেমন কিছুই ঘটল না। সাম্প্রতিক সংস্কারের ফলে রাস্তার অবস্থা বেশ ভালো। অনেকটা ঘোরা পথে ওপরে ওঠার ফলে বোঝাই যাচ্ছিল না যে আমরা ১৭,০০০ ফুট উচ্চতা পেরিয়ে এসেছি। তাংলাং লার শীর্ষে অবস্থিত শিবমন্দিরের সামনে বাস দাঁড়াতেই যাত্রীদের মধ্যে ছবি তোলার ধুম পড়ে গেল।

শিবমন্দির দর্শন করে সেনাবাহিনীর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত মেডিকেল ইউনিটটি দেখতে গেলাম। উচ্চতাজনিত অসুস্থতায় আক্রান্ত যাত্রীদের এখানে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। তাংলাং লার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় আমরা সিন্ধু উপত্যকা এবং কারাকোরাম পর্বতমালার দর্শন লাভে বঞ্চিত হলাম। তীব্র হাওয়ায় বেশিক্ষণ বাইরে থাকা গেল না, তাই বাসে উঠে পড়লাম।

আমরা এখন উতরাই পথ ধরে সিন্ধু উপত্যকার দিকে চলেছি। তাংলাং লা থেকে ৩১ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে এই প্রথম এক ছোট্ট লাদাখি গ্রামের দেখা মিলল। গ্রামের নাম রুমসে । লাদাখের নিজস্ব নির্মাণশৈলীর ঘরবাড়ি আর লোকজনের বেশভূষা দেখে মনে হল যাক সত্যি তাহলে লাদাখে পৌঁছে গেছি। রুমসে থেকেই আমাদের সঙ্গী হল এক পাহাড়ি নদী। ম্যাপ দেখে জানা গেল নদীর নাম ছাবে নালা। রুমসের পরবর্তী গ্রামটির নাম গ্যা। এখানে লোকজনের দেখা তেমন একটা পেলাম

না শুধু কয়েকটি লাদাখি শিশু একগাল হাসি নিয়ে আমাদের দিকে হাত নাড়তে লাগল।

গ্যা থেকে সিন্ধু তীরবর্তী উপসি এই ২৪ কিলোমিটার পথের সৌন্দর্য মুহূর্তের জন্যও দর্শককে অন্যমনস্ক হতে দেয় না। আমাদের ডানদিক দিয়ে তীব্রগতিতে বয়ে চলেছে রুয়াল নদী। স্বচ্ছ জলধারা। রুয়াল চলেছে সিন্ধুর বুকে ঝাঁপ দিতে। পথের বাঁ দিকে যে পাহাড়গুলি পরপর আমাদের দৃষ্টিপথে ধরা দিচ্ছে তার রূপ দেখে চোখ ফেরানো দায়— এমন উজ্জ্বল বেগুনি রঙের পাহাড়।

উপসি পৌঁছে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লাম।সামনেই বয়ে চলেছে ইতিহাস প্রসিদ্ধ সিন্ধু নদ। কত মানব সভ্যতার বিকাশ এবং পতনের সাক্ষী এই নদ। সিন্ধু এখানে উত্তরবাহিনী। কারগিল জেলায় এই সিন্ধু নদ পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে প্রবেশ করেছে তারপর একসময় নাঙ্গা পর্বতকে প্রদক্ষিণ করে দক্ষিণবাহিনী হয়েছে। করাচি শহরের কাছেই সিন্ধু নদের বদ্বীপ অঞ্চল। উপসিতে লোহার ব্রিজ পেরিয়ে বাস দাঁড়াল এক পাঞ্জাবি ধাবার সামনে। এখানকার চায়ের নাকি বেশ সুনাম। বাস থেকে নেমে প্রথমেই গেলাম সিন্ধুর ধারে। নদের জল স্পর্শ করে রোমাঞ্চিত বোধ করলাম।

মানালি-লে সড়কপথে উপসির অবস্থান বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এখান থেকেই পথ দুভাগ হয়েছে। ডান দিকের পথটি গেছে চুমাথাং, নুমা হয়ে তিব্বত সীমান্তের দিকে। সোমোরিরি সরোবর যেতেও এই পথেই যেতে হবে বেশ খানিকটা পথ। বাঁ দিকের পথটি গেছে ৪৯ কিলোমিটার দূরে লে শহরে। আমাদের বাস বাঁ দিকের পথ ধরল। আমরা এখন চলেছি সিন্ধু উপত্যকার সমতল পথ ধরে। চড়াই-উতরাইয়ের নামগন্ধ নেই। সিন্ধুর ওপারের রুক্ষ পাহাড়ের শ্রেণী অনেকটা দূরে সরে গেছে। লে শহরের দিকে এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে উপত্যকার ক্রমবর্ধমান বিস্তৃতি সহজেই চোখে পড়ে। সিন্ধুর দুই তীরের সমতল ভূমি গাছপালা আর চাষের জমির সৌজন্যে ঘন সবুজ। রুক্ষ মরু-পাহাড়ের মাঝে এ যেন এক বিশাল মরূদ্যান।

উপসি থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরবর্তী কারু এই পথের এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থল। সোজা পথটি গেছে লে। বাঁ দিকের পথ সিন্ধু নদ পেরিয়ে পৌঁছে গেছে বিখ্যাত হেমিস গুম্ফায়; কারু থেকে দূরত্ব মাত্র ৮ কিলোমিটার আর ডান দিকের চড়াই পথটি চাংলা গিরিবর্ত্ম (১৭,৩৫০ ফুট) পেরিয়ে চলে গেছে প্যাংগং সরোবর। কারু থেকে প্যাংগংয়ের দূরত্ব ১১৮ কিলোমিটার। কারু থেকে লে যাবার পথেই চোখে পড়ল থিকসে গুম্ফা। অনুচ্চ এক পাহাড়ের ওপর তৈরি এই বিশাল বৌদ্ধ মঠটিকে দেখে সম্ভ্রম জাগে। থিকসে থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরেই শ্যে প্রাসাদ। এই প্রাসাদটি এককালে লাদাখ রাজপরিবারের গ্রীষ্মকালীন আবাস ছিল। শ্যে প্রাসাদের বিপরীত দিকেই এক বিশাল জলাভূমি।

লে শহর আর বেশি দূরে নেই। পথের ধারে জনবসতি অনেক বেড়ে গেছে। তিব্বতি অধ্যুষিত চোগলামসার গ্রাম পেরিয়ে অবশেষে পৌঁছে গেলাম লে শহরের দোরগোড়ায়। শ্রীনগর থেকে কারগিল হয়ে আসা পথটিও এখানে এসে মানালি থেকে আসা পথের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। হালকা চড়াইপথ ধরে, অবাক চোখে চারদিক দেখতে দেখতে হাজির হলাম লে বাসস্ট্যান্ডে।

লাদাখে ঘোরাঘুরি

লে শহরে ইতস্তত হাঁটাহাঁটি করাটাই এক মধুর অভিজ্ঞতা। শহরের কয়েকটি বিশেষ জায়গায় চোখে পড়বে পথের ধারে সারি দিয়ে বসে আছেন গ্রাম থেকে আসা লাদাখি মহিলারা। সামনে রয়েছে তরিতরকারির পসরা। এদের বেশভূষা এবং অলঙ্কার চোখে পড়ার মতো। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতেই দেখে নেওয়া যায় লে মসজিদ, মোরাভিয়ান চার্চ, লাদাখ ইকোলজিক্যাল সেন্টার, জেলা হস্তশিল্প কেন্দ্র, ট্যুরিস্ট রিসেপশন সেন্টার এমনকী একটু দূরের সানকার গুম্ফা এবং লাদাখ শান্তিস্তূপ। লে শহরের মধ্যেই রয়েছে পোলো গ্রাউন্ড, কপাল ভালো হলে দেখা যাবে পোলো খেলার দৃশ্য।

লে শহরের যে-কোনও জায়গা থেকেই চোখে পড়ে উঁচু টিলার ওপর বিরাজমান প্রাচীন লে প্যালেস। শহরের প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে থাকা এই নয়তলা প্রাসাদ-দুর্গটি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তৈরি করিয়েছিলেন লাদাখনরেশ সেঙ্গে নামগিয়াল। রোমাঞ্চ প্রিয় পর্যটকরা শহরের পুরনো মহল্লার সরু গলিপথ ধরে এবং অল্প চড়াই ভেঙে হাঁটা পথেই পৌঁছে যেতে পারেন এই রহস্যে মোড়া রাজপ্রাসাদে। অন্যরা গাড়িতে বসেই ঘোরাপথে অতিক্রম করতে পারেন এই দু কিলোমিটার পথ। প্রাসাদের ওপর থেকে লে শহর এবং সিন্ধু উপত্যকার দৃশ্য মনোমুগ্ধকর। ইদানীং প্রাসাদ চত্বরেই লাদাখি শিল্পীরা লোকনৃত্য পরিবেশন করেন পর্যটকদের জন্য।

লাদাখ ভ্রমণের অন্যতম আকর্ষণ হল বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা এর অসংখ্য বৌদ্ধ গুম্ফা। লে থেকে গাড়ি ভাড়া করে একদিনেই যে সব গুম্ফাগুলি দেখে নেওয়া যায় তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হল।

লে থেকে আট কিলোমিটার দূরে অবস্থিত স্পিতুক গুম্ফার ওপর থেকে চোখে পড়ে কিয়াং গুম্ফা, লে শহর, স্তোক গ্রাম আর দূরের কারাকোরাম পর্বতমালা। স্পিতুক গুম্ফার একটি বিশেষ কক্ষে রাখা আছে তারা দেবীর তেইশটি বিভিন্ন রূপের ওপর আধারিত মূর্তি। এছাড়া রয়েছে বেশ কয়েকটি প্রাচীন থাঙ্কা এবং মুখোশ।

স্পিতুক দেখে এবার স্তোক গুম্ফা এবং প্রাসাদ। লে থেকে প্রায় ১৪ কিলোমিটার দূরে গিয়ে দেখা যাবে স্তোক প্রাসাদের মিউজিয়ামে রক্ষিত প্রাচীন পোশাক-পরিচ্ছদ, অস্ত্রশস্ত্র, অলঙ্কার, মুদ্রা, কার্পেট, থাঙ্কা এবং আরও কত কী!

স্পিতুক দেখে এবার লে-মানালি রাস্তা ধরে এগিয়ে যেতে হবে হেমিস গুম্ফার দিকে। তবে সোজা হেমিস না গিয়ে এই পথের অন্য দর্শনীয় স্থানগুলি দেখে নিতে হবে। যেমন চোগলামসার। লে থেকে দশ কিলোমিটার দূরের এই তিব্বতি অধ্যুষিত গ্রামটির খ্যাতি তার টিবেটান রিফিউজি সেন্টারে তৈরি হস্তশিল্পের জন্য। চোগলামসার থেকে আরও পাঁচ কিলোমিটার গিয়ে শ্যে প্রাসাদ এবং গুম্ফা। পথের বাঁ দিকেই এক অনুচ্চ পাহাড়ের মাথায় ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে তৈরি প্রাসাদটি এককালে ছিল লাদাখ রাজ পরিবারের গ্রীষ্মকালীন আবাস। শ্যে গুম্ফায় রয়েছে তামা ও পিতল দিয়ে তৈরি এক বিশাল বুদ্ধমূর্তি। শ্যে প্রাসাদের ওপর থেকে সিন্ধু উপত্যকার সবুজ কৃষি-জমি এবং দূরের তুষারাবৃত শৈলমালার শোভা অতুলনীয়। শ্যে থেকে চার কিলোমিটার দুরেই থিকসে গুম্ফা। বড় এক টিলার ওপর তৈরি বারো তলার এই বিশাল বৌদ্ধমঠের প্রধান আকর্ষণ এর রজতকান্তি অনিন্দ্যসুন্দর বুদ্ধমূর্তি। এছাড়া

এখানকার প্রাচীন পুঁথির সংগ্রহশালাটির খ্যাতিও কম নয়। থিকসে থেকে বিশ্ববিখ্যাত হেমিস গুম্ফার দূরত্ব ২৪ কিলোমিটার। সিন্ধুনদের অন্য তীরে অবস্থিত এই হেমিস গুম্ফা হল লাদাখের সবচেয়ে ধনী এবং প্রভাবশালী গুম্ফা। গুম্ফার বিশাল প্রাঙ্গণে প্রতি বছর জুন মাসে গুরু পদ্মসম্ভবের জন্মদিনের উৎসব পালিত হয়। হেমিসে রয়েছে ভারতের বৃহত্তম থাঙ্কা যা বারো বছর অন্তর জনসমক্ষে প্রদর্শিত হয়। এই হিসেব অনুসারে ২০০৪ সালের জুলাই মাসে এই থাঙ্কাটি প্রদর্শিত হবার কথা।

প্যাংগং সরোবর

লে থেকে ১৫০ কিলোমিটার দূরে ভারত-তিব্বত সীমান্তে অবস্থিত এই ১৪,২৫৬ ফুট উচ্চতার হ্রদটি যেন এক প্রাকৃতিক বিস্ময়। লম্বায় ১৩৫ কিলোমিটার এবং মাত্র দুই থেকে ছয় কিলোমিটার প্রস্থ বিশিষ্ট এই সরোবরের এক তৃতীয়াংশ ভারতে এবং বাকিটা তিব্বতে। লে থেকে প্যাংগংয়ের পথে যেতে গেলে চাংলা গিরিপথ (উচ্চতা ১৭,৩৫০ ফুট) পেরিয়ে ১১৬ কিলোমিটার দূরবর্তী তাংসে গ্রামে রাত্রিবাস করাই যুক্তিযুক্ত। পরদিন ভোরে লুকুং (৩২ কিলোমিটার) হয়ে প্যাংগং পৌঁছে গেলে অনেকটা সময় কাটানো যাবে এই বিশাল জলাশয়ের ধারে। চোখে পড়বে জলের ওপর ভাসমান পরিযায়ী পাখির ঝাঁক। এদের মধ্যেই হয়তো রয়েছে ব্রাহ্মণী হাঁসের মতো বিরল প্রজাতির বিহঙ্গ। লেকের জল মুখে দিলেই মনে হবে এ সাগরের লবণাম্বু। যারা একদিনেই এই সফর সেরে ফেলতে ইচ্ছুক তাদের উচিত হবে ভোরের আলো ফোটার আগেই প্যাংগংয়ের পথে রওনা দেওয়া। প্যাংগং যেতে গেলে লের ডেপুটি কমিশনারের অফিস থেকে ইনার লাইন পারমিট সংগ্রহ করতে হবে।

সোমোরিরি সরোবর

লে থেকে দূরত্ব ২১৭ কিলোমিটার। রূপসু উপত্যকায় পনেরো হাজার ফুট উচ্চতার এই সরোবর আয়তনে প্যাংগং লেকের চেয়ে অনেক কম হলেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে কোনও অংশে কম নয়। সোমোরিরি যাবার সড়কপথটি লে থেকে উপসি, চুমথাং, মাহিপুল এবং সামদো হয়ে পৌঁছে গেছে সরোবরের তীরে অবস্থিত কোরজোক গ্রামে। এই সফরে একটা রাত কোরজোক গ্রামেই কাটাতে হবে। সোমোরিরি জলে দেখা যাবে ব্রাহ্মণী হাঁস, বার হেডেড গুজ, গ্রেট ক্রেসটেড গ্রেব আর ব্রাউন হেডেড গাল। সোমোরিরি যাবার পথে রূপসু উপত্যকার প্রান্তরে চোখে পড়বে লাদাখের বুনো গাধা কিয়াং, মরু খরগোশ আর মারমট। সোমোরিরি যেতে ইনার লাইন পারমিট নিতে হবে।

নুব্রা উপত্যকা

লাদাখ ভ্রমণকালে প্রয়োজন হলে প্যাংগং এবং সোমোরিরির মধ্যে যে কোনও একটিকে বাদ দেওয়া যেতে পারে কিন্তু নুব্রা ভ্যালি না দেখলেই নয়। সাইয়ক এবং নুব্রা নদীর গতিপথকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া এই উপত্যকার সৌন্দর্য এককথায় অপার্থিব।

নুব্রা যেতে হলে লে থেকে রওনা দিয়ে প্রথমে ৪৫ কিলোমিটার দূরবর্তী বিখ্যাত খারদুং লা গিরিবর্ত্ম (উচ্চতা ১৮,৩৮০ ফুট) অতিক্রম করতে হবে। এই পথটিই বিশ্বের উচ্চতম মোটরপথ। আকাশ পরিষ্কার থাকলে উত্তরে কারাকোরাম এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে জাঁসকার পর্বতমালা চোখে পড়বে।

এই পথটিই এককালে ঐতিহাসিক রেশম পথের অংশ ছিল। লে থেকে নুব্রা ভ্যালির প্রধান জনপদ দেসকিটের দূরত্ব ১২০ কিলোমিটার। নুব্রার সৌন্দর্য ঠিকমতো উপলব্ধি করতে হলে একটি রাত দেসকিটে (উচ্চতা ৮,৮০০ ফুট) কাটানো যেতে পারে। রাত্রিবাসের জন্য বেশ কয়েকটি গেস্টহাউস আছে, যেখানে ৩০০-৫০০ টাকায় দ্বিশয্যার ঘর পাওয়া যাবে। দেসকিট থেকে আরও উত্তরে আট কিলোমিটার দূরে হুন্ডার। এই পথেই ডানদিকে চোখে পড়বে ছোট্ট মরুভূমির বালিয়াড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছে দুকুঁজবিশিষ্ট উট যা ব্যাকট্রিয়ান ক্যামেল নামে পরিচিত। মুহূর্তের জন্য মনে হবে ভারতে নয়, মঙ্গোলিয়ার গোবি মরুভূমির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। নুব্রা ভ্যালির অন্যান্য দর্শনীয় স্থানগুলি দেসকিটের বৌদ্ধমঠ, সুমুর গ্রাম এবং পানামিকের উষ্ণকুণ্ড। নুব্রা উপত্যকা যেতেও ইনারলাইন পারমিট প্রয়োজন।

লিকির আলচি লামায়ুরু গুম্ফা

লে থেকে গাড়ি ভাড়া করে কারগিল যাবার পথে এই বিখ্যাত গুম্ফাগুলি দেখে নেওয়াই সুবিধেজনক। তিনটি গুম্ফাই বিশিষ্ট। এদের মধ্যে লামায়ুরু গুম্ফা হল লাদাখের প্রাচীনতম এবং উচ্চতম গুম্ফা। এই পথের একটি বড় আকর্ষণ হল লে থেকে ৩২ কিলোমিটার দূরে নিমু গ্রামের কাছে সিন্ধু নদ এবং জাঁসকার নদীর সঙ্গম। লে থেকে লিকির গুম্ফা ৫৮ কিলোমিটার, আলচি গুম্ফা ৬৮ কিলোমিটার আর লামায়ুরু গুম্ফা ১২৫ কিলোমিটার দূরে। লামায়ুরু থেকে কারগিলের পথে রয়েছে মুলবেকের বিশ্ববিখ্যাত পাহাড়ে খোদাইকরা বুদ্ধমূর্তি।

আর্যদের গ্রাম

লাদাখের যে নতুন এলাকাটি কয়েকবছর হল পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে তা হল 'দ্রোকপাদের দেশ' নামে অভিহিত সিন্ধু তীরবর্তী কয়েকটি গ্রাম, যার অধিবাসীদের দৈহিক গঠন, ধর্মাচরণ, ভাষা এবং বেশভূষা সম্পূর্ণ আলাদা। অনেকের মতে, এরাই খাঁটি আর্যদের বংশধর। এই গ্রামগুলি হল অচিনাথাং, হানুথাং, বিয়ামা, দা আর গারখুন। লে থেকে কারগিল যাবার পথে ৯৭ কিলোমিটার দূরে খালাসে। এখান থেকেই আরেকটি পথ ডানদিকে চলে গেছে ৭৪ কিলোমিটার দূরের বাটালিক শহরে। এই পথ ধরে ৪০ কিলোমিটার গেলেই আরম্ভ হয়ে যাবে দ্রোকপাদের দেশ। বাস সার্ভিস অনির্ভরযোগ্য তাই ভাড়া গাড়িই ভরসা। থাকার জন্য সম্প্রতি বেশ কয়েকটি গেস্টহাউস তৈরি হয়েছে। এই অঞ্চলে বেড়াতে গেলেও ইনার লাইন পারমিট প্রয়োজন।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কখন যাবেন

লাদাখ ভ্রমণের মরসুম মাত্র চার মাস, জুন থেকে সেপ্টেম্বর। মরসুমের প্রথমে শীত একটু বেশি হলেও পথ সংলগ্ন তুষারাবৃত পাহাড়ের শোভা মনোমুগ্ধকর আর মরসুমের শেষে গাছভর্তি আপেলের শোভা এক অন্য আকর্ষণ।

কীভাবে যাবেন

দিল্লি, চণ্ডিগড়, জম্মু এবং শ্রীনগর থেকে বিমানে লে যাওয়া যায়। দীর্ঘ বাসযাত্রার ধকল সহ্য করতে যারা অসমর্থ অথবা যাদের একান্তই সময়ের অভাব একমাত্র তাদের পক্ষেই উচিত হবে আকাশপথে লে গিয়ে পৌঁছনো।

সড়কপথে দুভাবে লে যাওয়া যায়। প্রথমটি হল শ্রীনগর থেকে কারগিল হয়ে। এই পথটি প্রতিবছর মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহ নাগাদ চালু হয় এবং নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ অবধি খোলা থাকে। এই পথের দূরত্ব ৪৩৪ কিলোমিটার। লে যাবার দ্বিতীয় পথটি গেছে মানালি হয়ে। এই পথটি ইদানীং পর্যটক মহলে বেশি জনপ্রিয়। এই পথটি জুনের শেষ দিকে থেকে অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত খোলা থাকে। সবচেয়ে ভালো হয় একদিক দিয়ে গিয়ে অন্য পথ দিয়ে ফিরে আসা। যারা মানালি থেকে লে গিয়ে লাদাখ ভ্রমণ শেষে শ্রীনগরের পথে ফিরতে ইচ্ছুক তাদের উচিত হবে লে থেকে সরাসরি শ্রীনগর যাবার বাসে না উঠে লে থেকে গাড়ি ভাড়া করে কারগিলের দিকে যাত্রা করা। সকালে প্রাতরাশ করে রওনা দিয়ে যাবার পথেই দেখে নেওয়া যাবে গুরুদ্বার পাথর সাহিব, লিকির গুম্ফা, আলচি গুম্ফা, লামায়ুরু গুম্ফা আর মুলবেকের বিখ্যাত বুদ্ধমূর্তি। সম্ভব হলে ঐতিহাসিক রেশম পথের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র কারগিলে একটা অতিরিক্ত দিন থাকতে পারলে তাও হবে এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। যাঁরা কারগিলে রাত্রিবাস করতে আগ্রহী নন তাঁরা স্বচ্ছন্দেই শ্রীনগর যাবার বাস বা শেয়ারের টাটাসুমো পাবেন। এই বাস এবং সুমো রাত বারোটা নাগাদ ছাড়তে আরম্ভ করে।

কোথায় থাকবেন

সৌভাগ্যবশত লাদাখে যখন বেড়াবার মরসুম আরম্ভ হয় মানালি বা শ্রীনগরে তখন 'অফ সিজন'। তাই সেখানে থাকার জন্য ৩০০-৩৫০ টাকার মধ্যে দ্বিশয্যার ঘর পেতে সমস্যা হবে না। লে শহরে এখন হোটেল আর গেস্টহাউসের ছড়াছড়ি। কমবেশি ৪০০ টাকার মধ্যে দ্বিশয্যার ঘর পাওয়া যাবে এমন কয়েকটি হোটেলের নাম: **Dreamland** (☎ 252089); **Deskitchan** (☎ 251523); **Vimala** (☎ 252754); **Ibex** (☎ 252412); **Himalay** (☎ 252304) **Kangla** (☎ 253670); **Hill View** (☎ 252258)

লে শহরে হোটেলের পাশাপাশি গেস্টহাউসের সংখ্যাও প্রচুর। বেশিরভাগ গেস্টহাউসগুলি পরিচালনা করেন লাদাখি পরিবারের সদস্যরা। এখানে রান্নাঘরের সুবিধা পাওয়া যায়। লাদাখি জীবনযাত্রা কাছ থেকে দেখার সুযোগ মেলে এইসব গেস্টহাউসে থাকলে। ভাড়াও খুব একটা বেশি নয়। ৩০০-৪০০ টাকার মধ্যেই দ্বিশয্যার ঘর পাওয়া যাবে। আবাসিকদের চাহিদা মতো খাবার পরিবেশনের ব্যবস্থাও রয়েছে। কয়েকটি গেস্টহাউসের নাম নিচে দেওয়া হল:

Old Ladakh (☎ 252951); **Indus** (☎ 252502); **Zigme** (☎ 253563); **Yasmin** (☎ 252405); **Shanti** (☎ 253084) **Tibet** (☎ 252404); **Khanmanjil** (☎ 252681); **Padma** (☎ 252630)

হোটেল এবং গেস্টহাউস ছাড়া সরকারি ট্যুরিস্ট লজেও ৪০০ টাকার মধ্যে ঘরের ব্যবস্থা

আছে। কারগিলে রাত্রিবাসের জন্য ট্যাক্সিস্ট্যান্ড সংলগ্ন হোটেল সিয়াচেন আদর্শ।
☎(০১৯৮৫) ২৩২৩২১, ২৩৩০৫৫।

কীভাবে বেড়াবেন

সুদূর পশ্চিমবঙ্গ থেকে লাদাখের প্রধান শহর লে গিয়ে পৌঁছনোই এক অপরূপ ভ্রমণ। এরপর রয়েছে লাদাখের দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে থাকা বিখ্যাত জায়গাগুলি ঘুরে দেখা। লাদাখ ভ্রমণের সবচেয়ে পীড়াদায়ক সমস্যাটি হল এর অপ্রতুল পরিবহণ ব্যবস্থা। লাদাখে পথ আছে কিন্তু যাত্রী পরিবহণ ব্যবস্থার হাল শোচনীয়। বেশ কয়েকটি জায়গায় সপ্তাহে প্রতিদিন বাস যায় না। এমন জায়গাও আছে যেখানে সপ্তাহে একদিন মাত্র বাস যাওয়া-আসা করে। লোকাল বাসে একমাত্র হেমিস এবং থিকসে গুম্ফা যাওয়া যেতে পারে। এই অবস্থায় টাটা সুমো বা মারুতি জিপসির মতো গাড়ি ভাড়া করা ছাড়া পর্যটকদের গত্যন্তর নেই। লে ট্যাক্সি ইউনিয়ন লাদাখের বিভিন্ন স্থানের পর্যটন দপ্তর অনুমোদিত ট্যাক্সি ভাড়া নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন আর এর সঙ্গেই এক বিচিত্র নিয়মের শৃঙ্খলে তাবৎ ভ্রমণরসিকদের বেঁধে দিয়েছেন। এই নিয়মটি হল গাড়িতে পাঁচজনের বেশি যাত্রী নেওয়া যাবে না। বাচ্চা থাকলে সেক্ষেত্রে অবশ্য ছাড় আছে। কী কারণে এই অদ্ভুত নিয়মটি চালু হয়েছে সে আলোচনায় না গিয়ে স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে এর ফলে সাধারণ ভারতীয় পর্যটকরা সমস্যায় পড়েছেন। যাইহোক, গাড়ি ভাড়া যখন করতেই হবে তখন যে হোটেল বা গেস্টহাউসে আপনি উঠেছেন তার ম্যানেজারকেই অনুরোধ করুন গাড়ির ব্যবস্থা করে দিতে। গাড়ি ভাড়া একই থাকবে কিন্তু প্রয়োজনে নিয়মের 'বজ্র আঁটুনি' থেকে 'ফস্কা গেরো' খুঁজে বার করার কাজে এদের দক্ষতা ঈর্ষণীয়। শুধু তাই নয়, লাদাখের যে সব অঞ্চলে বেড়াতে গেলে ইনার লাইন পারমিটের প্রয়োজন হয় তার ব্যবস্থাও এরাই করে দেবেন।

অতিরিক্ত তথ্য

ভোটার পরিচয়পত্র বা অন্য সচিত্র পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখতে হবে। পরিচয়পত্রের কয়েকটি জেরক্স কপিও নিতে ভুলবেন না। পারিবারিক চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলে ব্যক্তিগত ওষুধপত্র নেবেন। উচ্চতাজনিত অসুস্থতা নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। প্রাথমিক অস্বস্তি দূর হতে খুব বেশি সময় লাগে না। হোমিওপ্যাথিক ওষুধ COCA-6 লাদাখের পথে খুবই কার্যকরী। অবশ্যই সঙ্গে নেবেন। দীর্ঘ বাসযাত্রার সময় সঙ্গে পর্যাপ্ত শুকনো খাবার, ফল এবং পানীয় জল নেবেন। লে পৌঁছে প্রথম চব্বিশ ঘণ্টা বেশি হাঁটাহাঁটি না করাই ভালো। লাদাখে সূর্যের প্রখর তাপ ভারি অস্বস্তিকর এবং সময় বিশেষে কষ্টদায়ক। মাথার টুপি অবশ্যই নেবেন এবং সম্ভব হলে ছাতাও। কয়েকটি প্রয়োজনীয় ঠিকানা:

হিমাচল প্রদেশ ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন
ইলেক্ট্রনিক সেন্টার
১/১এ, বিপ্লবী অনুকূল চন্দ্র স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭২ ☎২২১২-৬৩৬১/৭৪৭০

জম্মু ও কাশ্মীর ট্যুরিস্ট অফিস
১২, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৩ ☎২২২৮-৫৭৯১
ট্যুরিস্ট রিসেপশন সেন্টার, কারগিল (ট্যাক্সিস্ট্যান্ডের কাছে)
☎(০১৯৮৫) ২৩২৭২১, ২৩২২৬৬

ট্যুরিস্ট রিসেপশন সেন্টার, লে ☎২৫২২৯৭, ২৫২০৯৪, ২৫২০৯৫

সবশেষে জানাই অনেকেই নিজেদের উদ্যোগে সপরিবারে লাদাখ বেড়িয়ে আসতে অত্যন্ত আগ্রহী কিন্তু তেমন ভরসা পাচ্ছেন না। এদের জন্য একজন 'মুসকিল আসান'-এর সন্ধান দিয়ে রাখছি। কাশ্মীরি পণ্ডিত বিরিন্দার কাউলের পেশা হোটেল ব্যবসা কিন্তু নেশা

পর্যটকদের, বিশেষ করে বাঙালি ভ্রমণরসিকদের নানাবিধ সমস্যার সমাধান করা। প্রয়োজনে এঁর সঙ্গে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

Verinder Koul, Manager, Hotel Deskit Chan (Beside German Bakery)
Zangsti, Leh ☎ 251523

লে শহরের এস টি ডি কোড ০১৯৮২।

'ভ্রমণ' জুন ২০০৪

লে-শ্রীনগর পথের কারগিল

লাদাখ ভ্রমণের শেষ পর্যায়ে নুব্রা ভ্যালি বেড়িয়ে আবার ফিরে এলাম লে শহরে। লাদাখে প্রবেশ করেছিলাম চণ্ডীগড়, মানালির পথ ধরে। এবার ফিরব কারগিল-শ্রীনগরের পথে। রাতের আহার সারতে ঢুকলাম 'জার্মান বেকারি' সংলগ্ন রেস্তোরাঁতে। বিদেশি পর্যটকদের খুব প্রিয় এই জায়গা। ইজরায়েল, স্পেন, ইতালি, ব্রিটেন আর ফ্রান্সের ভ্রমণরসিকের দল পছন্দসই খাবারের প্লেট নিয়ে আড্ডা মারছে। কাজ চালানোর মতো ইংরিজি সবার জানা আছে তাই ভাষা কোনও সমস্যা নয়। এই আড্ডার মধ্যেই এরা নতুন দল গড়ছে, পুরনো দলের সদস্যরা সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এবং আরও কত ঘটনাই না ঘটছে। রেস্তোরাঁর প্রবেশপথেই রয়েছে বিরাট এক নোটিস বোর্ড। এই নোটিস বোর্ড নিয়েই একটা বই লেখা যায়। বোর্ডের ওপরের দিকে রয়েছে কাগজে লেখা 'সঙ্গী চাই' ঘোষণা। যেমন 'এই মাসের পনেরো তারিখে টাটা সুমোয় প্যাংগং লেক যেতে আগ্রহীদের জন্য দুটি সিট খালি আছে, যোগাযোগ করুন নিচের ঠিকানায়'। এরপরে রয়েছে বেচা-কেনার নানা খবর। যেমন 'খুব ভালো অবস্থায় ৩৫০ সি.সি. ইঞ্জিনের এনফিল্ড বুলেট মোটর সাইকেল বিক্রি আছে, সত্বর যোগাযোগ করুন নিচের ঠিকানায়। নোটিস বোর্ডের একেবারে নিচের অংশটিই সবচেয়ে আকর্ষণীয়। এখানে সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন পর্যটকেরা তাঁদের সঙ্গীদের জন্য দারুণ সব বার্তা রেখে দিয়েছেন। একেবারে প্রথমেই যে চিঠিটি শোভা পাচ্ছে তাতে লেখা 'প্রিয় ডেভিড, স্পেনের মারিয়া এবং তার সঙ্গীদের সঙ্গে আমি চললাম সোমোরিরি, ফিরব চারদিন পর। আশা করছি তার মধ্যেই তুমি ট্রেকিং সেরে জাঁসকার থেকে ফিরে আসবে। পুরনো ডেরাতেই দেখা হবে, ইতি নোরা'। একবার পড়া আরম্ভ করলে শেষ না করে থামা যায় না এমনই বৈচিত্র্যময় এই পত্রাবলী। কিছু কিছু চিঠি লেখা হয়েছে হিব্রু এবং ফরাসিতে তাই তাদের বক্তব্য অজানাই রয়ে গেল।

২২ আগস্ট, ২০০৩ সকাল নটা নাগাদ টাটা সুমোয় যাত্রা করলাম কারগিলের দিকে। গাড়িতে মোট সাতজন যাত্রী, ভাড়া পড়ল মাথাপিছু ৫০০ টাকা করে। লে শহরের জামিয়া মসজিদের কাছ থেকে আমাদের গাড়ি ছাড়ল। একটু এগিয়ে যেতেই চোখে পড়ল লাদাখি মহিলারা ফুটপাথের ধার দিয়ে সারি বেঁধে তরিতরকারির পসরা সাজিয়ে বসেছেন। খদ্দের কম হলেও তাদের ছবি তোলার লোকের অভাব দেখলাম না। হালকা উতরাই পথ ধরে চলে এলাম শ্রীনগরগামী জাতীয় রাজপথের ওপর। বাঁদিকে বিমানঘাঁটি ছাড়াবার পর চারদিকেই সেনাবাহিনীর প্রবল উপস্থিতি চোখে

পড়তে আরম্ভ করল। সৈন্যদের ব্যারাক, সেনা অফিসারদের মেস, চিকিৎসাকেন্দ্র, কনভয় দাঁড়াবার জায়গা আর ব্যস্ত সেনা দপ্তর দেখে এই রাজপথের সামরিক গুরুত্ব বুঝতে কষ্ট হয় না। পিছন থেকে এগিয়ে আসা কনভয়কে পথ ছেড়ে দিতে মাঝে মধ্যেই আমাদের গাড়িকে রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে পড়তে হচ্ছিল।

আমাদের বাঁদিকে সিন্ধুনদ বয়ে চলেছে। এই সেই বিখ্যাত সিন্ধুনদ। নামের ওজন যতখানি, কলেবর ততটা নয়। কলেবর বৃদ্ধি পাবে চলার পথে অন্য নদীর জলে পুষ্ট হয়ে, বিশেষ করে জাঁসকার নদীর সঙ্গে মিলনের পর। আমাদের চলার পথের দুই দিকেই তৃণহীন পাহাড়ের শ্রেণী। সবুজের চিহ্নমাত্র নেই। এটাই লাদাখের বৈশিষ্ট্য। রুক্ষ পাহাড়, কিন্তু প্রতিটি পাহাড়ের যেন নিজস্ব একটা রং রয়েছে। এই কারণেই চোখে ক্লান্তি আসে না। লে থেকে ১৫ কিলোমিটার আসার পর ডানদিকে বড় সেনানিবাস চোখে পড়ল। প্রবেশপথে বড় বড় হরফে লেখা 'LADAKH SCOUTS REGIMENTAL CENTRE'। আরও পাঁচ কিলোমিটার যাবার পর দেখি দুপাশের পাহাড়ের শ্রেণী অনেক দূরে সরে গেছে, আমরা চলেছি দিগন্তবিস্তৃত, প্রায় সমতল এক প্রান্তরের ওপর দিয়ে। এ যেন এক তেপান্তরের মাঠ। এক সময় দীর্ঘ এই প্রান্তর শেষ হল, পৌঁছে গেলাম পথ সংলগ্ন শিখ ধর্মস্থল গুরুদ্বার পাথর সাহিব। লে থেকে এর দূরত্ব ২৫ কিলোমিটার। এই ধর্মস্থানটিকে নিয়ে প্রচলিত কিংবদন্তী হল, গুরু নানকদেব ঘুরতে ঘুরতে একবার এই স্থানে এসে ধ্যানে বসেছিলেন। সেই সময় এখানে বাস করত এক দৈত্য। গুরু নানকের উপস্থিতি তার পছন্দ হয়নি। তাই তাকে মারতে কাছের পাহাড় থেকে গড়িয়ে দিল এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড। ওই বিশাল পাথর গুরু নানককে স্পর্শ করার মুহূর্তে মোমের মতো নরম হয়ে গেল। গুরু নানকের অবয়ব ছাপ রেখে দিল সেই নরম হয়ে যাওয়া পাথরে। এই পাথরটিকেই ভক্তি সহকারে স্থাপনা করে ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এই গুরুদ্বার। বর্তমানের বিশাল ভবনটি তৈরি হয় ১৯৮১ সালে, প্রধানত ভারতীয় সেনাবাহিনীর সৌজন্যে। গুরুদ্বারের প্রধান পুরোহিত, যিনি 'গ্রন্থী' নামে পরিচিত, যত্ন করে সবকিছু ঘুরিয়ে দেখালেন। সেই পাথরটিকেও চাক্ষুষ করলাম।

আমাদের টাটা সুমো এখন চলেছে নিমু গ্রামের দিকে। নিমুর চার কিলোমিটার আগে ভিউ পয়েন্টে, যেখান থেকে চোখে পড়ে লাদাখের দুটি প্রধান জলধারা সিন্ধুনদ এবং জাঁসকার নদীর মিলনস্থল।

নিমু বেশ বড় স্বচ্ছল গ্রাম। ঘরবাড়ি আর ফসল ভর্তি খেত-খামার। লাদাখ বেড়াবার সময় দেখেছি এত রুক্ষতার মাঝেও যেখানেই মাটি আর জলের মণিকাঞ্চন যোগ ঘটেছে সেখানেই ফসল একেবারে উপচে পড়েছে। প্রতিটি লাদাখি বাড়িতে ফুলের বাগান আর আপেল গাছ চোখে পড়ছে। ক্ষণস্থায়ী গ্রীষ্মকালের সঞ্জীবনী ছোঁয়া পেয়ে প্রতিটি ফুল গাছে শুধু ফুল আর ফুল, আপেল গাছের ডাল ফলের ভারে নুয়ে পড়েছে।

নিমুর পরবর্তী গ্রাম বাসগো যাবার সময় পথে পড়ল এক সৈন্য শিবির। জওয়ানদের শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাত্রা আর রণকৌশলের অনুশীলন দেখতে বেশ লাগছিল। বাসগো গ্রামে ঢোকার আগেই দূর থেকে চোখে পড়ল সাদা রঙের বড়

বৌদ্ধস্তূপ আর একাধিক চোর্তেন। নিমু গ্রামে গাছভর্তি আপেল দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম আর বাসগোর বাগানে দেখলাম ফলন্ত অ্যাপ্রিকট বা খোবানি গাছ।

বাসগো ছাড়িয়ে, চড়াই পথ বেয়ে আমাদের সুমো গিয়ে উপস্থিত হল এক সমতল প্রান্তরে। দুপাশের পাহাড় সরে গেছে অনেকটা দূরে। কয়েকটি পাহাড়ের মাথায় এখনও অল্প বরফ জমে আছে। এই বরফ পুরোপুরি অদৃশ্য হবার আগেই আবার নতুন করে তুষারপাত আরম্ভ হয়ে যাবে। পুরো এলাকাটাই বরফের চাদর মুড়ি দেবে। বাসগো থেকে ৬ কিলোমিটার দূরে প্রধান রাজপথ থেকে বেরিয়ে একটা সরু পিচরাস্তা সোজা উত্তরদিকে চলে গেছে সহস্র বছরের প্রাচীন বিখ্যাত লিকির গুম্ফায়। এখান থেকে দূরত্ব নয় কিলোমিটার। লিকির না গিয়ে সোজা পথ ধরে পৌঁছে গেলাম ছোট্ট শহর সাসপোল, বাসগো থেকে দূরত্ব ১৯ কিলোমিটার। সাসপোল শহরের কেন্দ্রে এক বিশাল প্রার্থনাচক্র ঘোরাতে দেখলাম বেশ কিছু বিদেশি পর্যটককে।

সাসপোল ছাড়িয়ে পথ দুভাগ হয়ে গেছে। সোজা পথটি চলে গেছে কারগিলের দিকে আর বাঁদিকের পথ সিন্ধুনদ পেরিয়ে চলে গেছে পাঁচ কিলোমিটার দূরে, সুপ্রাচীন আলচি গুম্ফায়। আমরা বাঁদিকের পথ ধরলাম। সিন্ধুনদের ওপর তৈরি সেতুটি আমরা পায়ে হেঁটে পেরোলাম, উদ্দেশ্য, নদের প্রবল জলধারাকে খুব কাছ থেকে দেখা। জলস্রোতের দাপট দেখে বুক কেঁপে উঠল। ব্রিজ পেরিয়ে, অল্পদূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল আমাদের গাড়ি। পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে দুটি ছোট্ট পরী। এদের পরনে স্কুলের ইউনিফর্ম সাদা সালোয়ার-কামিজ আর নীল দোপাট্টা, কাঁধে ভারি স্কুলব্যাগ। শিরীন আর দোলমা স্কুল থেকে ফিরছে। আলচি গ্রামের এই দুই কন্যা সাসপোলের স্কুলে ক্লাস সেভেনের ছাত্রী। যাওয়া-আসার দশ কিলোমিটার পথ বেশিরভাগ দিন পায়ে হেঁটেই পাড়ি দিতে হয়। আজ সমস্যায় পড়ে গাড়ি থামাতে বাধ্য হয়েছে। সমস্যাই বটে। দোলমার পায়ের চপ্পল ছিঁড়ে গেছে। দুজনের মধ্যে শিরীন একটু বেশি সপ্রতিভ। আমাদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিল খুব সুন্দরভাবে।

আলচি গুম্ফা গাড়ি থেকে নেমে ঢালু পথ ধরে এগিয়ে যেতে হয়। প্রচুর বিদেশি পর্যটক চোখে পড়ল। গুম্ফা যাবার পথের ধারে সারি সারি দোকান রকমারি পসরা সাজিয়ে সাহেব-মেমদের আকর্ষণ করছে। পাথরের মালা এবং লাদাখি অলঙ্কারের বিক্রিই বেশি বলে মনে হল। আমার চোখের সামনেই একটা পাথরের মালা তিন হাজার টাকায় কিনলেন এক মার্কিন ললনা, দাম দিলেন ডলারে।

লাদাখের রাজা রিন চেন জিগমে একাদশ শতাব্দীতে নির্মাণ করান এই আলচি গুম্ফা। বর্তমানে এটির দেখাশোনা করছেন লিকির মঠের লামারা। বাইরে থেকে দেখেই এই বুদ্ধমন্দিরের প্রাচীনত্ব বোঝা যায়। কাষ্ঠনির্মিত অংশের কারুকার্য কালের প্রভাবে অনেকটাই ক্ষয়ে গেছে, মন্দিরের কাঠামোর অবস্থাও ভালো নয়। সংস্কারের কাজ আরম্ভ হয়েছে দেখে ভালো লাগল। একতলার দরজা বন্ধ, দোতলায় উঠে গিয়ে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বুদ্ধের মঞ্জুশ্রী মূর্তি (জ্ঞানী বুদ্ধ) দর্শন করলাম।

আলচি দেখে সিন্ধু পেরিয়ে ফিরে এলাম কারগিলের পথে। এখান থেকে খালাসে পর্যন্ত ৩২ কিলোমিটার পথ সিন্ধুনদ বয়ে চলেছে পথের পাশ দিয়ে।

লে-কারগিল পথে খালাসের অবস্থান বেশ গুরুত্বপূর্ণ। পথ এখানে দুভাগ হয়ে

গেছে। সোজা পথ চলে গেছে কারগিল আর ডানদিকের পথটি গেছে আর্যদের বংশধর দ্রোকপাদের গ্রাম হানু (৪০ কিলোমিটার), দা (৬৬ কিলোমিটার) আর বাটালিক (৭৪ কিলোমিটার)। এখানে যাত্রীদের পরিচয়পত্র পরীক্ষা করল রাজ্য পুলিশের কর্মীরা। খালাসেতে প্রচুর খাবারের দোকান। দুদিকের যাত্রীরাই এখানে মধ্যাহ্নভোজন সারেন। পথের ধারে আপেল, নাসপাতি আর খোবানি বিক্রি করছে কয়েকজন গ্রামবাসী। আমরাও গরম রুটি, আলু-গোবির সব্জি আর টক দই দিয়ে চমৎকার ভোজন করলাম।

ভোজনান্তে আবার যাত্রা শুরু করলাম কারগিলের দিকে। পথে পড়বে বিখ্যাত লামায়ুরু গুম্ফা। একটু পরেই সিন্ধুনদ আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সোজা উত্তর-পশ্চিমে উঠে পাকিস্তানে ঢুকে পড়বে। খালাসে ছাড়িয়ে, সিন্ধুর ওপর সেতু পেরিয়ে আমাদের গাড়ি কঠিন চড়াই পথ ধরল। সিন্ধুনদ চলে গেল চোখের আড়ালে।

খালাসে থেকে লামায়ুরু বৌদ্ধমঠের দূরত্ব ২৭ কিলোমিটার। ভারি রোমাঞ্চকর এই পথযাত্রা। চড়াই পথ বেয়ে একটু একটু করে গাড়ি ওপরে উঠছে আর তার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকের পাহাড়ের বিচিত্র রূপ ধাপে ধাপে ধরা দিতে আরম্ভ করল। তৃণগুল্মহীন এই পাহাড়ের গায়ে বাতাস, বারিধারা আর তুষার তাদের শক্তি প্রয়োগ করে নানারকম ভাস্কর্যের সৃষ্টি করেছে। লামায়ুরু গুম্ফার পাঁচ কিলোমিটার আগে সম্পূর্ণ নতুন এক ভূমিরূপ আমাদের দৃষ্টিগোচর হল। প্রকৃতির বিচিত্র খেয়ালে কয়েকটি পাহাড় দুরকম রূপ ধরেছে। পাহাড়ের ওপরের অংশ লাদাখের অন্যান্য পাহাড়ের মতোই প্রস্তরময় এবং হালকা খয়েরি রঙের অথচ পাহাড়ের বিস্তৃত পাদদেশ দেখে মনে হচ্ছে তা তৈরি হয়েছে হলুদ রঙের বালি দিয়ে। শুধু তাই নয়, এই ঢালু হলুদ অংশটি বাৎসরিক তুষারপাতের ফলে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়েছে। আমাদের গাড়িচালক জানাল, এই এলাকাটিকে 'Moon Land' নাম দেওয়া হয়েছে। প্রধান রাজপথ ছেড়ে বাঁদিকের সরু পিচরাস্তা অনুসরণ করে এগিয়ে গেলাম লামায়ুরু গুম্ফার দিকে। প্রায় তেরো হাজার ফুট উচ্চতায় লাদাখের এই প্রাচীনতম বৌদ্ধমঠটিকে দেখে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। পাথর, মাটি আর কাঠ দিয়ে তৈরি একাধিক ভবনবিশিষ্ট এই গুম্ফার সামনে চাষের জমি ধাপে ধাপে নেমে গেছে। সবুজ বার্লি গাছ হাওয়ায় দুলছে। কৃষিজমির কাছেই রয়েছে উইলো গাছের ঝাড় আর সুঠাম পপলার বৃক্ষের সারি। দিগন্তপ্রসারী রুক্ষতার মাঝে সবুজের অধিষ্ঠান চোখ জুড়িয়ে দেয়। গাড়ি থেকে নামার আগেই তেড়ে বৃষ্টি নামল। লাদাখে বৃষ্টিপাতও এক বিরল ঘটনা। ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিলাম বারান্দার নিচে। আমাদের পরেই সেখানে হাজির হলেন চারজন বিদেশি পর্যটক। এঁরা দুটি মোটর সাইকেল নিয়ে সারা লাদাখ ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এদের ইচ্ছে লামায়ুরুতে দিনকয়েক থাকবেন। বৃষ্টিপাতের ফলে শীতের দাপট বেড়ে গেল। এই অবস্থায় গুম্ফার সেরা জায়গাটি হল প্রধান মন্দির কক্ষ যা 'দুখাং' নামে পরিচিত। সেখানে গিয়ে দেখি কয়েকজন দর্শনার্থী মঠের প্রধান লামার সঙ্গে কথা বলছেন। প্রধান লামার বয়স পঞ্চাশের বেশি বলে মনে হল না। ইংরিজি ভাষায় বেশ স্বচ্ছন্দ। উনি শান্তভাবে কৌতূহলী মানুষদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

প্রশস্ত মন্দিরকক্ষের অভ্যন্তরে প্রশান্তলোচন বুদ্ধমূর্তির সামনে সাতটি রজত পাত্রে জল রাখা আছে। জ্বলছে অসংখ্য ঘিয়ের প্রদীপ আর ধূপকাঠি। কনককান্তি পাত্রে পুজোর নৈবেদ্য সাজানো আছে। ফলমূলের সঙ্গেই রাখা আছে বিস্কুটের প্যাকেট, চকোলেট আর লজেন্স। বুদ্ধমূর্তির কাছাকাছি রয়েছে পদ্মসম্ভব, মহাকাল, অতীশ দীপঙ্কর আর অন্যান্য বৌদ্ধ ধর্মগুরুদের মূর্তি। ঘরের এক কোণে সিল্কের কাপড়ে মোড়া প্রচুর পুঁথি যত্ন করে রাখা আছে। পুঁথির কাছে গিয়ে আবিষ্কার করলাম ধ্যানমগ্ন অবস্থায় এক বিদেশি বসে আছেন গালিচার ওপর আসনপিঁড়ি হয়ে। হঠাৎ দেখে মনে হয় মানুষ নয়, মূর্তি। মঠের এক প্রবীণ লামা আমাদের ঘরসংলগ্ন ছোট একটি গুপ্ত কক্ষ দেখিয়ে বললেন এখানেই এককালে ধর্মগুরুরা সাধনা করতেন।

ঘরের বাইরে বেরিয়ে দেওয়ালচিত্র দেখলাম। চড়া রং ব্যবহার করে অশুভ শক্তির পরাজয়ের বিভিন্ন আখ্যান চিত্রিত রয়েছে। বুঝিয়ে দেবার লোক থাকলে বৌদ্ধ গুম্ফার দেওয়ালচিত্র দেখা এক আনন্দময় অভিজ্ঞতা। বিদায় নেবার আগে মঠের প্রবেশদ্বারে স্থাপিত বিশাল প্রার্থনাচক্র ঘোরালাম অনেকে মিলে।

লামায়ুরু গুম্ফাকে পিছনে ফেলে আবার এগিয়ে চললাম কারগিলের পানে। তেরো কিলোমিটার গিয়ে অতিক্রম করলাম ১৩,৪৩২ ফুট উঁচু ফোতুলা গিরিপথ। লে-শ্রীনগর পথে এইটিই হল উচ্চতম স্থান। গিরিপথে বরফ না থাকলেও কাছাকাছি পাহাড়ের মাথাগুলো বরফে ঢাকা। ফোতুলা পেরিয়ে আরও ১২ কিলোমিটার গিয়ে পেলাম ছোট্ট গ্রাম হেনাসকুট, উচ্চতা ১২,২০০ ফুট। চায়ের সন্ধানে এক দোকানে ঢুকে দেখি সেখানে দুরকম চায়ের ব্যবস্থাই রয়েছে। নুন-মাখন দিয়ে তৈরি তিব্বতি চা আর আমাদের পরিচিত দুধ-চিনির চা। স্থানীয় মানুষজনের পোশাক পরিচ্ছদ, ভাবভঙ্গি আর হাতের প্রার্থনাচক্র দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না যে আমরা এখনও লাদাখের বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত এলাকার মধ্যেই আছি। যত আমরা কারগিলের দিকে এগিয়ে যাব ইসলাম ধর্মাবলম্বী লাদাখিদের সংখ্যা বাড়তে থাকবে। এই হেনাসকুট থেকে একটি পাঁচদিনের অসাধারণ ট্রেকিং পথ চলে গেছে কাঞ্জি গিরিপথ পেরিয়ে রংদুম গুম্ফা। জাঁসকার পর্বতমালার অন্তর্গত এই অঞ্চলটিকে পদযাত্রীদের স্বর্গ বলা হয়। হেনাসকুটের পর সাত কিলোমিটার গিয়ে পৌঁছে গেলাম বুধ খারবু। ছোট্ট এই গ্রামটিতে রাত্রিবাসের জন্য ট্যুরিস্ট বাংলো তৈরি করা হয়েছে। এখান থেকেও একটি ট্রেকিং পথ সোজা চলে গেছে উত্তরদিকে সিন্ধুনদের ধারে দ্রোকপাদের দেশে। বুধ খারবুর পর নামিকা গিরিপথ পেরিয়ে উপস্থিত হলাম পাহাড়ে খোদাই করা নয় মিটার উঁচু বিখ্যাত বুদ্ধমূর্তির পায়ের কাছে। এই মূর্তি মুলবেক চাম্বা নামে পরিচিত। আফগানিস্তানের বিশ্ববিখ্যাত বামিয়ান বুদ্ধমূর্তি তালিবানদের হাতে ধ্বংস হবার পর এই চতুর্ভুজ মৈত্রেয় (ভবিষ্য বুদ্ধ) মূর্তিই এখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় পাথরে খোদাই করা বুদ্ধমূর্তি। প্রথম দর্শনেই মনে হয়েছিল এ তো শিবঠাকুরের মূর্তি। গলায়, কোমরে আর মণিবন্ধে রুদ্রাক্ষের মালা। মাথার জটা কাঁধ বেয়ে নেমে এসেছে। বাঁহাতে কমণ্ডলু। সহস্র বছর ধরে রোদ, বৃষ্টি, তুষারের অত্যাচার সহ্য করেও এই অপরূপ অমিতাভ মূর্তি স্মিতহাস্যে আজও অহিংসার শরণ নিতে জগৎবাসীকে উদ্বুদ্ধ করে চলেছে।

বুদ্ধমূর্তির অদূরেই মুলবেক বেশ সম্পন্ন গ্রাম। ওয়াখা নদী সংলগ্ন বিস্তৃত চাষের জমিতে ফসল উপচে পড়ছে। ফলের বাগানে আপেল আর খোবানিতে গাছ ভর্তি হয়ে আছে। মুলবেক থেকে পাশকুম এই ত্রিশ কিলোমিটার পথ চলে গেছে ওয়াখা নদীর ধার দিয়ে। খরস্রোতা নদীর দুপাশের দুই পাহাড়ের শ্রেণী নদীর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। পাশকুমের দিকে যতই এগিয়ে চলেছি দুপাশের পাহাড় ততই কাছে চলে আসছে। পথের ধারেই খেত থেকে কড়াইশুঁটি তুলছে ছেলেমেয়েরা। পাশকুম যখন আর পাঁচ কিলোমিটার দূরে, অবাক হয়ে দেখি দুপাশের পাহাড় পরস্পরের এত কাছে চলে এসেছে যে তাদের মধ্য দিয়ে নদী এবং বাসরাস্তা কোনও রকমে পথ করে নিয়েছে। পাহাড়ি নদীর প্রবল জলকল্লোল সংলগ্ন শৈলপ্রাচীরে প্রতিধ্বনিত হয়ে এক অশ্রুতপূর্ব সঙ্গীত রচনা করেছে। দৃশ্যপটের বৈচিত্র্যে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলাম বললে অত্যুক্তি হবে না।

ওয়াখা নদীর ব্রিজ পেরিয়ে বাঁদিকের খাড়া চড়াই পথ ধরল আমাদের বাহন। পাশকুম শহরে পৌঁছে সুদৃশ্য মসজিদ, ঘরবাড়ি আর লোকজনের বেশভূষা দেখে মনে হল মধ্য এশিয়ার কোনও জনপদে এসে উপস্থিত হয়েছি। পাশকুম থেকে কারগিল— এই ১৫ কিলোমিটার পথ মুগ্ধ বিস্ময়ে শুধু দেখার। যেমন পথের সৌন্দর্য তেমনই আকর্ষণীয় অধিবাসীদের বৈচিত্র্যময় জীবনযাত্রার টুকরো টুকরো ছবি। এক সময় দূর থেকে সুরু নদীর পাড়ে কারগিল শহর চোখে পড়ল। অস্তগামী সূর্যের শেষ আলোয় কারগিলকে দেখে মনে হচ্ছিল আরব্য উপন্যাসের কোনও নগরী।

কারগিল পৌঁছতে কিন্তু অন্ধকার ঘনিয়ে এল। নতুন জায়গা, কিছুই চিনি না, তার ওপর কোনও সঙ্গী নেই, তাই একটু চিন্তাই হচ্ছিল। আমাদের ড্রাইভারের পরামর্শমতো গিয়ে হাজির হলাম হোটেল সিয়াচেনের রিসেপশন কাউন্টারে। দেখা পেলাম আব্দুল রশিদের। 'দেখা' না বলে দর্শন পেলাম বলাই ভালো। কাউন্টারে দাঁড়িয়ে একাধিক বিদেশি পর্যটককে হেলায় সামলাবার ফাঁকেই আমার দিকে এক গাল হাসি ছুড়ে দিলেন। আমি মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গেই রশিদ মিঞা আমার অবস্থাটা বুঝে নিয়ে মধুর কণ্ঠে বলে উঠলেন 'আপনি খুব ভাগ্যবান, এই মুহূর্তে একটি মাত্র সিঙ্গল রুম খালি আছে। ঘরভাড়া ৫০০ টাকা শুনেই যখন পালাবার উদ্যোগ নিচ্ছি, আব্দুল রশিদ কথার জাল বুনে আমায় দাঁড় করিয়ে দিলেন। কথায় কথায় জানালেন, রাতের কারগিল বড় বিচিত্র জায়গা। পুরনো বাসিন্দারাও মাঝে মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেন। এই তো সেদিন এক সাহেব আরও সস্তার হোটেল খুঁজতে গিয়ে কী বিপদের মধ্যেই না পড়েছিলেন। বলা বাহুল্য, এমন সব গায়ে কাঁটা দেওয়া 'স্থানীয় সংবাদ' শোনার পর আমার আর অন্য হোটেল খোঁজার উৎসাহ রইল না। আমার সুমতি দেখে রশিদ ভাই খুব খুশি হয়ে ফিস ফিস করে বললেন, 'ঠিক আছে, ঘরভাড়ায় আপনাকে পঞ্চাশ টাকার বিশেষ ছাড় দিয়ে দিচ্ছি'।

সিয়াচেন বেশ বড় হোটেল। আবাসিকদের মধ্যে বিদেশি পর্যটকদের সংখ্যাই বেশি। দোতলার ওপর পরিপাটি করে সাজানো একশয্যার ঘরটি দেখামাত্র বেশ পছন্দ হল।

ভোরবেলায় ঘুম ভাঙল আজানের ডাকে। কারগিল ভ্রমণের শুরুতেই এমন

একটি মধুর অভিজ্ঞতায় মন ভরে উঠল। শহর দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। ঠিক করলাম হোটেলের বাইরেই প্রাতরাশ সারব। ঘরের বাইরে পা দিতেই দেখি নীল আকাশের নিচে কারগিল শহর সকালের সোনালি আলোয় ঝলমল করছে। হোটেল থেকে বেরিয়েই একটা খাবারের দোকান আবিষ্কার করে ঢুকে পড়লাম। দোকানে খদ্দেরের সংখ্যা ছয়-সাত জন। কারও হাতে শুধু বড় চায়ের গ্লাস, কেউ আবার বড় রুটি আর চা দিয়ে নাস্তা সারছেন। ঠিক যেন সেই কাবুলের রুটি। গোটা একটা রুটি আমার মধ্যাহ্নভোজনের পক্ষে যথেষ্ট। খাবার সঙ্গে সঙ্গে এরা অনর্গল কথা বলে চলেছে। কথার একবর্ণও আমার বোধগম্য হল না। হবে কী করে? এরা যে বালতি ভাষায় কথা বলছে। বালতি হল বালতিস্তানের অধিবাসীদের ভাষা। বালতিস্তান বর্তমানে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের অংশ। এর সদর হল স্কার্দু। কারগিল শহর এবং সংলগ্ন জনপদগুলিতে বালতিরাই প্রধান জনগোষ্ঠী। এর কারণটি হল কয়েক শতাব্দী আগে এই অঞ্চলটি ছিল বালতিস্তানের শাসকের অধীনে। ধর্মে মুসলিম এবং প্রধানত শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত এই বালতিদের চেহারায় হাল্কা মঙ্গোলীয় ছাপ রয়েছে।

দোকানদার সমঝদার লোক। চায়ের সঙ্গে বিশালাকার রুটি না দিয়ে একটি প্লেটে দুটুকরো কেক রেখে গেল। কারগিলবাসীদের একটা বড় গুণের পরিচয় অল্প সময়ের মধ্যেই পেয়ে গেলাম। এরা অত্যন্ত মিশুকে। হিন্দি ভাষার মাধ্যমে কথাবার্তা চালাতে কোনও সমস্যা হয়নি। সুদূর কলকাতা থেকে আসা এই আগন্তুককে নিয়ে কী গভীর তাদের কৌতূহল। যতখানি পারলাম তাদের কৌতূহল মেটালাম। তাঁরাও আমার জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে সাহায্য করলেন। আমার এই নতুন বন্ধুরা সবাই এসেছেন শানকু গ্রাম থেকে, কারগিল থেকে ৪২ কিলোমিটার দূরে। সঙ্গে নিয়ে এসেছেন আপেল আর খোবানির পসরা। কারগিল জেলার খোবানি নাকি স্বাদে তামাম কাশ্মীরে এক নম্বর। মে মাসে যখন গাছে গাছে সাদা রঙের ফুল আসে সে নাকি এক দেখার মতো দৃশ্য।

দোকান থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তার দিকে বাঁদিকে কারগিল ট্যাক্সিস্ট্যান্ড চোখে পড়ল। মারুতি আর টাটা সুমোর ছড়াছড়ি। এই স্ট্যান্ডে প্রতিদিন রাত বারোটার সময় সমস্ত লাদাখ যখন নিদ্রামগ্ন তখন শুরু হয় প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততা। কারণ সারাদিনে একমাত্র এই সময়টাতেই শ্রীনগরগামী গাড়িগুলো এক এক করে ছাড়তে আরম্ভ করে। শ্রীনগরগামী সবরকম অসামরিক যানবাহন রাত বারোটার পর যাত্রা আরম্ভ করে দ্রাস শহরে গিয়ে জমা হয়। দ্রাসের পর সেনাবাহিনীর কড়া নজরদারির মধ্যে এই গাড়ির কনভয় জোজিলা গিরিপথের দিকে রওনা হয়।

ট্যাক্সিস্ট্যান্ডের অদূরেই কারগিলের প্রধান বাসস্ট্যান্ড। আপাতত সেইদিকেই চলেছি। চলার পথে হরেকরকম দোকান, দোকানদার, খদ্দের আর পথচলা মানুষ চোখে পড়ছে। এক কার্পেট ব্যবসায়ী তাঁর দোকানের সেরা কয়েকটি গালিচা বাইরে ঝুলিয়ে রেখেছেন। দেখে চোখ ফেরানো দায়। এক জুতোর দোকানে দেখি এক বৃদ্ধ সুর করে বিরাট মোটা ধর্মপুস্তক পাঠ করে চলেছেন। আর পোষা বিড়ালটি চোখ বন্ধ করে স্থির হয়ে পাশে বসে আছে। কারগিল বাসস্ট্যান্ড অনেকটা জায়গাজুড়ে। পাহাড়ি অঞ্চলে দিন আরম্ভ হয় একটু ঢিমেতালে, তাই লোকজনের ভিড় তেমন নেই।

কয়েকটি মাত্র বাস, মিনিবাস দাঁড়িয়ে আছে। কর্মীরা চায়ের গ্লাস নিয়ে নিজেদের মধ্যে রঙ্গরসিকতা করছে। কারগিল থেকে বাটালিক আর পদম যাবার বাসের খোঁজখবর নিতে ঢুকলাম পরিবহণ অফিসে। প্রয়োজনীয় তথ্য জোগাড় করতে কিছুটা সময় লাগল। বাইরে এসে দেখি কারগিল বাসস্ট্যান্ড নতুন রূপ ধরেছে। কিছুক্ষণ আগেও যে বিস্তৃত ফাঁকা জায়গা চোখে পড়েছিল তার প্রায় সবটা জুড়ে বিশাল বাজার বসেছে। লোকজনের ভিড়ে পুরো এলাকাটা গম গম করছে। একরাশ কৌতূহল নিয়ে এগিয়ে গেলাম বাজার দেখতে।

কী নেই এই বাজারে। তরিতরকারি, ফল, মুদিখানা, জামাকাপড়, জুতো, সোয়েটার, কম্বল, গালিচা, হাকিমের তৈরি ওষুধ, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, গানের ক্যাসেট, চিত্রতারকাদের পোস্টার এবং আরও কত কী! বেশিরভাগ দোকান সাজানো হয়েছে ফোল্ডিং খাটের ওপর। আমি শুধু অবাক চোখে দেখেই গেলাম। কোনও এক মন্ত্রবলে পুরো লাদাখ যেন আমার সামনে উপস্থিত হয়েছে। স্থানীয় অধিবাসীরা ছাড়াও দূরদূরান্ত থেকে কারগিলে আসা লোকজন হাজির হয়েছে এই বাজারে। এরা চাইছে কারগিল থেকে বিদায় নেবার আগে শেষ মুহূর্তের কেনাকাটা সেরে নিতে। এককে জায়গার লোকের এককে রকম পোশাক, টুপি, আর দাড়ি। বেশিরভাগ মহিলা নিজেদের বোরখার আড়ালে ঢেকে রেখেছেন আর যাঁরা বোরখা ব্যবহার করেননি তাঁদের কপাল এবং মাথা ওড়না দিয়ে ঢাকা।

বাজারে ঘুরতে এক সময় দাঁড়িয়ে পড়লাম এক কম্বল-বিক্রেতার দোকানে। সুদর্শন বিক্রেতার যত্নলালিত এবং মেহেন্দিচর্চিত দাড়ি। আসগর আলি কারবালাই কারগিলের বহু পুরুষের বাসিন্দা। বয়স চল্লিশের বেশি হবে না। ব্যবসার সূত্রে মাঝে মধ্যেই অমৃতসর, লুধিয়ানায় যেতে হয়, তাই কথাবার্তায় বেশ সপ্রতিভ। কতরকমের ক্রেতা আর কতরকম তাদের দরদাম করার কায়দা। বেশ কয়েকবার আসগর আলির সাহায্য নিতে হল। সেই আমাকে চিনিয়ে দিল দ্রাস থেকে আসা দার্দ উপজাতীয় মানুষদের বা দারচিক থেকে আসা দ্রোকপাদের। দুহাজার বছর আগের রেশম পথের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল এই শহর। চিন দেশের রেশম এই পথ দিয়েই রোমে নিয়ে যাওয়া হত। চিনের সিংকিয়াং থেকে বেরিয়ে এই পথ কাশগড়, ইয়ারকন্দ, খোটান, কারাকোরাম গিরিপথ, নুব্রা উপত্যকা, লে, কারগিল, বামিয়ান, সমরখন্দ হয়ে চলে গিয়েছিল বোখারা। বোখারাতে পারস্যের বণিকরা রেশম ক্রয় করে সেই পণ্য নিয়ে রওনা দিতেন রোমের উদ্দেশে। আজ কল্পনা করাও কঠিন, কী বিপদসঙ্কুল ছিল সেই দীর্ঘ যাত্রাপথ। শুধু রেশম নয় এই পথ দিয়েই নিয়ে যাওয়া হত মশলা, কস্তুরী, দামি পাথর, কার্পেট আর পশুচর্ম।

হোটেলে ফেরার পথে ট্যাক্সিস্ট্যান্ড সংলগ্ন টেলিফোন বুথে ঢুকলাম ফোন করব বলে। বুথের মালিক সরফরাজ খান শিক্ষিত, আধুনিক যুবক। বিদেশি পর্যটক দেখে দেখে ক্লান্ত সরফরাজ খান আমাকে দেখে খুব খুশি। পরিচয়ের পালা শেষ হতেই সে অনুযোগ করল, বাঙালিরা এত বেড়াতে ভালোবাসে অথচ কারগিলে তাদের প্রায় দেখাই যায় না। কারগিল ভ্রমণ প্রসঙ্গে অনেক কথাই হল। আমি জানালাম এখানে হোটেলের ভাড়া এত বেশি হলে মধ্যবিত্ত বাঙালি আসবে কী করে? একজন লোক

থাকার জন্য পাঁচশো টাকা চাইছে। সরফরাজ চট করে আমার ইঙ্গিত ধরে ফেলে বলে উঠল, 'কারগিলে সিয়াচেন ছাড়া কি আর হোটেল নেই। ধারে কাছে বেশ কয়েকটি হোটেল আছে যেখানে স্বচ্ছন্দে ২৫০-৩৫০ টাকার মধ্যে দ্বিশয্যাঘর পাওয়া যাবে'। এমন খবর শোনার পর দেরি না করে সরফরাজের মাধ্যমে হোটেল গ্রিনল্যান্ডে ঘর জোগাড় করে ফেললাম। দ্বিশয্যার ঘরে একজন থাকার ভাড়া দুশো টাকা। সিয়াচেন থেকে হেঁটেই পৌঁছে গেলাম গ্রিনল্যান্ডে।

ট্যুরিস্ট অফিসে গিয়ে আলাপ করলাম জেলা পর্যটন আধিকারিকের সঙ্গে। ট্যুরিস্ট অফিসার এস টি আগা পরামর্শ দিলেন আমি ইচ্ছে করলে মিনিবাসে উঠে তিন কিলোমিটার দূরবর্তী বারু গ্রামে চলে যেতে পারি। বারু গ্রাম দেখে পায়ে হেঁটে ফিরতি পথে কারগিল সংলগ্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক শোভা বেশ ভালোভাবে উপভোগ করতে পারব। আমি এককথায় রাজি হয়ে গেলাম। হালকা চড়াই পথ ধরে অচিরেই পৌঁছে গেলাম বারু। সুদৃশ্য মসজিদ, আধুনিক শৈলীর বড় বড় বাড়ি, সুসজ্জিত দোকান, সরকারি দপ্তর আর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল দেখে মনে হবে যেন কারগিল শহরেই আছি।

বারু থেকে হেঁটে রওনা দিলাম কারগিলের দিকে। হালকা উতরাই পথ, তাই পথ চলার ক্লান্তি নেই। পথের দুধারে সেনাবাহিনীর বেশ কিছু দপ্তর আর সৈন্য শিবির চোখে পড়ল। কারগিলের সর্বোচ্চ সামরিক অফিসার ব্রিগেডিয়ার জে জি কোন্নুরকে নিয়ে ছোট একটি কনভয় আমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। দুপুরে রোদের তেজ ছিল কষ্টদায়ক, এখন সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়ায় আবহাওয়া হয়ে উঠল মনোরম। একা একা হেঁটে চলেছি, যখন খুশি দাঁড়িয়ে পড়ছি। ডানদিকে দূরে সুরু নদীর ধারে কারগিল শহর দেখা যাচ্ছে। শহরের পিছনেই পর্বত প্রাচীর উঠে গেছে। এই পর্বতশ্রেণীর অনতিদূরেই রয়েছে লাইন অব কন্ট্রোল।

কারগিল ফিরে এসে চা খেতে ঢুকলাম এক দোকানে। ইউ পি স্যুইট হাউস। দোকানের মালিককে সারা কারগিল শহর 'চাচা' নামে চেনে। দোকানে ঢুকেছিলাম শুধু চা খেতে, যখন উঠলাম ততক্ষণে দুঘণ্টা সময় কীভাবে কেটে গেছে টের পাইনি। তার মধ্যেই অবশ্য দোকানের সামোসা, বালুসাই আর মুগের লাড্ডুর স্বাদ নিতে ভুলিনি। চাচার মাধ্যমেই পরিচিত হলাম কত আকর্ষণীয় চরিত্রের সঙ্গে। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিটির নাম মহম্মদ সাওয়াদ। ইনি জাঁসকার অঞ্চলের একজন নামকরা গাইড। আলাপ হবার পর প্রথম সুযোগেই সাওয়াদ ক্ষোভ প্রকাশ করে জানালেন, বারো-তেরো বছর আগেও প্রচুর বিদেশি পর্যটক কারগিলকে কেন্দ্র করে জাঁসকারে ট্রেকিং করতে আসতেন। তারপর হঠাৎ সবকিছু কেমন যেন পাল্টে গেল। কাশ্মীর উপত্যকায় অশান্তি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনগর দিয়ে পর্যটকদের আসা কমতে আরম্ভ করল। পর্যটকরা বেছে নিলেন মানালি-লে রাজপথ। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ নিল লে শহরের বড় বড় ট্র্যাভেল এজেন্ট আর ওজনদার অ্যাডভেঞ্চার ট্যুর অপারেটররা। পেশাদার লোকের সাহায্য নিয়ে এরা ট্রেকিং, পর্বতারোহণ এবং রিভার র‍্যাফটিংকে চমৎকারভাবে বিপণন করে লে শহরকেই বিদেশি পর্যটকদের কাছে লাদাখ ভ্রমণের একমাত্র কেন্দ্র হিসাবে তুলে ধরলেন।

লাদাখ এবং জাঁসকার হিমালয়ের প্রায় সমস্ত পদযাত্রা লে শহর থেকেই সংগঠিত হতে আরম্ভ করল। কারগিল শহর তার গুরুত্ব হারাল।

চাচার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে চললাম সরফরাজের টেলিফোন বুথে। ঘড়িতে দেখি রাত আটটা বাজে। রাস্তায় লোক চলাচল বেশ কম। বেশিরভাগ দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। সরফরাজ আমাকে দেখেই প্রশ্ন করলেন, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? কিছু বলে যাননি, তাই চিন্তা হচ্ছিল'। সরফরাজের উৎকণ্ঠা দেখে মনে হবার জো নেই যে, আমাদের পরিচয় মাত্র একদিনের।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

শ্রীনগর থেকে লে যাওয়া-আসার পথেই কারগিল ভ্রমণ সম্ভব। সবচেয়ে ভালো হয় শ্রীনগর থেকে সকালের দিকে কারগিলগামী টাটা সুমো বা বাস ধরা। ২০৪ কিলোমিটার পথ যেতে সময় লাগবে আট ঘণ্টা। কারগিল এবং লাদাখ ভ্রমণ শেষে মানালি হয়ে ফেরাই সুবিধাজনক।

কোথায় থাকবেন

কারগিলে দামি হোটেলের পাশাপাশি মাঝারি মানের হোটেলেরও অভাব নেই। অপেক্ষাকৃত দামি হোটেলগুলি হল: ট্যাক্সিস্ট্যান্ডের কাছে **হোটেল সিয়াচেন** ☎ ২৩২৩২১, ২৩৩০৫৫। এছাড়া ব্রডওয়ে **সুরু ভিউ, হোটেল স্কোনস,** নিউ উইংয়ে **হোটেল ডি জোজিলা, হোটেল ক্যারাভান সরাই।**

মাঝারি মানের হোটেলের নাম: **হোটেল গ্রিনল্যান্ড** ☎ ২৩২৩২৪, ২৩৩৩৮৮।

ওল্ড উইংয়ে **হোটেল ডি জোজিলা,** নিউ উইংয়ে **হোটেল ট্যুরিস্ট মার্জিনা, হোটেল ইন্টারন্যাশনাল, হোটেল হাইল্যান্ড, হোটেল ইয়াকটেল।**

এছাড়া সুলভ মূল্যে থাকার জন্য ভালো জায়গা হল সরকারি ট্যুরিস্ট বাংলো। এখানে থাকার জন্য এবং কারগিল নিয়ে বিস্তারিত খোঁজখবরের জন্য যোগাযোগ করতে হবে নিচের ঠিকানায়:

District Tourist Officer
Tourist Reception Centre, Kargil
Jammu & Kashmir, Pin-194 103
☎ 232721, 232266

বিশদ তথ্যের জন্য যোগাযোগ:

জম্মু ও কাশ্মীর পর্যটন
১২, চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৩ ☎ ২২২৮-৫৭৯১

কখন যাবেন

লাদাখ বেড়াবার ভালো সময় জুনের মাঝামাঝি থেকে অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহ। মরসুমের শুরুতেই যাঁরা সড়কপথে লাদাখ যাবেন তাঁরা দেখতে পাবেন পথ সংলগ্ন তুষারাবৃত পাহাড়ের সৌন্দর্য আর যাঁরা আগস্ট-সেপ্টেম্বরে যাবেন তাঁরা দেখবেন আপেল গাছ ফলে পূর্ণ হয়ে আছে।

কারগিলের এস টি ডি কোড: ০১৯৮৫।

'ভ্রমণ' জুলাই ২০০৪

সুরু উপত্যকার মরূদ্যান পানিখার

শ্রীনগর থেকে শেয়ারের টাটা সুমোয় কারগিলের দিকে রওনা দিয়েছিলাম সকাল আটটায়। সোনামার্গ, জোজিলা পাস হয়ে দ্রাস পৌঁছে চায়ের বিরতি। চায়ের গ্লাস হাতে নিয়ে হিল ভিউ হোটেলের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল কারগিল যুদ্ধের সবচেয়ে বিখ্যাত 'ল্যান্ড মার্ক' টাইগার হিল। অপলক নেত্রে চেয়েছিলাম তার দিকে। ভেবে পাচ্ছিলাম না কীভাবে ভারতীয় সেনাবাহিনীর 'লাদাখ স্কাউটস'-এর রণকুশল সৈনিকরা ওই খাড়া পাহাড় বেয়ে দখলদার পাক সেনাদের হতচকিত করে দিয়েছিল। দ্রাস থেকে বিদায় নেওয়ার সময় মনে পড়ে গেল এই স্থানটিকেই বিশ্বের দ্বিতীয় শীতলতম জনপদ রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ভরা শীতে এখানকার তাপমাত্রা মাঝে মধ্যেই মাইনাস চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে যায়।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ কারগিল পৌঁছে সোজা চলে গেলাম প্রাইভেট বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন জম্মু-কাশ্মীর পর্যটন দপ্তরে, জেলা পর্যটন আধিকারিক আগা সাহেবের কাছে। পূর্ব-পরিচয়ের সূত্রে আগা সাহেবের তরফে আপ্যায়নের অভাব ঘটল না। ওঁর কাছেই জানা গেল ২০০৫ সালের কারগিল ফেস্টিভ্যাল আরম্ভ হবে সেপ্টেম্বর মাসের দশ তারিখ থেকে। আমার কাছে খবর ছিল উৎসব শুরু হবে চার তারিখে, অর্থাৎ উৎসবের ছয়দিন আগেই আমি কারগিলে এসে হাজির হয়েছি। আমার হতাশা দেখে আগা সাহেব অভয় দিলেন 'মন খারাপ করছেন কেন? এ তো একদিক দিয়ে ভালোই হল। এই কয়দিনে আপনার দিব্যি সুরু ভ্যালি আর জাঁসকার অঞ্চল ঘোরা হয়ে যাবে।' আমি মিনমিন করে উত্তর দিলাম, 'তবে তাই হোক।' মিঃ এস টি আগা কথা বলতে বলতেই দ্রুতহাতে আমার আগামী ভ্রমণসূচির একটা রূপরেখা তৈরি করে দিলেন। এর সঙ্গেই দুটো চিঠি লিখে দিলেন পানিখার সরকারি ট্যুরিস্ট বাংলোর দায়িত্বে থাকা কর্মীদের নামে। আমার ইচ্ছে ছিল কারগিলের ট্যুরিস্ট বাংলোতেই রাত্রিবাস করার, কিন্তু তা সম্ভব হল না কারণ কারগিল উৎসব উপলক্ষে জেলার প্রত্যন্ত এলাকাগুলি থেকে ইতিমধ্যেই সরকারি কর্মী এবং কলাকুশলীরা আসতে আরম্ভ করে দিয়েছেন, যাদের থাকার ব্যবস্থা হচ্ছে ট্যুরিস্ট বাংলো এবং অন্যান্য জায়গায়। অগত্যা গ্রিনল্যান্ড হোটেলে গিয়ে দুশো টাকা দিয়ে ঘর নিলাম।

সন্ধের পর হোটেল থেকে বেরিয়ে প্রথমেই গেলাম ইউ পি স্যুইট হাউস। আমার কৌতূহল ছিল দোকানের বৃদ্ধ মালিক খুরশিদ আলম দু-বছর পর আমাকে দেখে চিনতে পারেন কিনা। 'চিনতে পারলেন' বললে কম বলা হবে। খুরশিদ আলম,

কারগিলে যিনি 'চাচা' নামেই সমধিক পরিচিত, আনন্দের আতিশয্যে আমাকে বাহুবন্ধনে বাঁধলেন, জমে উঠল আড্ডা। কথায় কথায় চাচা জানালেন, সম্প্রতি কাছের এক রেস্তোরাঁতে পশ্চিমবঙ্গের এক যুবক এসে কাজে যোগ দিয়েছে। খবরটা শুনে মনে হল যাই, গিয়ে আলাপ করে আসি আর সেই সঙ্গে রাতের আহারও সেখানেই সেরে নেওয়া যাবে।

কারগিল শহরের খুমেইনি চকে কে কে মাঞ্চ রেস্তোরাঁ। ভেতরে গিয়ে খোঁজ করতেই সন্ধান পাওয়া গেল হাওড়া জেলার আমতা থানার এক প্রত্যন্ত গ্রামের যুবক ফরিদ আলির। সুদূর কারগিলে দুজন বাঙালির পরস্পরকে আবিষ্কার করার আনন্দপ্রসূত উচ্ছ্বাস দেখে রেস্তোরাঁয় উপস্থিত মানুষজন অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন আমাদের দিকে। ফরিদ আলির কারগিলে আসার ইতিহাস শুনে মনে হল এই নিয়ে এক সার্থক উপন্যাস রচিত হতে পারে। ফরিদের তদারকিতে বাঙালি রসনার উপযোগী একটি বিশেষ পদ তৈরি হল আমার জন্য।

৪ সেপ্টেম্বর, ২০০৫ বেলা এগারোটায় রাজ্য পরিবহণের বাসে রওনা দিলাম পানিখার গ্রামের উদ্দেশে। যে বাসে উঠেছি সেটি যাবে পারকাচিক পর্যন্ত, কারগিল থেকে দূরত্ব ৯০ কিলোমিটার। কারগিল থেকে পানিখারের দূরত্ব ৬৭ কিলোমিটার, বাসভাড়া ৪৫ টাকা।

বাস চলেছে ধীরগতিতে এবং চলার পথে একটু পরে পরেই যাত্রী এবং মালপত্র তুলছে বেশ ধীরেসুস্থে। আমার পাশে বসা মহম্মদ সাদিক রাজ্য সরকারের পশুপালন দপ্তরের কর্মী। এই পথে তাকে হামেশাই যাওয়া-আসা করতে হয়। বাসের গদাইলস্করী চাল দেখে আমার বিরক্তি তাঁর নজর এড়াল না। তিনি আমাকে অধৈর্য না হতে পরামর্শ দিয়ে জানালেন, বাসচালক এহসান আলি এক ব্যতিক্রমী চরিত্র, বাসের 'কচ্ছপ গতি' নিয়ে কেউ কিছু বললেই তার নির্লিপ্ত জবাব 'তাড়াহুড়ো করা লোক শয়তানের দ্বারা পরিচালিত।'

বাসের বেশিরভাগ যাত্রী নিম্নবিত্ত গ্রামীণ মানুষ। এদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সচ্ছল বলে যাদের মনে হচ্ছে তারা প্রায় সবাই ব্যবসায়ী। কারগিল থেকে কেনা বস্তা বস্তা রকমারি মালপত্র বাসের মাথায় চাপিয়ে তারা এখন নিজেদের মধ্যে রঙ্গরসিকতায় ব্যস্ত। বলা বাহুল্য, বাসের যাত্রীরা প্রায় সবাই ইসলাম ধর্মাবলম্বী, মাত্র কয়েকজনকে দেখে বৌদ্ধ বলে চেনা যায়। মুসলিম মহিলাদের কাউকে বোরখা পরতে দেখলাম না।

কারগিল থেকে রওনা দেওয়ার পর থেকেই সুরু নদীকে বাঁদিকে রেখে সড়কপথ এগিয়ে গেছে, সুরু উপত্যকার অন্দরমহলে। প্রায় ১৩৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সুরু ভ্যালির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি জনপদ হল ট্রেসপন, সালিসকোট, শাংকু, পানিখার, পারকাচিক আর রংদুম।

কারগিল থেকে রওনা দেওয়ার ঠিক এক ঘণ্টা পর বাস পৌঁছল ট্রেসপন। বাসের জানালা দিয়ে চোখে পড়ল পথসংলগ্ন মসজিদের প্রবেশপথে ইরানের প্রয়াত ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা খোমাইনির ছবি দেওয়া বেশ কয়েকটি পোস্টার। আয়াতোল্লার ছবি দেখে আমার মনে পড়ে গেল যে কারগিল জেলার বেশিরভাগ মুসলমানই শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। ট্রেসপন বিখ্যাত তার ইমামবাড়ার জন্য। এই যাত্রায় তা অদেখা রয়ে

গেল বলে একটু বিষণ্ণবোধ করলাম। ট্রেসপন ছাড়িয়ে কিছুদূর যাওয়ার পরেই পথের ডানদিকে বিশাল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা কারগিল যুদ্ধখ্যাত অষ্টম মাউন্টেন ডিভিশনের সেনাশিবির চোখে পড়ল।

ট্রেসপন থেকে ১৭ কিলোমিটার দূরবর্তী শাংকু এক অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত স্থান। পাহাড়ের ঢাল অবলম্বন করে গ্রাম এবং কৃষিজমি ধাপে ধাপে নেমে গেছে সুরু নদীর তীরে। পথের পাশে সবজির বাগান মুলো, শালগম, পালং জাতীয় শাক, মটরশুঁটি, বাঁধাকপি আর ফুলকপিতে সবুজ হয়ে আছে। শাংকুর ট্যুরিস্ট বাংলোটিকে সম্প্রতি সংস্কার করে নবরূপ দেওয়া হয়েছে। চলন্ত বাস থেকেই চোখে পড়ল এই সুন্দর পর্যটক নিবাসটি। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন তাঁদের কাছে শাংকু এক পরিচিত নাম। শাংকুর অনতিদূরে এক পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা আছে এক বিশাল বুদ্ধমূর্তি। এই বুদ্ধমূর্তির সঙ্গে মুলবেকের বিখ্যাত বুদ্ধমূর্তির মিল আছে।

শাংকু গ্রামের প্রধান বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে বাস সবে থেমেছে, একটু পরেই ঝিমিয়ে থাকা যাত্রীদের মধ্যে যেন প্রাণসঞ্চার হল। বিশেষ করে ব্যবসায়ী দলের সদস্যরা দেখলাম সবাই নড়েচড়ে বসেছেন। বাসে প্রবেশ করতে উদ্যত এক যাত্রীকে দেখে অনেকেই বলে উঠলেন, 'এখানে না, এখানে না, পিছনের দরজা দিয়ে ওঠো।' এই ধরনের আরও কিছু কথা লোকটির উদ্দেশে বলা হল যা শুনে অন্য যাত্রীদের হাসি আর থামতেই চায় না। যে লোকটিকে এত কথা বলা, তার মতো বলিষ্ঠ পুরুষ সচরাচর দেখা যায় না। শরীর বড়সড় হলে কী হবে, লোকটির চোখে মুখে কেমন যেন একটা চোর-চোর ভাব। লোকটি হাসার চেষ্টা করছে বটে, তবে এমন করুণ হাসি ইতিপূর্বে আর দেখেছি বলে মনে পড়ল না। আমার কৌতূহল মেটাল সহযাত্রী সাদিক। উনি সংক্ষেপে যা বললেন তাতে আমার কোনও সন্দেহ রইল না যে বাসে বমি করার যদি কোনও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় তবে প্রতিযোগিতার স্বর্ণপদকটি পানিখারনিবাসী এই রাজমিস্ত্রীর গলাতেই শোভা পাবে। শেষ পর্যন্ত লোকটি পিছনের দরজা দিয়ে উঠে কাঠগড়ার আসামির মতো দাঁড়িয়ে রইল। মুহূর্তের মধ্যেই তার ধারেকাছের লোকজন যতটা সম্ভব দূরে সরে গেল। বাস ছাড়ার কিছু পরেই মানুষটি বসে পড়ল এবং চলন্ত বাসেই তার নিত্যকর্মটি সারল।

শাংকু থেকে প্রায় এক ঘণ্টা বাসযাত্রার পর পুরতিকচে নামের জায়গায় পৌঁছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ অবারিত দৃষ্টিপথে ধরা দিল জাঁসকার পর্বতমালার দুই বিখ্যাত পর্বতশৃঙ্গ নুন (৭,১৩৫ মিটার) এবং কুন (৭,০৮৭ মিটার)। আগাগোড়া রজতশুভ্র তুষারে ঢাকা নুন গিরিশৃঙ্গের অপরূপ শোভা দেখে স্তব্ধ হয়ে রইলাম। এই সময় আমার তরফে একটা বড় ভুল হয়ে গেল। আমি ভাবলাম পানিখার থেকে নুন এবং কুন শিখরদ্বয়কে আরও কাছ থেকে দেখা যাবে, তখন ছবি তুললেই হবে। এরপর যা ঘটল তা কল্পনাতেও স্থান দিইনি। পুরতিকচে থেকে যতই পানিখারের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম নুন এবং কুন পর্বতও দৃষ্টির অন্তরালে চলে যেতে থাকল। এরপর তাদের আর দেখাই পাইনি। পদম থেকে কারগিল ফেরার দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় নুন-কুনের অপার্থিব সৌন্দর্য আর ক্যামেরাবন্দী করা হয়ে ওঠেনি।

পানিখার পৌঁছলাম বিকেল চারটে নাগাদ। ভাবলে অবাক হতে হয়, মাত্র ৬৭ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে সময় লাগল পাক্কা পাঁচ ঘণ্টা। পানিখার বাসস্ট্যান্ডের অদূরেই ট্যুরিস্ট বাংলো। দূর থেকে প্রথম দর্শনেই পর্যটক নিবাসটিকে আমার বেশ মনে ধরল। 'বাংলো' বলতেই যে ছবিটি মনে ভেসে ওঠে ঠিক তেমনই টিনের ছাদওয়ালা একতলা বাড়ি। সামনে সুন্দর বাগান আর নানারকম গাছপালা। গেট খুলে ভেতরে ঢুকে দেখি কেউ নেই। চৌকিদারের উদ্দেশে কয়েকবার হাঁক পাড়তেই পাশের গৃহস্থ বাড়ি থেকে এক যুবক বেরিয়ে এলেন। স্কুলশিক্ষক গুলাম হায়দারের সঙ্গে পরিচয় হতেই উনি জানালেন, বাংলোর কুক এবং চৌকিদার ধারেকাছেই কোথাও আছে, ওরা না আসা পর্যন্ত আমি স্বচ্ছন্দে তার বাড়িতে গিয়ে বসতে পারি। নতুন জায়গায় পা দেওয়ামাত্র স্থানীয় এক অধিবাসীর অতিথিপরায়ণতার পরিচয় পেয়ে অভিভূত বোধ করলাম।

হায়দার সাহেবের বাড়ি যাওয়ার অবশ্য প্রয়োজন হল না। আমাদের আলাপচারিতার মধ্যেই প্রবীণ এক ব্যক্তি এসে সেলাম জানালেন। বাংলোর রাঁধুনি মহম্মদ ইব্রাহিমকে অনুসরণ করে ট্যুরিস্ট বাংলোর অন্দরমহলে প্রবেশ করলাম। ইব্রাহিমের হাতে আগা সাহেবের চিঠি ধরিয়ে দিয়ে আমি ঠাট্টাচ্ছলে জানতে চাইলাম, বাংলোর চৌকিদার কি ঘরে বসেই সরকারি ডিউটি দিচ্ছে নাকি? আমার এই নিরীহ ঠাট্টা যে ইব্রাহিমকে এমন সমস্যায় ফেলে দেবে ভাবতেই পারিনি। উত্তর দেবে কী, মাথা আর ঘাড় চুলকেই সে কূল পাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত জানাল, একটু পরেই চৌকিদার এসে হাজির হবে। আমার সামনেই ইব্রাহিম স্থানীয় এক কিশোরকে ডেকে বালতি ভাষায় কিছু নির্দেশ দিল। এর পরেই ছেলেটি তার সাইকেলে চেপে দ্রুত উধাও হল। ততক্ষণে আমি পরিস্থিতিটা মোটামুটি বুঝে নিয়েছি। আসলে পানিখার বাংলো বেশিরভাগ সময় খালি পড়ে থাকে, তাই বাংলোর রাঁধুনি এবং চৌকিদার নিজেদের মধ্যে সুন্দর এক বন্দোবস্ত করে ফেলেছে। খালি বাংলোয় দুজনের একসঙ্গে থাকার দরকার কী? ট্যুরিস্ট আসার খবর পেলে তখন হাজির হলেই চলবে। আসলে আগা সাহেবের চিঠিটাই ইব্রাহিমকে বেশ একটু চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। সে ইংরেজি পড়তে জানে না কিন্তু এটা ভালোই জানে যে জেলা পর্যটন কর্তার বিশেষ চিঠি নিয়ে যে পর্যটক পানিখারে এসে উপস্থিত হয়েছেন তিনি নিশ্চয়ই কোনও কেউকেটা হবেন। সেই মানুষটিকে বাংলোর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল, এই খবর আগা সাহেবের কানে গেলে উনি নিশ্চয়ই খুশি হবেন না।

পানিখার বাংলোয় আছে চারটি দ্বিশয্যাবিশিষ্ট ঘর। সবকটি ঘরই খালি পড়ে আছে। ইব্রাহিম আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল কোন ঘরটি আমার পছন্দ। আমি উত্তর দিলাম, 'যে ঘরের বাথরুমে বেসিনের কল আর টয়লেটের ফ্লাশ ঠিকঠাক কাজ করছে সেই ঘরেই আমি থাকব।' সে আমতা আমতা করে জানাল, প্রতিটি ঘরের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে চৌকিদার হাবিব ভালো বলতে পারবে। ঘরের দখল না নিয়ে আমি চেয়ার নিয়ে বসলাম বাংলোর বাগানে।

কলকাতা থেকে রওনা দেওয়ার পাঁচদিন পরে আজ পানিখার এসে উপস্থিত হয়েছি। এ এক দীর্ঘ, ক্লান্তিকর যাত্রা কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এই পড়ন্ত বিকেলে,

ফুলবাগানের মাঝে, চায়ের কাপ হাতে নিয়ে যখন সামনে তাকালাম এক মুহূর্তে সব ক্লান্তি উধাও হয়ে গেল। তৃণগুল্মহীন রুক্ষ এক পর্বতপ্রাচীরের আড়ালে তুষারাবৃত নুনশিখরের অল্প একটু অংশ দেখা যাচ্ছে। অস্তগামী প্রভাকরের শেষ কিরণ রাঙিয়ে দিয়েছে নুন পর্বতের চূড়া। মোহাবিষ্ট হয়ে শুধু সেই দিকেই চেয়ে রইলাম।

ধ্যানভঙ্গ হল লোহার গেট খোলার শব্দে। চেয়ে দেখি লম্বাচওড়া চেহারার একজন মাঝবয়সী লোক আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। দূর থেকে দেখে মনে হল লোকটা যেন এইমাত্র শুকনো বালিতে গড়াগড়ি দিয়ে এসেছে। কাছে এসে আগন্তুক সেলাম জানিয়ে নিজের পরিচয় দিল। আমি কথা বলব কী, হাঁ করে শুধু চৌকিদার হাবিবকে দেখছিলাম। বালির মতো দেখতে অথচ বালি নয় এমন এক মিহি গুঁড়োয় আপাদমস্তক মাখামাখি হয়ে আমার কাছে আসার কারণটি জানতে আমি উদগ্রীব ছিলাম। অচিরেই আমার কৌতূহলের অবসান ঘটল হাবিবের কথায়। সে আজ সকাল থেকেই ব্যস্ত ছিল নিজের গ্রামের বাড়িতে শস্য ঝাড়াইয়ের কাজে। যন্ত্রের সাহায্যে ইদানিং এই কাজটি হচ্ছে বলে প্রচুর তুষের গুঁড়ো আর ধুলো ওড়ে। এরই ফল হাবিবের এই অপরূপ রূপ। হাবিব জানাল, আমার আসার খবর পাওয়ামাত্র সে এখানে এসে হাজির হয়েছে। হাবিবের সঙ্গে আমার পাকা কথা হয়ে গেল যে আগামীকাল সকালেই সে আমাকে তার গ্রাম দেখাতে নিয়ে যাবে।

হাবিবের পরামর্শে ডাইনিং রুমসংলগ্ন ঘরটিতেই আমার থাকার ব্যবস্থা হল। একটু বিশ্রাম এবং আরেক প্রস্থ চায়ের পর হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেলাম বাসস্ট্যান্ড এলাকায়। ইতিমধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। বেশি হাঁটাহাঁটি না করে ঢুকে পড়লাম খাইয়ুল হোটেলের ভেতরে। এখানে এক ছাদের নীচেই মুদিখানা এবং রেস্তোরাঁ। প্রতিষ্ঠানের তরুণ মালিক আমাকে দেখেই একগাল হেসে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি আজ বিকেলের বাসেই এলেন না?'

খাইয়ুল হোটেলের গুলাম আলির সঙ্গে মাত্র আধঘণ্টার মধ্যে দারুণ 'দোস্তি' হয়ে গেল। রাতেরবেলায় খদ্দের কম, তাই টেবিলে বসে আমার সঙ্গে আড্ডা দিতে গুলামের কোনও সমস্যা হচ্ছিল না। মাঝেমধ্যে তার কাউন্টারে যাওয়ার প্রয়োজন হলে সেই ফাঁকে আমি সারাদিনের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে নিচ্ছিলাম। দোকানের কম আলোয় লেখালিখি করতে অবশ্য একটু সমস্যাই হচ্ছিল। গুলাম আলির কাছে জানা গেল এই আলো জ্বলছে সরকারি জেনারেটারের সৌজন্যে। জেনারেটারের বিদ্যুৎ নিতে হলে পানিখারবাসীদের চারটি পয়েন্টের জন্য বার্ষিক ৬০০ টাকা করে দিতে হয়। সন্ধের পর থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত আর নমাজ পড়ার সুবিধের জন্য ভোর চারটে থেকে এক ঘণ্টা জেনারেটার চলে। বিদায় দেওয়ার সময় গুলাম আলি জানিয়ে দিল, কাল দিনের বেলায় এলে এই দোকানে বসেই সুরু উপত্যকার বিভিন্ন এলাকার হরেকরকম মানুষ আমি দেখতে পাব।

ট্যুরিস্ট বাংলোয় ফিরে ইব্রাহিমকে পাওয়া গেল তার রান্নাঘরে। গুনগুন করে গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে একমনে বাঁধাকপি কেটে চলেছে ছুরি দিয়ে। আমার হঠাৎ আগমনে সে বাস্তবে ফিরে এসে জানাল, 'আপনি ঘরে গিয়ে বসুন, আমি চা নিয়ে যাচ্ছি।' এই মুহূর্তে ট্যুরিস্ট বাংলোর সেরা জায়গাটি হল ইব্রাহিমের এই

রন্ধনশালা। অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পরেই পাহাড়ি শীত এসে বাংলোর দখল নিয়েছে কিন্তু শীতের সাধ্য নেই ইব্রাহিমের রান্নাঘরে ঢোকার। আমার আগ্রহ দেখে ইব্রাহিম খুশি মনে একটা চেয়ার নিয়ে এসে উনুনের কাছে আমার বসার ব্যবস্থা করল। কয়েকবার চা-পানের ফাঁকে দু-ঘণ্টা সময় কীভাবে কেটে গেল বোঝাই গেল না। কারগিল জেলার প্রত্যন্ত এক গ্রামের অধিবাসী ইব্রাহিমের অভিজ্ঞতার ঝুলি যে এত সমৃদ্ধ কে জানত! সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল তার পুরনো দিনের স্মৃতিচারণ যখন কাশ্মীরের পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তখন দলে দলে বিদেশিরা পানিখারে এসে উপস্থিত হতেন বিভিন্ন পদযাত্রায় অংশ নিতে। পানিখার থেকে ভোটকল গিরিপথ (৪,৪২০ মিটার) পেরিয়ে পহেলগাঁও যাওয়ার ট্রেক রুটটি ছিল বিদেশি পর্যটকদের কাছে সবচেয়ে প্রিয়। বিদেশিরা, বিশেষ করে ফরাসি পর্যটকরা, এখনও আসেন বটে তবে তাদের সংখ্যা এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়।

ভোরবেলায় ঘুম ভাঙল অদূরবর্তী মসজিদের আজান শুনে। চাদর মুড়ি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখি বাগানে পাখিদের মেলা বসেছে। চেনা-অচেনা পাখিদের মধ্যে সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষক পাখিটিকে কিছুটা ফিঙের মতো দেখতে, গায়ের রং ঘন নীল, দুটি ডানায় লম্বা সাদা দাগ। বাগানে ফুলগাছের অভাব নেই কিন্তু এদের আয়ু আর মাত্র ২০-২৫ দিন। ইতিমধ্যেই গাছের গোড়া পচতে আরম্ভ করেছে। ফুলগাছের মৃতদেহ কয়েকমাস ধরে বরফের তলায় চাপা পড়ে থাকবে। এপ্রিল-মে মাসে আবার নতুন গাছ মাথা তুলে দাঁড়াবে আর জুন মাসে পুরো শাংকু-পানিখার এলাকাটাই ফুলে ফুলে ভরে যাবে।

ইব্রাহিমের তৈরি 'আলু-পরাঠা' দিয়ে প্রাতরাশ সম্পন্ন করে সকাল আটটা নাগাদ চৌকিদার হাবিবের সঙ্গে পায়ে হেঁটে রওনা দিলাম তার গ্রামের দিকে। গ্রামের নাম তাইসুরু, পানিখার বাংলো থেকে দূরত্ব প্রায় দু-কিলোমিটার। চলার পথে পানিখার জায়গাটিকে ভালো করে দেখার সুযোগ পেলাম। পানিখারে সুরু উপত্যকা বেশ প্রশস্ত। পানিখার এবং অন্যান্য গ্রামগুলির অবস্থান নদীর ডান তীরে। সুরু নদী সংলগ্ন পুরো এলাকাটাই কৃষিজমি। এছাড়া পাহাড়ি ঝরনার জলকে নালার মাধ্যমে গ্রামে নিয়ে এসে সেচব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। জমির ফসল কাটার কাজ শেষ হওয়ার পর এখন শস্য ঝাড়াইয়ের কাজ চলছে পূর্ণোদ্যমে। এবছর ফসল আশাতিরিক্ত ভালো হয়েছে তাই সবার মুখেই হাসি। পানিখারের প্রধান ফসল হল যব বা বার্লি আর মটরশুটি। এছাড়া তরিতরকারির চাষও মোটামুটি ভালোই। আমি আর হাবিব এখন কারগিলগামী বাসপথ ধরেই হেঁটে চলেছি। পথের দুধারেই ঘরবাড়ি। একটু পরেই পানিখার গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে পৌঁছে গেলাম খরস্রোতা চেলুং নদীর কাছে। লোহার ব্রিজ পেরিয়ে ওপারে যেতেই চোখে পড়ল নদীর ধার দিয়ে একটি হাঁটাপথ চলে গেছে নদীর উজানে। হাবিব জানাল, এই পথ দিয়ে হেঁটে গেলেই পৌঁছে যাওয়া যাবে পহেলগাঁও। এই চেলুং নদী গিয়ে মিলিত হয়েছে সুরু নদীর সঙ্গে। ব্রিজ ছাড়িয়ে কিছুদূর যেতেই পুলিশ চেকপোস্ট। কারগিল থেকে আসার সময় স্থানীয় মানুষ ছাড়া সবাইকেই এখানে পরিচয়পত্র দেখাতে হয়। গতকাল আমাকেও দেখাতে হয়েছিল। চেকপোস্টের দায়িত্বে থাকা পুলিশ কর্মী আমাকে

চিনতে পেরে তাঁর তাঁবুর ভেতর নিয়ে গিয়ে বসালেন। খাস কারগিল শহরের শিক্ষিত ছেলে সোহেল আলি খান এই জনবিরল গ্রামীণ পরিবেশে বেশ হাঁপিয়ে উঠেছেন। আমাকে পেয়ে আর ছাড়তেই চাইছিলেন না। চেকপোস্টের পরেই বাসপথ থেকে কাঁচা রাস্তা ডানদিকে চলে গেছে হাবিবের গ্রামে।

তাইসুরু গ্রামে প্রবেশ করার মুখেই চোখে পড়ল এক সুন্দর দৃশ্য। সাতটি গরুকে এক সারিতে বেঁধে শস্য মাড়াইয়ের কাজ চালাচ্ছে দুটি কমবয়সী ছেলে। গরুগুলো দম দেওয়া পুতুলের মতো মসৃণভাবে তাদের কাজ করে যাচ্ছিল কিন্তু আমি ছবি তোলার জন্য কাছে যেতেই তারা দড়িদাড়া ছিঁড়ে ছত্রভঙ্গ হওয়ার উপক্রম করল। মটরশুটি মাড়াইয়ের কাজ প্রায় লাটে উঠল। আমি তো লজ্জায় বাঁচি না।

আজ আর হাবিবের বাড়ি যাওয়ার প্রশ্ন নেই কারণ বাড়িতে কেউ নেই। পরিবারের সব সদস্যই এখন মাঠে, শস্য ঝাড়াইয়ের কাজে হাত লাগাতে। নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে দেখি ঠিক সময়ে যাতে কাজ আরম্ভ হয় তার জন্য জোর কদমে প্রস্তুতি চলছে। একটু পরেই ট্রাক্টরে চেপে শস্য ঝাড়াইয়ের যন্ত্রচালিত মেশিন চলে আসবে। এর জন্য ভাড়া গুনতে হবে ঘণ্টাপ্রতি তিনশো টাকা। হাবিবের পরিবারের সদস্যসংখ্যা দেখে আমি তো অবাক। এত বড় পরিবার! পরিবার নিয়ে আমার প্রশ্ন শুনে হাবিবের হাসি আর থামতে চায় না। তারপর ধাতস্থ হয়ে জানাল, তার পরিবারের লোক মাত্র চারজন, বাকিরা সব প্রতিবেশী। এখানে এমনটিই আবহমান কাল ধরে চলে আসছে। ফসল কাটা বা শস্য ঝাড়াইয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজের সময় সবাই মিলে একজোট হয়ে আরেকজনের কার্যোদ্ধার করে দেয়। কাজ আরম্ভ হতে এখনও কিছু দেরি আছে দেখে আমি হাঁটতে হাঁটতে সুরু নদীর কাছে চলে গেলাম। নদী অগভীর হলেও বেশ চওড়া এবং খরস্রোতা। পেঞ্জিলা গিরিপথসংলগ্ন হিমবাহ থেকে উৎপন্ন এই সুরু নদী উত্তরবাহিনী হয়ে কারগিলের কাছে ওয়াখা নদীর জলধারায় পুষ্ট হয়ে আরও কিছুদূর গিয়ে দ্রাস নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এদের মিলিত ধারা শেষ পর্যন্ত সিন্ধুনদের বুকে ঝাঁপ দিয়েছে।

সুরু নদী দেখে ফেরার পথে গ্রামের মসজিদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তাইসুরু গ্রামটি আয়তনে ছোট হলেও স্থানীয় মসজিদটি শুধু বড়ই নয় দেখতেও ভারি সুন্দর। বিশেষ করে মসজিদের বহিরঙ্গে সবুজ রঙের ব্যবহার চোখের পক্ষে ভারি তৃপ্তিদায়ক। মসজিদের নির্মাণশৈলীতে পারস্যের প্রভাব বেশ স্পষ্ট। মসজিদ দেখে আবার ফিরে গেলাম হাবিবের কাছে। গিয়ে দেখি শস্য ঝাড়াইয়ের কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। সত্যি, এ এক দেখার মতো দৃশ্য। এই কর্মযজ্ঞে প্রত্যেকের কাজ ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। প্রবল শব্দ করে, প্রচুর ধুলো-বালি-তুষ উড়িয়ে যন্ত্রদানব কাজ করে চলেছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শস্যের দানা খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে গ্রামের যত চড়াই পাখি।

হাবিব জানাল, এখানে থাকার চেয়ে আমার পক্ষে বরং অদূরবর্তী তার এক আত্মীয়ের বাড়ি গিয়ে বসাই ভালো। হাবিবের ছোট ছেলে মুরাদ আমাকে নিয়ে গেল তার পিসির বাড়িতে। বাড়ি দেখে আমি অবাক। এই গণ্ডগ্রামে এমন সুন্দর আধুনিক ডিজাইনের বাড়ি দেখতে পাব, আশাই করিনি। আমাকে বাড়ির দরজায় দাঁড় করিয়ে মুরাদ একছুটে বাড়ির ভেতর উধাও হল। একটু পরেই বাড়ির প্রবীণ কর্তা বাইরে

এসে আমাকে সমাদর সহকারে বাড়ির বসার ঘরে নিয়ে গেলেন। গৃহকর্তা ইউসুফ রমজানদার সম্পর্কে হাবিবের জামাইবাবু। সদ্য অবসরপ্রাপ্ত ইউসুফ সাহেব ছিলেন রাজ্য পরিবহণ দপ্তরের একজন নামকরা বাসচালক। তাঁর ছোট ছেলেও পেশায় ট্রাকচালক, এখন সৌদি আরবে আছে।

আলাপচারিতার শুরুতেই রমজানদার জানালেন, এই কর্মহীন অবসরজীবন তাঁর মোটেই ভালো লাগছে না। তাঁর চাকুরীজীবনের প্রতিটি দিন ছিল বৈচিত্র্যে ভরা। স্মৃতিকাতর ইউসুফ সাহেব আমার মধ্যে একজন মনোযোগী শ্রোতাকে আবিষ্কার করে নিজের কর্মজীবন সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য কোনও রাখঢাক না রেখে বেশ রসিয়ে রসিয়ে পরিবেশন করে গেলেন আর আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো তা শুনে গেলাম। কারগিল জেলায় সরকারি বাসের একজন সিনিয়র ড্রাইভারের দাপট, সামাজিক প্রতিষ্ঠা আর 'অতিরিক্ত উপার্জন' সম্পর্কে আমার কোনও ধারণাই ছিল না। ইউসুফ রমজানদার দীর্ঘদিন কারগিল-শ্রীনগর রুটে বাস চালিয়েছেন। শীতের শুরুতে আর গ্রীষ্মের প্রারম্ভে বিপজ্জনক জোজিলা গিরিপথ দিয়ে তাঁর বাসচালনার অভিজ্ঞতা শুনছিলাম একরাশ কৌতূহল নিয়ে।

বিশেষ করে কারগিল যুদ্ধের সময় নিজের এবং যাত্রীদের প্রাণ 'স্টিয়ারিংয়ে নিয়ে' অতি বিপদসঙ্কুল থাসগাম, ভিমবাদ আর দ্রাস এলাকা দিয়ে তাঁর বাস চালানোর রোমাঞ্চকর বৃত্তান্ত শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল আমি যেন সেই বাসের এক যাত্রী। জমজমাট আড্ডার মধ্যেই অন্দরমহল থেকে আমাদের জন্য বিস্কুট আর চা নিয়ে হাজির হল শ্রীমান মুরাদ। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে একদম অন্যরকম স্বাদ পেলাম। জানা গেল, এই চা তৈরি হয়েছে ছাগলের দুধে নামমাত্র জল মিশিয়ে।

ইউসুফ সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে চললাম পানিখার। মুরাদ কিন্তু আমার সঙ্গ ছাড়ছে না। প্রথমে ভাবলাম ওর বোধহয় এই পরদেশির প্রতি টান জন্মেছে পরে দেখা গেল টান অবশ্যই জন্মেছে তবে সেটা আমার প্রতি নয়, আমার বাইনোকুলারের প্রতি। গ্রামের এক বালক জীবনে প্রথমবার দূরবীন চোখে দিয়ে চারপাশের পৃথিবীকে দেখছে, এই দৃশ্যটি যে এত চিত্তস্পর্শী হতে পারে আমার জানা ছিল না। কার্যসিদ্ধি হতেই মুরাদ ফিরে গেল তার পরিবারের কাছে।

তাইসুরু গ্রাম থেকে বাসরাস্তার দিকে যাওয়ার পথে বেশ কিছু ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে ইউনিফর্ম পরে স্কুলে যেতে দেখলাম। ছেলেদের পিঠে বইখাতার বোঝা, গলায় টাই কিন্তু মুখে হাসি নেই।

বাসরাস্তায় প্রায় পৌঁছে গেছি, এমন সময় গ্রামের দুটি বালিকাকে আমার পথরোধ করে দাঁড়াতে দেখে প্রমাদ গুনলাম। ভিক্ষে চাইবে না তো? তাহলেই সকাল থেকে একের পর এক মধুর অভিজ্ঞতায় জারিত আমার মন তেতো হয়ে যাবে।

ভিক্ষে চাওয়া তো দূরের কথা, মলিন বসন, রুক্ষ কেশ এই দুই কন্যার কাছে আমিই বরং ঋণী হয়ে রইলাম। মেয়েদুটির দাবি অতি নগণ্য। পথের ধারে খর্বাকৃতি যে বুনোগাছটি দেখা যাচ্ছে তার কয়েকটি ডাল আমায় ভেঙে দিতে হবে। কৌতূহলবশত জানতে চাইলাম নিরপরাধ বৃক্ষের অঙ্গচ্ছেদন কি একান্তই প্রয়োজন! বড় মেয়েটি জানাল, গাছে যে ছোট ছোট গোলাকৃতি কমলা রঙের ফল ধরে আছে,

এই ফল ব্যবহৃত হবে মেহেন্দি তৈরির কাজে। 'এ আর এমন কী কাজ' এই মনোভাব নিয়ে আমি গাছটির কাছে গিয়ে আবিষ্কার করলাম তার ডালপালা বড় বড় কাঁটায় ভর্তি। দুয়েকটি ডাল দেখলাম আধাভাঙা অবস্থায় রয়েছে। কাঁটা বাঁচিয়ে প্রথমে সেই ডালগুলি ভাঙতেই উদ্যোগী হলাম অবহেলাভরে একটি ডাল ধরে দুয়েকটা টান দিয়েই বুঝে গেলাম কী কঠিন পরীক্ষার সামনে আজ আমি দাঁড়িয়ে আছি। রোগা-পাতলা চেহারার এই গাছের সরু ডাল যে এত শক্ত হতে পারে ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ বিশ্বাস করবে না। কাঁটার ছোবল বাঁচিয়ে আরেকবার চেষ্টা করলাম, কোনও লাভ হল না। এমন জটিল পরিস্থিতিতেও আমার মনে পড়ল কোথায় যেন পড়েছিলাম শীতকালে প্রচুর তুষারপাত হয় এমন সব এলাকার গাছপালা এবং ঝোপঝাড়ের শাখাপ্রশাখা এতই মজবুত হয় যে পুরু বরফের ওজন তারা সহ্য করে অক্ষত শরীরে। তা না হয় হল, কিন্তু এ যাত্রায় আমার সম্মান রক্ষা করার কোনও উপায় তো দেখছি না। দুই গ্রামবালিকা সমস্ত মনোযোগ দিয়ে আমার কাণ্ডকারখানা দেখছে, এই অবস্থায় হার মেনে পিছিয়ে গেলে চলবে না। এই দুঃসময়ে আমার বোধোদয় ঘটল। আমার কাঁধে ঝোলানো ব্যাগেই তো ছোট ছুরি আছে। শেষ পর্যন্ত ছোট্ট ফল-কাটা ছুরিটাই মান বাঁচাল।

পানিখার বাংলোয় ফিরে স্নান, মধ্যাহ্নভোজন সেরে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর খাইয়ুল হোটেলে গিয়ে হাজির হলাম। হোটেলের সামনেই দাঁড় করানো আছে পদম থেকে কারগিলগামী সরকারি বাস। এই বাসটি পদম থেকে ছেড়েছিল রাত সাড়ে তিনটের সময়। যাত্রীরা এখানে মধ্যাহ্নভোজন সারতে ব্যস্ত। বেশিরভাগ যাত্রীই দেখলাম ম্যাগি নুডলস খেতে ব্যস্ত। এই খাবারটি ইদানিং লাদাখের কিছু কিছু এলাকায় দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। দামও এমন কিছু বেশি নয়, পনেরো টাকা করে প্লেট। বাসযাত্রীদের মধ্যে বিদেশির সংখ্যা ছয়। এছাড়া রয়েছে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জাঁসকার উপত্যকার লাদাখি, আপার সুরু ভ্যালির ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ এবং জনাকয়েক নেপালি শ্রমিক। নেপালিদের মধ্যে একজনের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেল এরা সবাই পেশায় রাজমিস্ত্রী। গত কয়েক বছর ধরেই এরা সুদূর নেপাল থেকে তিন-চার মাসের জন্য পদমে এসে উপস্থিত হয়। অমানুষিক পরিশ্রম করে প্রতিমাসে এরা প্রায় নয়-দশ হাজার টাকা রোজগার করে। নেপালি রাজমিস্ত্রীদের এই দলটি এখন কারগিল যাচ্ছে বিশেষ একটি কাজের বরাত পেয়ে।

কারগিলগামী বাসের সবচেয়ে আকর্ষণীয় যাত্রীটির দর্শন পাওয়া গেল বাস ছাড়ার পূর্ব মুহূর্তে। বাস থেকে নেমে হোটেলে না ঢুকে উনি অন্য কোথাও ছিলেন। প্রায় সাড়ে ছয় ফুট লম্বা, রোদে পোড়া, মেদহীন, শ্যামবর্ণ চেহারা, মেহেন্দি চর্চিত দাড়ি আর মাথায় পাগড়ি শোভিত এই পুরুষসিংহটি হলেন পশুপালক বকরওয়াল সমাজের একজন মাতব্বর। বড় বড় ছাগল ভেড়ার পাল নিয়ে বকরওয়ালরা গ্রীষ্মকালে পাহাড়ের দূরদূরান্তে পাড়ি জমায়। এদের মতো ভালো করে হিমালয়কে আর কেউ চেনে না।

কারগিলের বাস চলে যেতেই পানিখারের বাসস্ট্যান্ড এলাকা আবার তার শান্তশ্রী ফিরে পেল। খাইয়ুল হোটেলের কোণের টেবিলে গিয়ে বসলাম। হোটেল মালিক

গুলাম আলির মাধ্যমে বেশ কয়েকজনের সঙ্গে পরিচিত হলাম যাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দুটি নাম সি বি আই অফিসার মিঃ দাহিয়া আর পানিখার এলাকার সরপঞ্চ মমতাজ হোসেন। দিল্লির বাসিন্দা অশোক দাহিয়া অল্পদিন হল পুলিশের চাকরিতে যোগ দিয়েছেন। পেশার প্রয়োজনে ট্রেসপন থেকে পদম পর্যন্ত এলাকার যাবতীয় খবরাখবর তাঁকে রাখতে হয়। আলাপচারিতার মধ্যেই তাঁর কাছ থেকে এমন অনেক কিছু জানার সুযোগ পেলাম যা একজন বহিরাগত পর্যটকের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। অশোক দাহিয়া আমাকে জানালেন, একটি পায়েচলা পথ উঠে গেছে কাছের ওই ছোট্ট পাহাড়টির মাথায়। সেখান থেকে পানিখার এলাকাটিকে খুব ভালোভাবে দেখা যায়। কথাটা আমার মনে ধরল। আলস্য ত্যাগ করে রওনা দিলাম পাহাড়ের দিকে। বাসরাস্তা থেকেই একটি কাঁচা রাস্তা উঠে গেছে পাহাড়ের কোলে। পুরো পথটাই চড়াই পথ। অর্ধেক পথ উঠেই ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লাম বড় এক প্রস্তরখণ্ডের ওপর। এবার তাকালাম ফেলে আসা পথ আর পানিখার গ্রামের দিকে। সত্যি, অপূর্ব। ওই তো দেখা যাচ্ছে ট্যুরিস্ট বাংলো, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিশাল ভবন, তাইসুরু গ্রামের মসজিদ আর পানিখার সরকারি বিদ্যালয়। বেশ লাগছিল বসে বসে পানিখারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে উপভোগ করতে। সুরু নদীর প্রবাহপথটিকেও বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। নদীর ওপারেই পাষাণসর্বস্ব রুক্ষ পর্বতপ্রাচীর। প্রাচীরের ওপরেই ঘন নীল আকাশ। মনে মনে কল্পনা করলাম, জুন মাসে এলে পানিখারের কী রূপ দেখতাম। পানিখারের সেই অপার্থিব রূপ চাক্ষুষ করতেই ওই সময় একবার এখানে আসতেই হবে।

পাহাড় থেকে নেমে আবার ফিরে গেলাম গুলাম আলির হোটেলে। সেখানে বেশিক্ষণ বসা আমার অদৃষ্টে ছিল না। একটু পরেই কারগিল থেকে পারকাচিক যাওয়ার বাস এসে দাঁড়াল হোটেলের সামনে। অন্যান্য যাত্রীর সঙ্গে বাস থেকে নামলেন এক বিদেশি দম্পতি। নেমেই খোঁজ করলেন ট্যুরিস্ট বাংলোয় কীভাবে যাবেন। আমি বললাম, 'চলুন আমার সঙ্গে, আমিও সেখানেই উঠেছি।' যাওয়ার পথেই কথাবার্তা চলতে থাকল। ফ্রান্সের প্যারিস শহরের বাসিন্দা সাইমন আলেকজান্ডার এবং তাঁর স্ত্রী এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ভারত ভ্রমণে এসেছেন। লাদাখে এই প্রথম। দু-জনের বয়সই পঞ্চাশ পেরিয়েছে। সাইমন একজন চিত্রশিল্পী এবং তাঁর স্ত্রী একজন সাইকোলজিস্ট। বাংলোয় পৌঁছেই ইব্রাহিমকে ডেকে মেমসাহেব বললেন, বড় একপট চা দিতে। বাংলোর বাগানে চেয়ার নিয়ে আমরা বসলাম। ভেবেছিলাম চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে নানান বিষয়ে আমাদের কথা হবে কিন্তু গোধূলির আলোয় আলোকিত পানিখারের মোহিনী নিসর্গ আমাদের বাকরুদ্ধ করে রাখল।

শিল্পী সাইমন শুধু ফিসফিস করে একবার বলে উঠলেন 'Wonderful'।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

যাঁরা শ্রীনগর-কারগিল হয়ে লাদাখ বেড়াতে যাবেন বা লাদাখ বেড়িয়ে কারগিল-শ্রীনগর দিয়ে ফিরবেন তাঁরা সহজেই পানিখারে একটা দিন কাটিয়ে আসতে পারেন। কারগিল থেকে

পানিখারের দূরত্ব ৬৭ কিলোমিটার, বাসভাড়া ৪৫ টাকা। বাসের সংখ্যা সীমিত তাই প্রয়োজনে মারুতি ভাড়া করা যেতে পারে। মারুতি নিয়ে গেলে শাংকুর অদূরবর্তী পাহাড়ে খোদাই করা বুদ্ধমূর্তি দেখার সুযোগ পাওয়া যাবে। শ্রীনগর থেকে কারগিল যাওয়ার জন্য সবচেয়ে ভালো উপায়টি হল JKSRTC বাস। এছাড়া শেয়ারের টাটা সুমো পাওয়া যাবে। লে থেকেও কারগিল যাওয়ার বাস এবং শেয়ারের সুমো পাওয়া যাবে।
কারগিলের প্রাইভেট বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য পর্যটন দপ্তরে গেলে পানিখার বাংলোর বুকিং পেতে কোনও সমস্যা হবে না। কারগিলের পর্যটন দপ্তরের ফোন নম্বর: (☎২৩২৭২১/২৩২২১৬)। পানিখার বাংলোর ঘরভাড়া মাত্র ৮০ টাকা। কারগিলে সুলভে থাকার জন্য সবচেয়ে সেরা জায়গাটি হল ট্যুরিস্ট বাংলো। এছাড়া অন্যান্য কয়েকটি হোটেলের নাম নীচে দেওয়া হল।
গ্রিনল্যান্ড (☎২৩২৩২৪), হোটেল ট্যুরিস্ট মার্জিনা (☎৯৪১৯১৭৭১৫৫), হোটেল সিয়াচেন (☎২৩২৩২১/২৩৩০৫৫), ইয়াকটেল, হাইল্যান্ড। পানিখার ভ্রমণের মরসুম মধ্য জুন থেকে মধ্য অক্টোবর। সেরা সময় জুলাই মাস।
রূপায়ন ট্যুরিজম এক্সপ্লোরিং সোসাইটি নিয়ে যাচ্ছে প্যাকেজ ট্যুরে লাদাখ। বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা:

রূপায়ন ট্যুরিজম এক্সপ্লোরিং সোসাইটি
১, পার্ল ম্যানসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর
কলকাতা-৭০০ ০২০

কারগিলের এস টি ডি কোড: ০১৯৮৫।

'ভ্রমণ' ডিসেম্বর ২০০৫

মানস ভ্রমণ

১ মার্চ, ২০০৪ কামরূপ এক্সপ্রেসে রওনা দিয়ে পরদিন দুপুর তিনটের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম বরপেটা রোড। মানস জাতীয় উদ্যানের সবচেয়ে নিকটবর্তী রেলস্টেশন এই বরপেটা রোড। হাওড়া থেকে দূরত্ব ৮৬৫ কিলোমিটার। এখান থেকে মানস অরণ্যের মাথানগুড়ি বনবাংলোর দূরত্ব মাত্র ৪০ কিলোমিটার হলেও জঙ্গলে ঢোকার আগে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কাজ সারার জন্য এই দিনটা আমাদের বরপেটা রোড শহরেই থাকতে হবে। কাজগুলি হল বনবাংলোয় থাকার অনুমতিপত্র জোগাড় করা, গাড়ির ব্যবস্থা করা আর তিনদিন বনবাসের জন্য প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহ করা।

মাথানগুড়ি বনবাংলোর অবস্থান মানস জাতীয় উদ্যানের অন্তর্গত ব্যাঘ্র প্রকল্পের কোর এরিয়ায়, তাই বাংলোয় থাকার অনুমতি দেবেন প্রকল্পের ফিল্ড ডিরেক্টর। ব্যাঘ্র প্রকল্পের অধিকর্তা অভিজিৎ রাভার সাদর অভ্যর্থনায় স্বস্তিবোধ করলাম আর নিশ্চিন্ত হলাম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবরটি পেয়ে। বাংলোর ঘর খালি আছে। বেরিয়ে পড়লাম গাড়ির সন্ধানে।

ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে গিয়ে অনেকের সঙ্গে কথা বলে এবং দরাদরির পর ফজর আলির সঙ্গে পাকা কথা হয়ে গেল। তার মাহিন্দ্রা মার্শাল গাড়ি আমাদের সঙ্গে তিন রাত থাকবে তার জন্য দিতে হবে দুহাজার টাকা। তেল খরচ, গাড়ির প্রবেশকর আলাদা। ফজর আলির গাড়ি চেপেই ফিরে গেলাম টাইগার প্রজেক্টের অফিসে। টাকা জমা দিয়ে বাংলোর বুকিং এবং বনভ্রমণের অনুমপতিপত্র পেতে দেরি হল না। বাকি রইল দুটি কাজ। রাত্রিবাসের জন্য একটা ভদ্রস্থ আস্তানা খুঁজে বার করা আর বাজার করা। অল্প আয়াসেই ঘর পেয়ে গেলাম 'মানস গেস্টহাউস' নামের হোটেলে। চমৎকার দ্বিশয্যাঘর, ভাড়া আড়াইশো টাকা।

সন্ধের মুখে হাতে ফর্দ নিয়ে বেরলাম কেনাকাটা সারতে। অনেক চিন্তাভাবনা করে তৈরি করা হয়েছে এই ফর্দ কারণ মাথায় ছিল এক বনকর্মীর সাবধানবাণী, 'কোনও জিনিস কম পড়লে ছুটতে হবে কুড়ি কিলোমিটার দূর বাঁশবাড়িতে।' বাজার করার ফাঁকে শহরটাও দেখা হয়ে গেল। রেলপথ এবং সড়কপথের এক গুরুত্বপূর্ণ জনপদ এই বরপেটা রোড। বড় বাণিজ্যকেন্দ্রও বটে। বেশ কয়েকজন বাঙালি ব্যবসায়ীর সন্ধান পেলাম।

সকাল আটটা নাগাদ ফজর আলি এসে হাজির। গাড়িতে ২৮ লিটার ডিজেল ভরা হল। যাওয়া আসা এবং জঙ্গলে ঘোরার জন্য ২৩-২৪ লিটার যথেষ্ট আর বাকিটা

লাগবে বনবাংলোর জেনারেটর চালিয়ে নদী থেকে জল তোলার কাজে। বরপেটা রোড থেকে যাত্রা করে রেললাইন পেরিয়ে উত্তরদিকের পথ ধরল আমাদের গাড়ি। অল্পদূর যাবার পর রাস্তার দুরবস্থা দেখে আঁতকে উঠলাম। সংস্কারের অভাবে পথ ছোট-বড় গর্তে ভরা। অনেক জায়গায় পিচরাস্তা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়ে মাটি বেরিয়ে পড়েছে। আমাদের গাড়ি টলতে টলতে, শম্বুকগতিতে এগিয়ে চলল। ফজর আলি জানাল, বাঁশবাড়ি পর্যন্ত এমন দুর্গম পথ ধরেই আমাদের যেতে হবে। চলার পথে ছোট ছোট গ্রাম চোখে পড়ছে। স্থানীয় অধিবাসীরা বড়ো উপজাতীয়। কয়েকটি বড় গ্রামও চোখে পড়ল, যেমন খয়েরবাড়ি, গোবর্ধনা আর কালপানি। এরপর ফতেমাবাদ চা-বাগান পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম বাঁশবাড়ি।

বাঁশবাড়ি রেঞ্জ অফিস ছাড়িয়ে অল্পদূর যেতেই মানস ন্যাশনাল পার্কের প্রবেশপথ। অনুমতিপত্রের এক কপি জমা দিয়ে প্রবেশাধিকার পাওয়া গেল। গাড়ি জঙ্গলে ঢোকার পরেই নড়েচড়ে বসলাম। চলার পথে পশুপাখির দর্শন পাওয়া অবশ্যই ভাগ্যের ব্যাপার তবে তার জন্য তৈরি থাকাও দরকার। পথ সংলগ্ন অরণ্য মোটেই গহিন নয়। যা চোখে পড়ছে তা হল লম্বা ঘাসের বন। মাঝে মধ্যেই বড় বড় গাছ। বেশ কয়েক জায়গায় বনবিভাগের উদ্যোগে শুকনো ঘাস পুড়িয়ে দেওয়াতে বনভূমি কালো হয়ে আছে। প্রতিবছর শীতের শেষে পরিকল্পিতভাবে শুকনো ঘাসবন পুড়িয়ে দেওয়া হয় যাতে বর্ষার আগমনে নতুন তৃণভূমি গড়ে ওঠে। বনপথ ধরে ৫-৬ কিলোমিটার যাবার পর জঙ্গল ঘন হতে আরম্ভ করল। প্রচুর শিমুল গাছ চোখে পড়ছে কিন্তু গাছের চেহারা দেখে হতাশ হলাম। কোনও গাছে ফুল নেই, তার বদলে বৃক্ষ শাখা পটলাকৃতি ফলে পূর্ণ হয়ে আছে। বেশ বুঝতে পারলাম এক মাস আগে এলে রক্তবর্ণ শিমুল ফুলের শোভা দেখে ধন্য হতাম। শিমুল না দেখার দুঃখ অনেকটাই দূর হল পাখি দেখে। পরিচিত পাখি তো বটেই বেশ কিছু বিরল দর্শন পাখিও চোখে পড়ল। যেমন ধনেশ, নীলকণ্ঠ, মোহনচূড়া, বেনে বৌ, সবুজ পায়রা, বসন্তবৌরী আর কয়েক প্রজাতির শিকারি পাখি। এছাড়া বেশ কয়েকটি ময়ূরকে দেখলাম সতর্ক পদক্ষেপে খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে।

প্রায় মাঝ রাস্তায় এসে লতাজোড় বিট অফিসের সামনে উপস্থিত হলাম। বনকর্মীরা জানাল, আজ ভোরেই প্রায় ত্রিশটি হাতির একটা বড় দল তাদের চোখের সামনে দিয়ে উচিলা বিটের দিকে এগিয়ে গেছে। কথায় কথায় আরও জানা গেল এই মুহূর্তে আমরা যে অগভীর জলাশয়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছি এখানেই প্রতিদিন ভোরবেলায় আর বিকেলের দিকে বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর দর্শন মেলে। এমন একটা জায়গায় একটা রাত কাটাবার অভিজ্ঞতা কেমন হবে এই কথা ভাবতে ভাবতেই একসময় পৌঁছে গেলাম মাথানগুড়ি বনবাংলো। টিলার ওপর তৈরি আপার বাংলোর সবকটি ঘরই খালি পড়ে আছে। শুধু তাই নয়, সামনেই দোল উৎসব বলে আর কোনও ট্যুরিস্ট আসার সম্ভাবনা কম বলে জানাল বাংলোর এক কর্মী। পুরো বনবাংলোর দখল পেয়ে ক্ষণিকের জন্য দিশাহারা হয়ে পড়েছিলাম। কোন ঘরটায় থাকলে সবচেয়ে ভালো হবে ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না। বাংলোর রাঁধুনি বুদ্ধি দিল তিনদিন তিনটি ঘরে থাকলেই তো হয়। আপাতত দোতলার তিন নম্বর ঘরটিই

আমাদের পছন্দ হল।

বনবাংলোর কোথায় কী আছে দেখতে দেখতে এক সময় দোতলার বারান্দার শেষপ্রান্তে উপস্থিত হতেই মধুর বিস্ময়ের ধাক্কায় বাকরুদ্ধ হয়ে পড়লাম। মানস অরণ্যের সমস্ত সৌন্দর্য কেউ যেন কাঠের ফ্রেমে বাঁধিয়ে আমার সামনে ঝুলিয়ে দিয়েছে। ভুটান পাহাড় থেকে নেমে এসে মানস নদী ঠিক বাংলোর সামনে দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে গেছে। নদীর নীল জলধারা, সোনালি বালিতে ঢাকা নদীতট, সবুজ বনানী আর দূরের ওই নীলাভ শৈলমালা মিলে এমনই এক অপার্থিব শোভার সৃষ্টি করেছে যে দর্শনমাত্র তৃপ্তিতে মন ভরে ওঠে। কোথাও না গিয়ে শুধু ঝুলন্ত বারান্দায় বসেই সারাটা দিন কাটিয়ে দেওয়া যায়।

মধ্যাহ্নভোজনের পর বারান্দায় চেয়ার নিয়ে বসলাম। সামনের মাদার গাছে অজস্র লাল ফুল ফুটে আছে। ফুলের ভেতর মুখ গুঁজে খাবার সংগ্রহে ব্যস্ত পাহাড়ি ময়না, শালিক আর ফুলচুষির দল। ছোটখাটো চেহারার এক ধূসর বর্ণের কাঠবিড়ালিও দেখছি এক ডাল থেকে আরেক ডালে ছোটাছুটি করছে আর মাঝে মধ্যে ফুলের মধ্যে কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। এই কাঠবিড়ালির পিঠে সেই অতিপরিচিত তিনটি সাদা দাগ অনুপস্থিত। কাঠবিড়ালি আর পাখিদের কাণ্ডকারখানা দেখার মধ্যেই মাথানগুড়ি বিট অফিসার গোপেশ মেধি এসে উপস্থিত হলেন। উনি যে একজন অভিজ্ঞ বনকর্মী তার পরিচয় পেতে দেরি হল না। সবে প্রাথমিক পরিচয়পর্ব শেষ হয়েছে, উনি তর্জনী নির্দেশ করে বলে উঠলেন, 'ওই দেখুন দুটো হরিণ নদী পেরোচ্ছে।' অগভীর নদীর জলপ্রবাহ পেরিয়ে, অত্যন্ত ধীরগতিতে দুটি হরিণ ভুটানের এলাকা থেকে ভারতের দিকে আসছে। চোখে বাইনোকুলার দিতেই চিনতে পারলাম, এরা দুটি পুরুষ সম্বর হরিণ।

বিট অফিসারের সঙ্গে কথা বলে আর তাঁর দেওয়া তথ্যপুস্তিকা থেকে মানস অরণ্য সম্পর্কে কত কথাই না জানা গেল। মানস নদী দুটি ধারায় বিভক্ত হবার পর একটির নাম হয়েছে বেঁকি আর অপরটির পরিচিতি হাকোয়া নামে। মাথানগুড়ি বনবাংলোর বিপরীতে, নদীর ওপারেই ভুটানের এলাকা। সেখানকার জঙ্গলের নাম রয়্যাল মানস ন্যাশনাল পার্ক, এখানেই দর্শন মেলে বিখ্যাত সোনালি হনুমান বা গোল্ডেন লাঙ্গুরদের। ভারতীয় ভূখণ্ডে অবস্থিত মানসের বনভূমিকে 'অভয়ারণ্য' রূপে ঘোষণা করা হয় ১৯২৮ সালে। ১৯৭৩ সালে অভয়ারণ্যের একটি অংশ ব্যাঘ্র প্রকল্পের জন্য নির্দিষ্ট হয় আর অসাধারণ জীব এবং উদ্ভিদ বৈচিত্র্যের জন্য মানস অভয়ারণ্যকে ১৯৮৮ সালে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের তালিকাভুক্ত করা হয়। ১৯৯০ সালে মানসকে জাতীয় উদ্যানের মর্যাদা দেওয়া হয়। ২,৮৩৭ বর্গ কিলোমিটার আয়তনবিশিষ্ট মানস ন্যাশনাল পার্কের জীব বৈচিত্র্যের কথা আলোচনা করলে ভারতের আর কোনও অরণ্য এর পাশে দাঁড়াতে পারবে না। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে একমাত্র এখানেই পিগমি হগ বা বামন বরাহদের দেখা মেলে। এছাড়া অন্য উল্লেখযোগ্য প্রাণীদের মধ্যে রয়েছে ক্লাউডেড লেপার্ড, সোনালি বনবিড়াল, লেপার্ড ক্যাট, বিন্টুরং, বুনো কুকুর, হিসপিড হেয়ার, ক্যাপড লাঙ্গুর, গাউর বা ভারতীয় বাইসন, বুনো মোষ, বুনো শুয়োর, পাঁচ প্রজাতির হরিণ, শজারু, ভাল্লুক, ভোঁদড়,

চিতাবাঘ, বাঘ, শিয়াল, হাতি আর গণ্ডার। মানসের আরেকটি খ্যাতি তার পাখিদের জন্য। ভাবলে অবাক লাগে আজ পর্যন্ত তিনশোর বেশি রকমের পাখি এখানে দেখা গেছে। এছাড়া বেশ কিছু বিরল সরীসৃপেরও বাস এই জঙ্গলে।

বিট অফিসার গোপেশবাবু বিদায় নেবার আগে বনবাংলোর 'Visitors Remarks Book'টি আমার হাতে দিয়ে গেলেন। বাঁধানো খাতার পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ রয়েছে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের মানস ভ্রমণের অভিজ্ঞতা এবং মন্তব্য। এঁদের মধ্যে সাধারণ ভ্রমণ রসিক যেমন রয়েছেন তেমনই আছেন বিখ্যাত সব মানুষজন। একবার পড়তে আরম্ভ করলে থামা কঠিন— এমনই আকর্ষণীয় এই ভিজিটার্স বুক। ১৯৭৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি সুনীল গাঙ্গুলি নামে এক পর্যটক মানস নিয়ে তাঁর মন্তব্য লিখেছেন এই ভাবে, 'What a variety of birds; I wish I could stay here for a longtime. May be I come back again'। মনে প্রশ্ন জাগল ইনিই কি আমাদের প্রিয় সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়?

বিকেলের দিকে মানস নদী সংলগ্ন পথ ধরে হেঁটেই পৌঁছে গেলাম অদূরবর্তী ভুটান চেকপোস্টে। চেকপোস্ট এখন পরিত্যক্ত। ভুটানিদের দোকানগুলি তালাবন্ধ। দেখেই বোঝা যায় কোনও এক বিশেষ কারণে বাসিন্দাদের দ্রুত স্থান ত্যাগ করতে হয়েছে। লোকজন না দেখে আমরা ভুটানের আরও ভেতরে ঢুকে পড়লাম। এই পথটিই চলে গেছে তেরো কিলোমিটার দূরে ভুটানের পাংবাং শহরে। সীমান্ত চেকপোস্টের কাজকর্ম আপাতত এই শহর থেকেই চালানো হচ্ছে। পথের বাঁদিকেই মানস নদী বয়ে চলেছে। নদীর জলে বেশ কিছু জলচর পাখিকে দেখলাম মনের আনন্দে ভেসে বেড়াচ্ছে। এদের মধ্যে কয়েকটি পাখি আকারে অপেক্ষাকৃত বড়। ভাসমান অবস্থায় এদের সঠিকভাবে চেনা বড় কঠিন। জঙ্গলের মধ্যেই আলাপ হল কয়েকজন ভুটানি বনরক্ষীর সঙ্গে, বেশ আলাপ হয়ে গেল। এদের কাছেই জানতে পারলাম ভুটানের দিকের নদী সংলগ্ন জঙ্গলে ভোরে এবং বিকেলে সোনালি হনুমানের দেখা মেলে। চেকপোস্টের কাছেই, ভুটানের এলাকায় কয়েকটি কাঁঠাল গাছে প্রচুর ফল ধরেছে। ভুটানি বনরক্ষীরা বেশ কয়েকটি ইঁচড় পেড়ে আমাদের উপহার দিলেন। ঠিক হল পরদিন দুপুরের মেনুর মধ্যে ইঁচড়ের কালিয়াও থাকবে।

বনবাংলোয় ফিরে এসে আবার বারান্দায় গিয়ে বসে রইলাম। সন্ধের পর চাঁদের আলোয় মানস অরণ্য মায়াবী রূপ নিল। নদী স্রোতের উপল বিক্ষুব্ধ সংগীত শুনতে শুনতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। এক বেরসিক প্যাঁচার কর্কশ ডাকে চমকে উঠে আবিষ্কার করলাম নিষ্প্রদীপ বনবাংলোয় আমি একা।

মাথানগুড়ির বনবাংলোর ডাইনিং হলে বসে ভোজনপর্ব সম্পন্ন করা এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। তিনদিকের বড় বড় কাচের বাতায়ন দিয়ে বাইরের পৃথিবী সদা দৃশ্যমান। জ্যোৎস্না প্লাবিত চরাচরের পাগল করা সৌন্দর্য দেখার ফাঁকে যখন পাচকের দক্ষ হাতে তৈরি চিকেনকারির সুগন্ধ নাকে এসে মৃদু ধাক্কা মারল সেই মাহেন্দ্রক্ষণের সম্যক বর্ণনা করা আমার অসাধ্য।

পরদিন ভোরে দুই বনরক্ষী মফিজুল হক আর কালাচাঁদ সরকারকে নিয়ে আমরা বেরোলাম পদব্রজে কাছাকাছি জঙ্গলে বেড়িয়ে আসব বলে। কয়েক বছর আগেও

মাথানগুড়িতে হাতির পিঠে চেপে বনভ্রমণের ব্যবস্থা ছিল। পরে প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে পর্যটকদের সংখ্যা এত কমে যায় যে হাতিদের বাঁশবাড়ি রেঞ্জ অফিসে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তাই জঙ্গলের ভেতরে ঢুকতে গেলে বনরক্ষী সঙ্গে নিয়ে পায়ে হাঁটা ছাড়া গতি নেই। রোগা-পাতলা এবং নিরীহ দর্শন কালাচাঁদ সরকারকে দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না যে নিজের ভাগ্নেকে বাঘের মুখ থেকে ছিনিয়ে আনতে গিয়ে সে টাঙির কোপ মেরেছিল ক্ষিপ্ত বাঘের মাথায়। ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯৮৯ সালে। এই অসমসাহসিকতার জন্য তাকে রাষ্ট্রপতির পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। কালাচাঁদের মুখে এই ঘটনার বিবরণ শোনা এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা। আপার বাংলো থেকে নেমে, লোয়ার বাংলোর সামনে দিয়ে হেঁটে পৌঁছে গেলাম বেঁকি নদীর ধারে।

ভোরবেলায় জঙ্গলের অন্য রূপ, পাখির কাকলিতে চারদিক মুখর হয়ে আছে। নদীর ধার দিয়ে হাঁটতে গিয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করলাম চার-পাঁচটা ভোঁদড় মহা আনন্দে মাছ ধরে ধরে খাচ্ছে। এদের বাদামি রঙের গায়ের লোম এতই মসৃণ যে তাদের সিক্ত শরীর সূর্যের আলোয় চকচক করছে। ভোঁদড়ের দল একবার করে জলে ডুব দিচ্ছে আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মুখে মাছ নিয়ে ওপরে উঠে আসছে তারপর সেই মাছ খাচ্ছে দু-থাবা দিয়ে চেপে ধরে এক অদ্ভুত ভঙ্গিমায়। এদের দেখে মনে হল মানস অরণ্যের সবচেয়ে সুখী প্রাণী বোধহয় এই ভোঁদড়ের দল। আমাদের দুর্ভাগ্য, দর্শকদের উপস্থিতি টের পাওয়া মাত্র ভোঁদড় পরিবার উধাও হয়ে গেল। নদীর ধার দিয়েই আমরা এগিয়ে চললাম। অল্প দূর যেতেই বাঁদরের দল চোখে পড়ল। এদের বলা হয় 'আসামিজ ম্যাকাক'। আমাদের দেখা মাত্র সবকটা বাঁদর গাছে উঠে পড়ল, শুধু একজন গাছের গোড়ায় বসে সতর্কভাবে আমাদের গতিবিধির ওপর নজর রাখতে সচেষ্ট হল। এই বড় গাছটির বিশেষত্ব হল বৃক্ষকাণ্ডের ছালটি কারা যেন জোর করে ছাড়িয়ে নিয়েছে। সঙ্গী বনরক্ষীরা জানাল, এটি বুনো হাতিদের কাজ। আরেক জায়গায় দেখি আশপাশের জমি কারা যেন খুরপি চালিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে গেছে। জানা গেল, এই কাণ্ড করছে বুনো শুয়োরের দল, উদ্দেশ্য মাটির ভেতর থেকে নানা ধরনের কন্দ এবং গাছের মূল খুঁজে বার করা।

অস্পষ্ট পথরেখা অনুসরণ করে একসময় আমরা নদীর তীর ছেড়ে জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে পড়লাম। পথের দুপাশেই আদিম অরণ্য। চলার পথে কয়েকদিনের পুরনো পুরীষ চোখে পড়ল। হাতির দর্শন পাবার কোনও সম্ভাবনা নেই জেনে একটু হতাশ হলাম। বনের এক জায়গায় প্রচুর ধনেশ পাখির জটলা। মানস জাতীয় উদ্যানের এক বিশিষ্ট পাখি এই ধনেশ। অনেক দূর থেকেই এদের তীক্ষ্ণ ডাক শোনা যায়। বিশাল,রঙিন ডানা মেলে যখন এই ধনেশ পাখির দল এক জঙ্গল থেকে আরেক জঙ্গলে উড়ে যায় তখন তা হয়ে ওঠে এক দেখার মতো দৃশ্য।

আমরা যে পথ দিয়ে হেঁটে চলেছি তার বেশ কয়েকটি জায়গায় বনতল অজস্র বুনো টগর ফুলে ঢাকা। আমাদের এই বনভ্রমণে বেশ কিছু জন্তু-জানোয়ারের দর্শন পাওয়া যাবে বলে আশা করেছিলাম কিন্তু বাস্তবে দেখা পেলাম বুনো শুয়োর, ময়ূর আর কয়েকটা হগ ডিয়ারের।

বাংলোয় ফিরে এসে বারান্দায় বসতেই এক বনকর্মী এসে নদীর ওপারে আঙুল

তুলে বললেন, 'ওই দেখুন বুনো মোষ'! একটা বিশাল চেহারার বুনো মোষ একা একা নদীর ধারে অতি ধীর পদক্ষেপে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিশাল দুটো শিং তলোয়ারের মতো দুদিকে ছড়িয়ে আছে। বনকর্মীটি জানালেন, বেশ কয়েকদিন হল এই সঙ্গীহীন পুরুষ মোষটি বেলা বাড়লে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে নদীতীরেই ঘোরাঘুরি করে আবার বিকেলে জঙ্গলে ফিরে যায়।

দুপুরের স্নান সারতে নদীতে নেমেছিলাম। বরফশীতল জলে ডুব দেবার পর এক মুহূর্তের জন্য সর্বাঙ্গ যেন অসাড় হয়ে গেল। একে তো প্রচণ্ড ঠান্ডা জল তার ওপর প্রবল স্রোতের টান, তাই স্নানপর্ব বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। আজ অপরাহ্ণে আমরা যাব উচিলা বিট অফিসে। মাথানগুড়ি থেকে পূর্বদিকে প্রায় ২৪ কিলোমিটার দূরে উচিলা বিট এলাকা কয়েকমাস আগেও বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গিদের শক্ত ঘাঁটি ছিল। সাধারণ পর্যটক তো দূরের কথা বনকর্মীদেরও ওই অঞ্চলে প্রবেশাধিকার ছিল না। জঙ্গিদের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করতে গিয়ে একাধিক বনকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। বিকেল চারটের মধ্যে আমরা সদলবলে রওনা দিলাম। আমাদের দলে বিট অফিসার ছাড়া পাঁচজন সশস্ত্র ফরেস্ট গার্ডও রয়েছেন।

মাথানগুড়ি থেকে বাঁশবাড়ির পথে বারো কিলোমিটার যাবার পর আমাদের গাড়ি বাঁদিকের কাঁচারাস্তা ধরল। কিছুদূর যাবার পরেই বেশ বোঝা যাচ্ছিল, এই পথে গাড়ি চলে কালেভদ্রে। মাটির রাস্তার ওপরেই লম্বা ঘাস গজিয়ে গেছে। দুপাশের জঙ্গল কিন্তু ঘন নয়। আমাদের গাড়ির গর্জন শুনে ঘাবড়ে গিয়ে দুটি হগ ডিয়ার বা পারা হরিণ সংলগ্ন ঘাসবন থেকে বেরিয়ে এসে গাড়ি চলার পথ ধরেই ছুটতে আরম্ভ করল। উচিলা বিট অফিসের কিছু আগে চোখে পড়ল এক বুনো মোষের পরিবার। আমাদের উপস্থিতি টের পাওয়া মাত্র পরিবারের মায়েরা তাদের বাছুরদের নিয়ে ঝোপ জঙ্গলের আড়ালে চলে গেল। পরিবারের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে দাঁড়িয়ে রইল শুধু পরিবারের কর্তা। কী অপরূপ দৃশ্য! গাড়ির নিরাপদ আশ্রয়ে বসে আমরা তাকিয়ে আছি জঙ্গলের এক অকুতোভয় প্রাণীর দিকে। চেহারায় এবং ভঙ্গিমায় প্রবল পৌরুষ ফুটে বেরচ্ছে। পূর্ণবয়স্ক পুরুষ বুনো মোষের সঙ্গে টক্কর দেবার ক্ষমতা জঙ্গলের আর কোনও প্রাণীর নেই, এমনকী বাঘও এদের ঘাঁটায় না।

পরিত্যক্ত উচিলা বিট অফিসের দুরবস্থা দেখে সত্যি মন খারাপ হয়ে যায়। সবকটি ঘরবাড়ির দরজা-জানলা উধাও। অনেক জায়গায় ঘরের পাকা দেওয়াল পর্যন্ত ভেঙে ফেলা হয়েছে। জানা গেল, সেনা অভিযানের মুখে পালিয়ে যাবার আগে জঙ্গিরা এইভাবে ভাঙচুর করে গেছে। সৌভাগ্যবশত ওয়াচটাওয়ারটি অক্ষত রয়েছে। এই নজরমিনারের ওপর উঠতেই অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটল। লম্বা ঘাসবনে বুনো হাতির দল ঘুরে বেড়াচ্ছে। মোট সাতটা হাতি চোখে পড়ল, তার মধ্যে একটা বাচ্চা হাতিও রয়েছে। উচিলা বিট অফিসের পিছনের জঙ্গল থেকেও ডালপালা ভাঙার শব্দ কানে আসছিল। এক বনকর্মী জানাল, এখানেও রয়েছে বেশ কয়েকটি হাতি। তার কথা শেষ না হতেই কানে এল হাতির বৃংহন। বুনো হাতির ডাকে কী দাপট। আমরা আশা করেছিলাম জঙ্গলের আড়াল থেকে এই হাতির দলটি বেরিয়ে আসবে কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করেও তেমন কিছু না ঘটায় আমরা ফেরার পথ

ধরলাম। তার আগে অবশ্য ওয়াচটাওয়ার থেকে এক অসাধারণ সূর্যাস্ত দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল।

আমাদের মানস ভ্রমণের তৃতীয় দিনটি ছিল ঘটনাবহুল। ভোরবেলায় চৌকিদার এসে খবর দিল বাংলোর পাশের জঙ্গলেই ক্যাপড লাঙ্গুরদের একটা বড় দল এসে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। পড়িমরি করে ছুটে গিয়ে দেখি গাছে গাছে এই টুপিওয়ালা হনুমানদের ছড়াছড়ি। কোনও গাছেই পাতা নেই, তার বদলে বড় সিমের মতো দেখতে শুকনো ফলে শাখাপ্রশাখা পূর্ণ হয়ে আছে। হনুমানের দল একেকটা ফল হাতে নিয়ে মাঝখান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে তার ভেতর থেকে খাদ্য সংগ্রহ করছে। ছাই রঙা এই প্রাণীদের মাথার লম্বা লোমে এমনভাবে কপাল ঢেকে রয়েছে যে দূর থেকে মনে হয় সত্যি যেন মাথায় টুপি পরে আছে। শাখামৃগদের কাণ্ডকারখানা সবসময়ই মজাদার, এক্ষেত্রেও তার অন্যথা হল না। সবচেয়ে ভালো লাগল দুধের বাচ্চা বুকে নিয়ে মায়েদের এক ডাল থেকে আরেক ডালে স্বচ্ছন্দ বিচরণ।

সকাল আটটা নাগাদ রেঞ্জ অফিসার মোহন ব্রহ্ম সদলবলে বাঁশবাড়ি থেকে এসে উপস্থিত হলেন। দীর্ঘদেহী এবং অত্যন্ত সপ্রতিভ এই মানুষটি সম্প্রতি বাঁশবাড়ি রেঞ্জের দায়িত্ব নিয়েছেন। মোহনবাবু জানালেন, সঙ্গীদের নিয়ে উনি এখন যাবেন বেঁকি এবং হাকোয়া নদীর মধ্যবর্তী দ্বীপের জঙ্গলে। গোপনসূত্রে খবর পেয়েছেন কাঠচোরের দল ওই বনাঞ্চলে বেশ সক্রিয়। আমরা দেখলাম দ্বীপে যাবার এমন সুযোগ পরে হয়তো আর পাব না। মোহনবাবুকে আমাদের বাসনার কথা জানাতেই উনি সম্মতি জানিয়ে বিট অফিসারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন।

নৌকো করে নদী পেরিয়ে সবাই গিয়ে দ্বীপে উঠলাম। রেঞ্জ অফিসার তাঁর সশস্ত্র রক্ষীদের নিয়ে পায়ে হেঁটে রওনা দিলেন দূরের পথে। দুজন বনরক্ষীর সঙ্গে আমরা হাকোয়া নদীর ধার দিয়ে হাঁটা আরম্ভ করলাম। মাথানগুড়ির বনবাংলো থেকে এই স্থানটিকে দেখে বোঝা যায়নি যে নদীর তীর ছোট-বড় পাথরে পূর্ণ হয়ে আছে। আকার এবং রঙের বৈচিত্র্যে এই উপলখণ্ডগুলি দৃষ্টিনন্দন হলেও হাঁটার পক্ষে ভারি অস্বস্তিকর। একটু অসতর্ক হলেই হোঁচট খেতে হবে। অত্যন্ত মন্থরগতিতে নদীর ধার দিয়ে বেশ কিছুটা যাবার পর দেখি কাছেই পাখিদের মেলা বসেছে। চড়াই পাখিদের চেয়ে একটু বড়, লম্বা লেজবিশিষ্ট ধূসর রঙের পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে আবার হঠাৎই নুড়িপাথরে ভর্তি নদীতটে নেমে এসে বসে পড়ছে। পাখিদের সমবেত কাকলিতে পুরো জায়গাটা মুখরিত হয়ে আছে। আমাদের সঙ্গী বনরক্ষীরা জানাল, আর এগনো যাবে না কারণ পাথরের ফাঁকে ফাঁকে, বালির ওপর, পাখিরা ডিম পেড়েছে। কথাটা শুনে প্রথমে বিশ্বাস করতে কষ্ট হল, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়লাম। নুড়িপাথর এবং বালির মধ্যে ডিমের অবস্থান চট করে চোখেই পড়বে না।

নদীর তীর ছেড়ে একসময় দ্বীপের জঙ্গলে প্রবেশ করলাম। নরম মাটির ওপর বিভিন্ন পশুর পদচিহ্ন আঁকা আছে কিন্তু তাদের কারও দর্শন পেলাম না। ফেরার পথে, নদীর ওপারে, ভুটানি বনরক্ষীদের একটা দলের সঙ্গে দেখা হল। কথা বললে শোনা যাবে না তাই হাত নাড়ানাড়ি করেই পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানালাম। আমরা বাংলোয় ফিরলাম বেলা এগারোটায় আর রেঞ্জ অফিসার ফিরলেন দুপুর তিনটে

নাগাদ। উনি কাঠচোরদের ধরতে পারেননি বটে কিন্তু তাদের ডেরা থেকে প্রচুর জিনিস উদ্ধার করেছেন। গোটা চারেক বিরাট আকারের করাত, কুড়ুল, রান্নার বাসনপত্র এমনকী চোরেদের জামাকাপড় পর্যন্ত তুলে নিয়ে চলে এসেছেন।

বিকেল চারটের সময় দুটি গাড়ি বাঁশবাড়ির দিকে যাত্রা করল। প্রথমটিতে চেপে রেঞ্জ অফিসার এবং তাঁর সঙ্গীরা ফিরে চলেছেন বাঁশবাড়ি আর দ্বিতীয় গাড়িটিতে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বিট অফিসার আর পাঁচজন ফরেস্ট গার্ড। আমরা চলেছি জাঙ্গল সাফারিতে। বাঁশবাড়ি যাবার পথে পাঁচ কিলোমিটার গিয়ে হাজির হলাম এক নদীর ধারে। বর্ষাকাল ছাড়া নদীর জল থাকে নামমাত্র তাই নদীর নাম হয়েছে মরা গাঁতি। গাড়ি থেকে নেমে আমরা বালিতে ঢাকা নদীপথ দিয়ে হাঁটা আরম্ভ করলাম। গাড়ি ফিরে গেল বনবাংলোয়। আজকের বনভ্রমণে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বিট অফিসার গোপেশ মেধি। আমি এবং আমার সঙ্গী দুজনেই খুব ভাগ্যবান যে মানস ন্যাশনাল পার্কের একেবারে 'কোর এরিয়ায়', পায়ে হেঁটে বনভ্রমণের সুযোগ পেয়েছি। গাঁতি নদীর বালির ওপর দিয়ে আমরা হেঁটে চলেছি। নদীখাতের একধার দিয়ে শীর্ণ জলধারা বয়ে চলেছে। বালির ওপর, বিশেষ করে ভেজা বালির ওপর বিভিন্ন পশুর পায়ের ছাপ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সঙ্গী বনকর্মীরা ছাপ দেখে সঙ্গে সঙ্গে বলে দিচ্ছেন কোনটা কোন প্রাণীর। মাঝে মধ্যে তাঁরা আমাদের পরীক্ষা নিচ্ছেন প্রকৃতির পাঠশালায় আমরা কেমন শিখছি। দেখতে দেখতে জঙ্গলের অনেক গভীরে ঢুকে পড়লাম। নদীর শীর্ণ জলস্রোত এক জায়গায় বড় বড় পাথরের বাধা পেয়ে এক ছোট্ট জলাশয়ের সৃষ্টি করেছে। এখানেই নরম মাটিতে এক বনরক্ষী আবিষ্কার করল বাঘের পায়ের ছাপ। বিট অফিসার পুরো জায়গাটা পরীক্ষা করে, বাঘ জঙ্গলের কোনদিক দিয়ে এসে জলপান করে, কোনদিকে চলে গেছে, তা চমৎকারভাবে বুঝিয়ে দিলেন। ওঁর মতে, এই পূর্ণবয়স্ক পুরুষ বাঘটি আজ সকালেই এই এলাকায় ছিল। এতক্ষণ আমি হাঁটছিলাম দলের আগে আগে এই খবর শোনার পর চুপচাপ দলের মাঝখানে নিজের জায়গা করে নিলাম। চলার পথে কতরকম গাছপালাই না চোখে পড়ল। বেশিরভাগ গাছকেই চিনতে পারলাম বনকর্মীদের সাহায্য নিয়ে। এইভাবে পরিচিত হলাম দুধি, কুম, টুন, সোনারু, বহেরা, অর্জুন, হরীতকী, খয়ের আর তেজপাতা গাছের সঙ্গে। এক জায়গায় বড় বড় কাঁঠাল গাছের শাখাপ্রশাখা ছোট বড় ইঁচড়ে ভর্তি হয়ে আছে। আরেক জায়গায় কয়েকটি চালতা গাছের তলায় চালতা ফল পড়ে আছে। এই ফল নাকি হাতিদের খুব প্রিয়। কয়েকজন বনরক্ষী চালতা ফল কুড়িয়ে পিঠের হাভারস্যাকে রাখলেন। আর দেখলাম ফুল ঝাড়ুর বন। নদীর বালির ওপর লম্বা শুঁড়ওয়ালা এক ধরনের উদ্ভিদের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিট অফিসার জানালেন, একে বলে 'হাড়-ভাঙা' গাছ। এই ভেষজগুণসম্পন্ন উদ্ভিদটি নাকি ভাঙা হাড় জুড়তে অব্যর্থ।

আমরা চলেছি বালুকাবৃত নদীপথ ধরে। দুপাশের ঘন জঙ্গল থেকে পাখির কিচিরমিচির, ময়ূরের কর্কশ কেকা ধ্বনি আর মাঝে মধ্যে বার্কিং ডিয়ারের সতর্কধ্বনি আমাদের বনভ্রমণকে রোমাঞ্চকর করে তুলছিল। সেই রোমাঞ্চ চরমে পৌঁছে গেল এক সম্বর দলের দর্শন পেয়ে। এক বনরক্ষীর ইশারা-ইঙ্গিত অনুসরণ

করে বেশ মেহনত করেই নদীর উঁচু পাড়ে উঠে পড়লাম। ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে দেখি ঢিল ছোড়া দূরত্বে গোটা দশেক সম্বর হরিণ নিশ্চিন্ত মনে বিচরণ করছে। বড় চেহারার পুরুষ সম্বরটি মাটিতে পড়ে থাকা গাছের গুঁড়িতে শিং ঘষতে ব্যস্ত। দলের মহিলারা আহার সংগ্রহের ফাঁকেই নজর রাখছে চঞ্চল শিশুদের প্রতি, তাদের নজর যে সত্যি তীক্ষ্ণ তার প্রমাণ পেতে দেরি হল না। আড়াল থেকে একটু উঠে দাঁড়িয়ে ছবি তোলার উদ্যোগ নিতেই ধরা পড়ে গেলাম। শুধু একটা মাত্র চাপা বিপদ সংকেত বেরিয়ে এল এক হরিণীর মুখ থেকে আর চোখের পলকে পুরো দলটাই উধাও হয়ে গেল। এই অপ্রত্যাশিত মধুর অভিজ্ঞতার রেশ মিলিয়ে যাবার আগেই ঘটল আরেক ঘটনা। দিনের আলো কমে এসেছে। গোধূলির 'কনে দেখা' আলোয় এক দাঁতাল বরাহনন্দন বোধহয় অভিসারে বেরিয়েছিল। হঠাৎ আমাদের মুখোমুখি হয়ে তার মেজাজটাই গেল বিগড়ে। অত্যন্ত বিরক্তি সহকারে ঘোঁত-ঘোঁত করতে করতে সে আবার ঢুকে পড়ল জঙ্গলে আর পুরো ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে বৃক্ষচূড়ায় অবস্থানকারী বাঁদরের দল প্রবল চিৎকার জুড়ে দিল।

ইচ্ছে থাকলেও আর বেশিদূর যাওয়া গেল না। দূর থেকে ডালপালা ভাঙার শব্দ কানে আসছে। সন্ধের মুখে বুনো হাতির মুখোমুখি হওয়াটা অনুচিত বিবেচনা করে বিট অফিসার ফেরার পথ ধরলেন।

মাথানগুড়ি বনবাংলোর শেষ রাতটি আমাদের কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বরপেটা রোড থেকে যে পর্যাপ্ত খাদ্যসামগ্রী আনা হয়েছিল তার অনেকটাই উদ্বৃত্ত রয়েছে দেখে ঠিক করলাম আজ রাতে সবাই মিলে খিচুড়ি খাওয়া হবে। এই তিনদিন যে সব বনকর্মী এবং ফরেস্ট গার্ড আমাদের সঙ্গ দিয়েছেন, বহুমূল্য তথ্য দিয়ে আমাদের জানার পরিধি বাড়িয়েছেন তাঁরা সবাই মহা উৎসাহে বিট অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে ডাইনিং হলে হাজির হলেন। খিচুড়ির সঙ্গে ভাজাভুজি তো ছিলই আর ছিল বন থেকে সংগ্রহ করা সেই চালতা ফলের চাটনি। চালতার চাটনির যে এত স্বাদ আগে কখনও উপলব্ধি করিনি।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

রেলপথে বরপেটা রোড আসার পক্ষে কামরূপ এক্সপ্রেস সুবিধাজনক ট্রেন। বরপেটা রোড থেকে মানস জাতীয় উদ্যান বেড়িয়ে আসার জন্য গাড়িভাড়া করতে হবে। বনভ্রমণের পক্ষে টাটা সুমো জাতীয় গাড়ি নেওয়াই ভালো। গাড়িভাড়া নির্দিষ্ট নয়, দরাদরির অবকাশ আছে। গাড়ির জন্য নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করা যেতে পারে:
ফজর আলি, বরপেটা রোড ☎২৬১৪৯৩

কোথায় থাকবেন

বরপেটা রোডে রাত্রিবাসের জন্য হোটেলের অভাব নেই। আড়াইশো টাকার মধ্যে দ্বিশয্যাঘর পেতে সমস্যা হবে না। কয়েকটি হোটেল:
মানস গেস্টহাউস (☎২৬০৯৩৫, ২৬১৭০৫), **হোটেল গীতাঞ্জলি** (☎২৬৩৬১৪), **হোটেল চিত্রলেখা** (☎২৬০৮৬৬)।

মানস জাতীয় উদ্যানের ভেতরে থাকার ব্যবস্থা মাথানগুড়ি বনবাংলোয়। আপার বাংলোয় মোট ছয়টি দ্বিশয্যাঘর এবং লোয়ার বাংলোয় দুটি দ্বিশয্যাঘর আছে। বর্তমানে ঘরভাড়া ১২০ টাকা। আপার বাংলোয় থাকতে পারলেই সবচেয়ে ভালো হয়। বাংলোয় ঘর বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ করতে হবে নিচের ঠিকানায়:

ফিল্ড ডিরেক্টর
টাইগার প্রজেক্ট, মানস, বরপেটা রোড, আসাম-৭৮১ ৩১৫
☎২৬০২৮৮, ২৬০২৮৯, ২৬২২১২

মাথানগুড়িতে কোনও দোকান নেই। সমস্তরকম কাঁচা আনাজ এবং মুদিখানার সামগ্রী কিনতে হবে বরপেটা রোড থেকে। বাজার করার সময় গাড়িচালক এবং পাচকের কথাও মাথায় রাখতে হবে। বনবাংলোয় জেনারেটর আছে কিন্তু চালাবার জন্য ডিজেলের ব্যবস্থা পর্যটককেই করতে হবে। মাথানগুড়িতে ঘরে মশারির ব্যবস্থা থাকলেও মশার উৎপাত নেই বললেই চলে।

কখন যাবেন

বেড়াবার মরসুম নভেম্বর থেকে এপ্রিল। সেরা সময় ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ মাস।

বনভ্রমণের অন্যান্য খরচ

জঙ্গলে প্রবেশ কর: মাথাপিছু কুড়ি টাকা, **গাড়ির এককালীন প্রবেশ কর:** তিনশো টাকা, **স্টিল ক্যামেরা:** পঞ্চাশ টাকা।

মানস ভ্রমণ শেষে উৎসাহী পর্যটকরা গুয়াহাটি (১৬০ কিলোমিটার বরপেটা রোড থেকে) এবং শিলং (১০০ কিলোমিটার গুয়াহাটি থেকে) বেড়িয়ে আসতে পারেন। সব মিলিয়ে ৭-৮ দিনের একটা নিটোল ভ্রমণসূচি তৈরি করা যাবে।

বরপেটার এস টি ডি কোড: ০৩৬৬৬।

'ভ্রমণ' মে ২০০৪

জাঁসকার উপত্যকার পদম শহর

জম্মু এবং কাশ্মীর রাজ্যের লাদাখ অঞ্চলটি দুটি জেলায় বিভক্ত। লে এবং কারগিল। কারগিল জেলার এক মহকুমা হল জাঁসকার। সমগ্র হিমালয়ের সবচেয়ে বিচ্ছিন্ন এবং জনবিরল এলাকাগুলির অন্যতম। সামরিক দিক দিয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে জাঁসকার এলাকায় সড়কপথের উন্নতিবিধানের তেমন কোনও উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। প্রতিবছর নভেম্বর থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত বহির্বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকে এই জাঁসকার উপত্যকা। বছরের অন্য সময়ে জেলাসদরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষিত হয় কারগিল-পদম সড়কপথের সৌজন্যে। ২৩৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সড়কপথটির অপার বৈচিত্র প্রতিটি হিমালয়প্রেমিককেই মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে, এমনটিই জেনেছি দেশি-বিদেশি পর্যটকদের লেখার মাধ্যমে।

২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে কারগিল শহরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম কারগিল পর্যটন উৎসবে সামিল হতে। উৎসব আরম্ভ হতে বেশ কয়েকদিন দেরি আছে জেনে জেলা পর্যটন আধিকারিকের পরামর্শে পদম বেড়িয়ে আসব বলে স্থির করলাম। কারগিল থেকে সরকারি বাসে চেপে সরাসরি পদম যাওয়ার ব্যাপারে প্রধান সমস্যাটি হল বাস ছাড়ে রাত সাড়ে তিনটের সময়। তার মানে হোটেল থেকে অতি অবশ্যই রাত তিনটের মধ্যে বেরিয়ে পড়তে হবে। মাঝরাতে বাসে উঠতে আমার অনীহা লক্ষ করে কারগিলের ট্যুরিস্ট অফিসার মিঃ আগা সমস্যার সমাধান করে দিলেন এক মুহূর্তে। তাঁর মতে, কারগিল থেকে সরাসরি পদম না গিয়ে আমার উচিত হবে প্রথমে সুরু উপত্যকার অন্যতম সুন্দর জনপদ পানিখার গিয়ে দুয়েকটা দিন কাটানো। কারগিল থেকে পদমগামী বাস মাঝরাতে ছেড়ে সকাল সাড়ে ছটা নাগাদ পানিখার পৌঁছয়। পানিখারে এই বাসে উঠে স্বচ্ছন্দেই রওনা দেওয়া যাবে পদমের দিকে।

বাস্তবে ঘটলও তাই। পানিখারে দুটো দিন কাটল ভারি আনন্দে। এবার রওনা দেব পদম। ৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৫ সকাল ছটার আগেই পানিখার ট্যুরিস্ট বাংলোকে বিদায় জানিয়ে পা বাড়ালাম বাসস্ট্যান্ডের দিকে। আমার সঙ্গেই পদম চলেছেন এক ফরাসি পর্যটক দম্পতি। একই ট্যুরিস্ট বাংলোয় থাকার সুবাদে এঁদের সঙ্গে আমার বেশ একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর পদমের বাস এল সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ। যাত্রীদের নাস্তাপানির সুযোগ দিতে বাস দাঁড়িয়ে রইল প্রায় আধঘণ্টা। আমি বসার জায়গা পেলাম বাসের একটু পিছনের দিকে, তবে জানালার পাশে। সকাল আটটায় বাস

নতুন উদ্যমে যাত্রা শুরু করল। বাসের যাত্রীদের মধ্যে রয়েছে জনা দশেক বিদেশি, বাকিরা সব লাদাখি। লাদাখিদের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং মুসলিমদের সংখ্যা প্রায় সমান সমান।

পানিখার থেকে পদম শহরের দূরত্ব ১৭০ কিলোমিটার। এই পথটিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম অংশটি হল পানিখার থেকে পেঞ্জি লা। দূরত্ব ৮৪ কিলোমিটার। আর দ্বিতীয় অংশটি হল পেঞ্জি লা থেকে পদম, দূরত্ব ৮৬ কিলোমিটার। প্রায় ১৪,৪০০ ফুট উঁচু পেঞ্জি গিরিপথ কারগিল-পদম সড়কপথের উচ্চতম স্থান।

পানিখার থেকে ৬ কিলোমিটার চড়াইপথ অতিক্রম করে বাস পৌঁছে গেল টাঙ্গোল। পর্বতারোহীমহলে টাঙ্গোল এক পরিচিত নাম। কারণ এখান থেকেই নুন পর্বতশৃঙ্গ (৭,১৩৫ মিটার) আরোহণের উদ্যোগপর্বের সূচনা হয়। টাঙ্গোল থেকে আরও ১৭ কিলোমিটার গিয়ে বাস দাঁড়াল পারকাচিক গ্রামে। এখানে বেশ কয়েকজন যাত্রী উঠলেন যাঁদের বেশভূষা এবং মাথার টুপি দেখে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বলে চিনে নিতে কষ্ট হয় না।

পানিখার থেকে রওনা দেওয়ার সময় সুরু নদী ছিল সড়কপথের বাঁদিকে আর এখন নদীকে দেখছি পথের ডানদিক দিয়ে বয়ে চলেছে। পারকাচিক থেকে আমার সহযাত্রী হয়েছেন জিগমে দোরজি, এক লাদাখি স্কুলশিক্ষক। ওঁর কাছেই জানলাম, আরেকটু পরেই আমাদের চোখে পড়বে পারকাচিক হিমবাহ। দোরজির কথা শুনে ভেবেছিলাম দূরবর্তী কোনও পর্বতগাত্রে জমে থাকা তুষারস্তূপ দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে কিন্তু বাস্তবে যা চাক্ষুষ করলাম তা কল্পনারও অতীত। আক্ষরিক অর্থেই মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েছিলাম। সম্বিত ফিরল আমার বিদেশি সহযাত্রীদের কলরবে। তাঁরা সমস্বরে বাস থামাবার জন্য চালককে অনুরোধ করে চলেছেন। বাসচালক সবাইকে আশ্বস্ত করে জানালেন, বাস দাঁড়াবে আসল ভিউপয়েন্টে পৌঁছে। বাস থামতেই পর্যটকের দল ক্যামেরা বাগিয়ে পথের ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন। আমি একটু ফাঁকায় দাঁড়িয়ে মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম এক অসাধারণ প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিকে। আমরা দাঁড়িয়ে আছি বাসরাস্তার ধারে। খুব কাছেই সুরু নদী প্রবলবেগে বয়ে চলেছে কারগিলের দিকে, সুরু নদীর ওপারে হঠাৎ এক বিশাল হিমবাহ উঁচু পাহাড়ের ওপর থেকে সোজা নেমে এসেছে নদীর গায়ে। হিমবাহের আদিম বরফ জায়গায় জায়গায় ভেঙে যাওয়ার ফলে বিভিন্ন বয়সের বরফ অনাবৃত হয়ে পড়েছে। বরফের যে এতরকম রং হতে পারে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন হত। আমাদের চোখের সামনেই বিশাল এক বরফের চাঁই সশব্দে আছড়ে পড়ল নদীর জলে। বিকট শব্দ, প্রবল জলোচ্ছ্বাস দেখে মুহূর্তের জন্য মনে হল হিমালয়ে নয়, মেরুপ্রদেশে আছি।

পারকাচিক হিমবাহ দেখার চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা অনেকক্ষণ মনকে আচ্ছন্ন করেছিল। আমাদের বাস শাফাত পুলিশ চেকপোস্টের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই বাস্তবে ফিরে এলাম। এই চেকপোস্টে বাসের বিদেশি যাত্রীদের কাগজপত্র পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় তথ্য সরকারি খাতায় লিপিবদ্ধ করা হবে। বলা বাহুল্য, একটু সময় লাগবে তাই বাস থেকে নেমে পড়লাম। প্রথমেই যার দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল

সেটি এক চতুষ্পদ প্রাণী। পুলিশতাঁবুর পাশেই দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে একটি ছাগল। যেমন-তেমন ছাগল নয়, এ হল বিখ্যাত পশমিনা ছাগল। এদের বাছাই করা লোম দিয়েই তৈরি হয় বিশ্ববিখ্যাত পশমিনা শাল। ইচ্ছে ছিল এই ভি আই পি ছাগলের পিঠে হাত বুলিয়ে ধন্য হই কিন্তু আমাকে তার পছন্দ হল না। ছাগলের যুদ্ধং দেহি ভাবভঙ্গি দেখে পিছিয়ে এলাম।

শাফাত চেকপোস্টে দাঁড়িয়ে চোখে পড়ছে এক দীর্ঘ নদী উপত্যকা। সুরু নদীর দু-ধারেই তৃণগুল্মহীন রুক্ষ পর্বতশ্রেণী প্রাচীরের মতো দণ্ডায়মান। কয়েকটি গিরিশিখরে এখনও বরফ জমে আছে। পাহাড়ের রং যে কতরকম হতে পারে তা প্রত্যক্ষ করতে হলে লাদাখে আসতেই হবে।

শাফাত চেকপোস্ট থেকে বাস ছাড়ল সাড়ে দশটা নাগাদ। মাত্র আধঘণ্টার পথ পাড়ি দেওয়ার পরেই উপত্যকা ক্রমশ প্রশস্ত হতে আরম্ভ করল। দেখতে দেখতে ছোট-বড় নুড়িপাথরে ভর্তি এই উপত্যকার প্রস্থ গিয়ে দাঁড়াল প্রায় দু-কিলোমিটার। এই উপলাকীর্ণ প্রান্তরের ভেতর দিয়েই অসংখ্য ধারায় বয়ে চলেছে সুরু নদী। বেশ কয়েকটি জায়গায় জলধারা পথ হারিয়ে বদ্ধ জলাশয়ের সৃষ্টি করেছে। এইভাবেই স্থানে স্থানে গড়ে উঠেছে ঘন সবুজ জলাভূমি। রুক্ষ শৈলমালা, উপলখণ্ডময় প্রান্তর, সুরু নদীর শতধারা আর সবুজ জলাভূমি মিলে রচিত হয়েছে এক অপার্থিব প্রাকৃতিক শোভা।

বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ বাস পৌঁছে গেল রংদুম গ্রামের কাছে। কারগিল-পদম বাসপথের যাত্রীরা এখানেই মধ্যাহ্নভোজন সম্পন্ন করে থাকেন। খাবারের সন্ধানে যে তাঁবু-হোটেলে প্রবেশ করলাম তার নামটি বেশ ওজনদার, 'জাঁসকার এক্সপ্রেস গেস্টহাউস'। এখানে যেসব খাবার পরিবেশিত হচ্ছে তার মধ্যে সবচেয়ে সহজপাচ্য এবং নিরাপদ খাদ্যটি হল ম্যাগি নুডলস। প্রতি প্লেট পনেরো টাকা। ম্যাগি আর চা দিয়ে ক্ষুধা নিবৃত্ত করে বাইরে বেরিয়ে এলাম। আমায় দেখতে পেয়ে সহযাত্রী জিগমে দোরজি বলে উঠলেন, ওই দেখুন, দূরে টিলার ওপর রংদুম গুম্ফা দেখা যাচ্ছে। মাত্র পাঁচ বছর আগেই এই রংদুম গুম্ফার নাম সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় উঠে এসেছিল। কাশ্মীরি জঙ্গিদের অতর্কিত হামলায় এই গুম্ফার তিনজন লামা নিহত হয়েছিলেন। সেই ঘটনার পরেই এই অঞ্চলে নিরাপত্তাবাহিনীর তৎপরতা বৃদ্ধি পায়।

বাস ছাড়তে দেরি আছে দেখে অদূরবর্তী লাদাখি গ্রামটি ঘুরে দেখলাম, গ্রামের অধিবাসীরা সবাই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সাদা রঙের চোর্তেন গ্রামের শোভা বাড়িয়েছে। আসন্ন শীতের মোকাবিলা করার জন্য গ্রামবাসীরা এখন যাবতীয় প্রস্তুতি সেরে নিতে ব্যস্ত। ব্যস্ততার মধ্যেও পরদেশি পর্যটকের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে তাঁদের উৎসাহের অভাব দেখলাম না।

রংদুম গ্রাম থেকে রংদুম গুম্ফা পৌঁছতে সময় লাগল পনেরো মিনিট। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত গেলুক পা বা হলুদ টুপি সম্প্রদায়ভুক্ত লামাদের এই গুম্ফাটির অবস্থান সড়কপথ-সংলগ্ন এক পাথুরে টিলার ওপর। গুম্ফার কিছুটা অংশ লালরঙের, বাকিটা সাদা। বাসরাস্তা থেকে চড়াইপথ ধরে গুম্ফা দেখে ফিরে আসতে অনেকটা সময় লাগবে তাই রংদুম গুম্ফার বিখ্যাত মিউজিয়ামটি আমাদের অদেখাই

রয়ে গেল। বাসরাস্তার ধারেই সম্প্রতি একটি তোরণ নির্মিত হয়েছে যার কাছেই তৈরি করা হয়েছে নিহত লামাদের স্মৃতিমন্দির। স্মৃতিফলক দেখে জানা গেল, জঙ্গি হামলার ঘটনাটি ঘটেছিল ১১ জুলাই, ২০০০।

রংদুম গুম্ফা থেকে পেঞ্জি গিরিপথের দূরত্ব ২০ কিলোমিটার। এই পথটির সৌন্দর্য এবং বৈচিত্র মুহূর্তের জন্যও ভ্রমণরসিকদের অন্যমনস্ক হতে দেয় না। রংদুম গুম্ফা ছাড়াতেই অসংখ্য জলধারায় বিভক্ত সুরু নদীর রূপ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হতে থাকল। নিশ্চিন্তমনে নদী-পাহাড়ের শোভা দেখার সুযোগ অবশ্য পেলাম না, কারণ বাস এখন চলেছে মারমটদের এলাকা দিয়ে। পথের দু-ধারেই অসংখ্য গর্ত আর পাথরের ফাঁকফোকর থেকে মুখ বাড়িয়ে আমাদের দেখছে মারমটদের দল। অনেকটা মেঠো ইঁদুরের মতো দেখতে, অথচ তাদের চেয়ে বেশ কয়েকগুণ বড়, খয়েরি রঙের, মোটা লেজওয়ালা এই বিচিত্র প্রাণীটির স্বভাব হল গর্ত থেকে মুখ বাড়িয়ে, দু-পায়ে খাড়া হয়ে চারদিক নিরীক্ষণ করা।

দুপুর দুটো নাগাদ বাস পৌঁছে গেল ১৪,৪০০ ফুট উঁচু পেঞ্জি লা। বাসের জানালা দিয়ে চোখে পড়ছে বেশকিছু তুষারাবৃত গিরিশিখর। বাস থামার আগে সামনের দিকে তাকাতেই দেখি দূরে বিশাল চওড়া এক 'রাজপথ' সোজা উঠে গেছে তুষারাচ্ছন্ন পাহাড়ের কোলে। পুরো পথটিকেই কী কারণে যেন চুনকাম করা হয়েছে। বেশ অবাক হলাম। এই দুর্গম পার্বত্যপ্রদেশে এমন রাজপথ কারা তৈরি করল, কীভাবে তৈরি করল? বাস থেকে নেমে একটু এগিয়ে যেতেই অপার বিস্ময় নিয়ে আবিষ্কার করলাম কোথায় রাজপথ? এ তো এক অনিন্দ্যসুন্দর হিমবাহ। সন্দেহ নেই, কারগিল-পদম বাসযাত্রার শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি হল পেঞ্জি গিরিপথে দাঁড়িয়ে দ্রাং-দ্রুং হিমবাহ দর্শন। সমগ্র লাদাখে সিয়াচেন ছাড়া এমন বিশাল এবং দৃষ্টিনন্দন হিমবাহ আর দ্বিতীয়টি নেই। এই হিমবাহ থেকে সৃষ্টি হয়েছে স্টোড বা ডোডা নদী যা দক্ষিণবাহিনী হয়ে পদম গিয়ে মিলিত হয়েছে লিংটি-সরাপ নদীর সঙ্গে। এই মিলিত জলধারাই জাঁসকার নদী নামে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে সিন্ধু নদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে নিমু গ্রামের কাছে, লে শহর থেকে যার দূরত্ব প্রায় ৩৪ কিলোমিটার।

পেঞ্জি গিরিবর্ত্মে আমাদের বাস দাঁড়িয়েছিল প্রায় পনেরো মিনিট। মিনিটদশেক পরে জিগমে দোরজি জানালেন, বাসে বসে দীর্ঘপথ পাড়ি দেওয়া লাদাখিদের পক্ষে এক পীড়াদায়ক অভিজ্ঞতা। শরীরকে স্বস্তি দিতে উনি আরও কয়েকজন লাদাখি যাত্রীর সঙ্গে পাকদণ্ডি পথ ধরে তরতর করে নেমে যাবেন পেঞ্জি লা পর্বতপ্রাচীরের পদপ্রান্তে অবস্থিত পুলিশ ক্যাম্পে। আমাদের বাস শম্বুকগতিতে ঘুরপথ ধরে যখন সেই জায়গায় পৌঁছবে তাঁরা আবার বাসে উঠে পড়বেন। দোরজির পরিকল্পনা শুনে আমি তো অবাক। দোরজি তাঁর পাঁচজন লাদাখি সঙ্গী সহ উতরাইপথ ধরলেন আর আমি উদ্যোগী হলাম বাসচালকের সঙ্গে ভাব জমাতে।

বাসচালক গুলাম মহম্মদ তো আমাকে পেয়ে আহ্লাদে আটখানা। তাঁর আনন্দের কারণ আছে বৈকি! আমাদের এই বাসেই চলেছেন জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য পরিবহণদপ্তরের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার। উনি প্রধানত বেড়াবার উদ্দেশ্যেই পদম চলেছেন কিন্তু সঙ্গীর অভাবে বেড়ানোর আনন্দ পুরোপুরি উপভোগ করতে

পারছেন না বলেই বাসচালক গুলাম মহম্মদের দৃঢ় বিশ্বাস। বাসচালকের মাধ্যমে পরিচিত হলাম মাঝবয়সী সোহেল আলি খানের সঙ্গে। সঙ্গীহীন দুই মুসাফিরের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠতে দেরি হল না। সোহেল সাহেবের উদ্যোগে আমার স্থান হল ড্রাইভারের কেবিনে, ফলে যাত্রাপথের শোভা আরও ভালোভাবে চাক্ষুষ করার সুযোগ পেলাম।

পেঞ্জি লা থেকে বাস গড়গড় করে শুধু নেমেই চলল। একেকটা বাঁকে এসে দ্রাং-দ্রুং হিমবাহ নব নব রূপে দৃষ্টিপথে ধরা দিল। ঘন নীল আকাশের নীচে তুষারাবৃত পর্বতশিখর সাদা বরফে ঢাকা অপরূপ গ্লেসিয়ার আর নানা রঙের পাহাড় দেখছিলাম মোহাবিষ্ট হয়ে। চমক ভাঙল কন্ডাক্টরের ডাকে। তাঁর দিকে ফিরতেই তিনি আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন ধূমায়িত চায়ের গ্লাস।

দীর্ঘ উতরাই পথ একসময় শেষ হল পুলিশ ক্যাম্পে এসে। দোরজি এবং তাঁর সঙ্গীরা আমাদের আগেই এখানে এসে পৌঁছে গেছেন। পাকদণ্ডিপথের মহিমা আবার আরেকবার প্রত্যক্ষ করলাম। এখন আমাদের বাস চলেছে প্রায় সমতলভূমির ওপর দিয়ে। সামনে চোখে পড়ছে এক বিস্তৃত উপত্যকা। বাসপথের বাঁদিকেই ডোডা নদী বয়ে চলেছে উচ্ছল তরঙ্গে। একটু পরেই পেরিয়ে গেলাম আবরান গ্রাম। এখানকার সুন্দর পূর্তবিভাগের বাংলোটিকে দেখে মনে হয়, আহা, এখানে যদি একটা দিন থাকা যেত!

বাস যত এগিয়ে চলেছে, নদী উপত্যকা ততই প্রশস্ত হচ্ছে। চলার পথে চোখে পড়ছে ছোট ছোট লাদাখি গ্রাম। গ্রামবাসীরা এখন শস্য ঝাড়াইয়ের কাজে ব্যস্ত। বেলা চারটে নাগাদ বাস পৌঁছল স্কাগুম গ্রামে। এখানে বেশ কিছু যাত্রী উঠলেন নানা ধরনের বোঁচকা-বুচকি নিয়ে। একজন লাদাখি মহিলার পিঠে তাঁর ঘুমন্ত ছোট্ট শিশুটি চাদর দিয়ে বাঁধা। আরেকজন মহিলাযাত্রী ছাগলছানা কোলে নিয়ে উঠেছেন। একজন বিদেশিনী তাঁর কাছ থেকে ছাগশিশুটিকে চেয়ে নিলেন।

স্কাগুম থেকে আটিং চেকপোস্ট পৌঁছতে সময় লাগল মাত্র আধঘণ্টা। এখানেও বিদেশি যাত্রীদের কাগজপত্র পরীক্ষা করা হল। আটিং ছাড়াবার পরেই চোখে পড়ল সামনেই রয়েছে এক সুবিশাল সমতল উপত্যকা। বেশ বুঝতে পারলাম এটাই হল বিশ্ববিখ্যাত জাঁসকার উপত্যকা। আটিং ছাড়িয়ে আরও কিছুদূর যাওয়ার পর তৃণগুল্মহীন পাহাড়-প্রান্তর দেখে দেখে ক্লান্ত চোখ জুড়িয়ে গেল বিস্তৃত এক জলাভূমির দর্শনলাভ করে। প্রাকৃতিক কোনও কারণে ডোডা নদীর স্রোত হঠাৎ মন্দীভূত হয়ে সৃষ্টি করেছে এই সবুজ জলাভূমি। ডোডা নদী এই সমতল প্রান্তরে বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত। দুটি ধারার মধ্যবর্তী স্থলভাগ ভেলভেটসদৃশ তৃণে সবুজ হয়ে আছে। কোথাও আবার জল জমে জলাশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। জলের ওপর কাঠের খুঁটিতে প্রার্থনাপতাকা পতপত করে উড়ছে। বাসচালক জানালেন, এই পবিত্র জলাশয়টি অদূরবর্তী বিখ্যাত সানি গুম্ফার অধিকারভুক্ত।

সানি গুম্ফা থেকে পদম শহরের দূরত্ব ৯ কিলোমিটার। অর্ধেক দূরত্ব অতিক্রম করার পরই যে দৃশ্যটি আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল তা এককথায় চমকপ্রদ। প্রথমেই মনে হল, হিমালয়ের অন্দরমহলে যে এমন এক বিশাল সমতল ভূখণ্ড

থাকতে পারে তা কল্পনা করাও কঠিন। এই বিশাল এলাকাটিকে ঘিরে আছে উত্তুঙ্গ পর্বতশ্রেণী। বাস এখন সোজা পথ ধরে চলেছে তাই স্টিয়ারিং হাতে নিয়েও চালক গুলাম মহম্মদ দিব্যি গাইডের ভূমিকা পালন করে গেলেন। তাঁর সৌজন্যেই জানতে পারলাম ওই দূর পাহাড়ের কোলে যে একগুচ্ছ ঘরবাড়ি দৃষ্টিগোচর হচ্ছে সেখানেই রয়েছে ঐতিহাসিক কার্ষা বৌদ্ধমঠ এবং গুম্ফা। এইভাবেই দূর থেকে চিনে নিলাম পিবিতিং বৌদ্ধমন্দির, প্রাচীন পদম প্যালেস, পদম মসজিদ এবং ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন গ্রামের হদিশ।

আমাদের বাস পদম পৌঁছল সন্ধে ছ-টা নাগাদ। সোহেল আলি খানের সঙ্গে আমার আলাপের সূত্রপাত মাত্র চারঘণ্টা আগে হলেও ইতিমধ্যে আমাদের মধ্যে কত বিষয়ে, কত কিছু নিয়েই না কথা হয়েছে। আলাপচারিতার মধ্য দিয়েই বেরিয়ে এসেছে এক আকর্ষণীয় তথ্য। পদম শহরে আমার থাকার কথা পর্যটনদপ্তরের বাংলোর এক দ্বিশয্যাবিশিষ্ট ঘরে আর সোহেল সাহেব থাকবেন এক বেসরকারি গেস্টহাউসের দ্বিশয্যাবিশিষ্ট কক্ষে। আমরা ঠিক করলাম যেখানে থাকার ব্যবস্থা বেশি ভালো সেখানেই আমরা দুজনে একসঙ্গে থাকব। পদম শহরে ঢোকার মুখেই ট্যুরিস্ট বাংলো। বাস থেকে নেমে প্রথমে সেখানেই গেলাম। থাকার ব্যবস্থা ভালোই, তবে সমস্যা হল রাঁধুনি আজ বাড়ি গেছে। ইতিমধ্যে বাস ড্রাইভার গুলাম মহম্মদ সব যাত্রীকে নামিয়ে দেওয়ার পর খালি বাস নিয়ে আবার ফিরে এসেছেন ট্যুরিস্ট বাংলোয়। তাঁর বাসে চেপেই আমরা পৌঁছে গেলাম মন্ট ব্লাঙ্ক গেস্টহাউসে। নবনির্মিত এই হোটেলটিতে থাকার ব্যবস্থা আধুনিক এবং আরামপ্রদ। হোটেলের লাদাখি মালিক সপরিবারে একতলায় থাকেন, অতিথিদের থাকার ব্যবস্থা দোতলায়।

গেস্টহাউসের যে ঘরটিতে আমরা প্রবেশ করলাম তার পূর্ব এবং দক্ষিণদিকে দুটি বিশাল কাচের জানালা। পর্দা সরালে ঘরে বসেই জাঁসকার উপত্যকার শোভা উপভোগ করা যায়। বাথরুম থেকে হাতমুখ ধুয়ে বেরিয়ে এসেই দেখি টেবিলে চা এবং কেক-বিস্কুট রাখা আছে। সোহেলের কাছে হোটেলের রুম সার্ভিসের প্রশংসা করতেই উনি জানালেন, এরজন্য পুরো কৃতিত্বের দাবিদার হলেন বাসের তরুণ কন্ডাক্টর আসলম এবং চালক গুলাম মহম্মদ।

জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য পরিবহণ নিগমের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার সোহেল আলি খানের পদম সফর যাতে মসৃণ এবং আরামপ্রদ হয় তার জন্য কারগিলের ডিপো ম্যানেজার গুলাম মেহদি কারগিল-পদম রুটের সেরা বাসকর্মীদের কাজে লাগিয়েছেন। বাসচালক গুলাম মহম্মদ যে একজন রন্ধনশিল্পী তা আমার কোনওদিন জানা হত না যদি না ঘটনাচক্রে আমি সোহেল সাহেবের সঙ্গী হতাম। গেস্টহাউসের সামনে দাঁড় করানো বাসের ভেতরেই রয়েছে রান্নার স্টোভ, বাসনপত্র, রসদ এবং অন্যান্য উপকরণ। সেখানেই ভেজিটেবল পোলাও আর চিকেনকারি তৈরি করে নিয়ে আসা হল রাত নটা নাগাদ। হটপটের ঢাকনা খুলতেই যে সুগন্ধ নাকে এসে ধরা দিল তাতে জঠরানল দাউদাউ করে জ্বলে উঠল।

দীর্ঘ বাসযাত্রার ক্লান্তি আর তৃপ্তিকর ভোজনের সৌজন্যে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে বাধ্য হলাম।

ঘুম ভাঙার পর গেস্টহাউসের ছাদে উঠে চারপাশের জগৎটাকে ভালোভাবে দেখার ইচ্ছে হল। ছাদে উঠে দেখি এক লাদাখি যুবক লেপ-কম্বল রোদে দিচ্ছে। আমাকে দেখেই সে অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে এগিয়ে এসে চোস্ত ইংরিজিতে নিজের পরিচয় দিয়ে জানাল, গতকাল কার্ষা থেকে ফিরতে রাত হয়ে গিয়েছিল বলে সে আমাদের আর বিরক্ত করেনি। যুবকটির নাম পাঞ্চোক তাশি। এই গেস্টহাউসটি তার উদ্যোগেই চালু হয়েছে। খাতায়-কলমে মালিক অবশ্য তার পিতা। তাশি জাঁসকার অঞ্চলের একজন নামকরা ট্রেকিং গাইড এবং অ্যাডভেঞ্চার ট্যুর ব্যবস্থাপক। পেশার সূত্রে ইতিমধ্যেই তার ইউরোপের একাধিক দেশ ঘোরা হয়ে গেছে। পদমকে কেন্দ্র করে যেসব ট্রেকিং রুট চারদিকে ছড়িয়ে আছে সেই বিষয়ে বেশকিছু তথ্য পাওয়া গেল তাশির কাছে। তাশি জানাল, জাঁসকার এলাকায় বেড়াতে এলে একটু কষ্ট স্বীকার করে অবশ্যই ফুগতাল গুম্ফায় যাওয়া উচিত। সমগ্র লাদাখে এমন বিচিত্রদর্শন বৌদ্ধমঠ এবং মন্দির আর দ্বিতীয়টি নেই। কথায় কথায় তাশি জানাল, বছরের ঠিক এই সময়টাই শীত সবচেয়ে কম। আর দিনপনেরো পরে এলেই এই সাতসকালে ছাদে উঠে গল্প করা আমার পক্ষে সম্ভব হত না। তাশির আশা, পদম থেকে লে পর্যন্ত সড়কপথ তৈরির কাজ শেষ হলে পর্যটন মানচিত্রে পদম শহরের গুরুত্ব অনেকটাই বেড়ে যাবে।

কেক-বিস্কুট আর কফি দিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে আমি আর সোহেল আলি অদূরবর্তী প্রাচীন পদম রাজবাড়ি আর পদম গুম্ফার দিকে হাঁটতে লাগলাম। পথে পড়ল পদম মসজিদ। দৃষ্টিনন্দন এই মসজিদটি দেখেই বোঝা যায় যে, তৈরির সময় পারস্যের স্থাপত্যশৈলীকে বেশ যত্নের সঙ্গেই অনুসরণ করা হয়েছে। মসজিদের পুরো ছবি তোলার জন্য বাধ্য হয়ে মসজিদসংলগ্ন চাষের জমিতে গিয়ে দাঁড়াবার পর দেখি মাঠভর্তি গঙ্গাফড়িং। এদের গায়ের রং কিন্তু সবুজ নয়, হালকা খয়েরি। একটি পতঙ্গকে খপ করে ধরে ভালো করে দেখতেই আবিষ্কার করলাম গঙ্গাফড়িং কোথায়! এ তো নির্ভেজাল পঙ্গপাল। পরে জেনেছিলাম কয়েক বছর পর পরই পঙ্গপালের দৌরাত্ম্যে লাদাখি চাষিদের বেশ সমস্যায় পড়তে হয়।

পদম প্যালেস এবং প্রাচীন গুম্ফা একটি ছোট টিলার ওপর অবস্থিত। ওপরে উঠে দেখি প্রাচীন রাজবাড়ি এখন কয়েকজন ভবঘুরের আশ্রয়স্থল। রাজবাড়ির বেশিরভাগ অংশই ভাঙাচোরা অবস্থায় রয়েছে। কাছেই রয়েছে ছোট আকারের পদম গুম্ফা। গুম্ফার অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো। গুম্ফার সদর দরজায় তালা ঝোলানো, তাই ভেতরে কী আছে, কেমন অবস্থায় আছে জানা গেল না। পদম প্যালেস দেখে হতাশ হলাম বটে কিন্তু উচ্ছ্বসিত হলাম টিলার ওপর থেকে চারপাশের দৃশ্য দেখে। টিলার খুব কাছ দিয়েই প্রবলবেগে বয়ে চলেছে লিংটি-সরাপ নদী। টিলার কাছেই রয়েছে প্রাচীন পদম গ্রাম। গ্রামের অধিবাসীদের নানান কর্মকাণ্ড দেখতে বেশ ভালোই লাগছিল। টিলা থেকে নেমে এবার আমরা চলেছি পদম বাজারের দিকে। এই এলাকাটি মাত্র এক দশক হল আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রধান সড়কপথের দু-দিকেই পরপর দোকান, হোটেল, রেস্তোরাঁ, সরকারি দপ্তর আর লাদাখি গেস্টহাউসের ছড়াছড়ি। প্রচুর বিদেশি পর্যটক চোখে পড়ছে। দেখেই বোঝা যায় লাদাখ ভ্রমণ এঁরা

বেশ ভালোভাবেই উপভোগ করছেন। একটি দোকানে বিদেশিদের ভিড় দেখে কৌতূহলবশত এগিয়ে গিয়ে দেখি সেটি এক কিউরিও শপ। বিদেশি পর্যটকদের বিশেষ নজর পাথরের তৈরি লাদাখি অলঙ্কারের দিকে। দাম শুনলে মধ্যবিত্ত বাঙালি চমকে উঠবেন। আকাশি রঙের পাথর দিয়ে তৈরি একটা মালা বিক্রি হল বারো হাজার টাকায়।

বেশ লাগছিল দুজনে মিলে উদ্দেশ্যহীন হয়ে পদম শহরে ঘোরাঘুরি করতে। সোহেল আলি খান স্বীকার করে নিলেন যে অনেক বছর পর এমন নিশ্চিন্তমনে, সর্বপ্রকার চাপমুক্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবার সুযোগ পেয়েছেন।

মধ্যাহ্নভোজন সম্পন্ন করে বেলা একটা নাগাদ টাটা সুমোয় চেপে আমরা রওনা দিলাম সানি গুম্ফার দিকে। সুমোচালক ৬০০ টাকার বিনিময়ে আমাদের সানি গুম্ফা, পিবিতিং বৌদ্ধমন্দির আর কার্ষা মনাস্ট্রি ঘুরিয়ে নিয়ে আসবে।

পদম থেকে ৯ কিলোমিটার দূরবর্তী সানি গুম্ফা পৌঁছতে খুব বেশি সময় লাগল না। লাদাখের প্রায় সব গুম্ফাই হয় পাহাড়ের কোলে নতুবা ছোট-বড় টিলার ওপর অবস্থিত। উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম শুধু আলচি গুম্ফা আর এই সানি গুম্ফা। এদের অবস্থান সমতলভূমির ওপর। বাইরে থেকে সানি গুম্ফাকে দেখে খুব বেশি প্রাচীন বলে মনে হল না। প্রবেশপথ তালাবন্ধ দেখে হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। আমাদের সুমোচালক কোথা থেকে এক তরুণ লামাকে খুঁজে নিয়ে এসে হাজির করল। গুম্ফার ভেতরে বেশ অন্ধকার, যদিও বেশ কয়েকটি ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে বুদ্ধমূর্তির সামনে। তরুণ লামাটি জানালেন, গুম্ফায় বিদ্যুৎসংযোগ আছে বটে কিন্তু এই মুহূর্তে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ আছে। স্বল্পালোকেই চোখে পড়ল প্রধান বুদ্ধমূর্তির কাছাকাছি রয়েছে পদ্মসম্ভব, মহাকাল এবং অন্যান্য বৌদ্ধ ধর্মগুরুদের মূর্তি। একটি মূর্তি দেখলাম কাপড় দিয়ে ঢাকা। জানা গেল, এই মূর্তিটি প্রসিদ্ধ যোগী নারোপা-র। প্রতিবছর জুলাই মাসের শেষদিকে সানি গুম্ফায় নারো-নাসজাল উৎসব পালিত হয়। একমাত্র এই উৎসব উপলক্ষেই যোগী নারোপার ব্রোঞ্জমূর্তি জনসমক্ষে প্রদর্শিত হয়। সানি গুম্ফার ভেতরে আর যা যা চোখে পড়ল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দেওয়ালচিত্র, প্রাচীন থাংকা, তিব্বতি ঢাক, পুজোর নানারকম উপকরণ, কাঠের মুখোশ এবং সিল্কের কাপড়ে বাঁধা বেশকিছু প্রাচীন পুঁথি। সানি গুম্ফার পিছনদিকে রয়েছে এক অতি প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপ। এই স্তূপটি 'কণিকাস্তূপ' নামে পরিচিত। সানি গুম্ফার লামাদের মতে, এই স্তূপটি কণিষ্কের আমলের। তাঁর রাজত্বকালে এখানেই নাকি এক বৌদ্ধ ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। স্তূপটি দেখেই বোঝা যায় যে এটি অতি প্রাচীন। স্তূপ দেখে লামার সঙ্গে গিয়ে প্রবেশ করলাম অপ্রশস্ত কিন্তু বেশ লম্বা একটি ঘরে। এখানে চোখে পড়ল কিছু অসাধারণ ফ্রেস্কো পেইন্টিং। কালের প্রভাবে এবং যত্নের অভাবে বেশ কয়েকটি দেওয়ালচিত্র নষ্ট হয়ে গেছে দেখে মন খারাপ হয়ে গেল।

সানি গুম্ফার অনতিদূরেই সম্প্রতি একটি নতুন চোর্তেন নির্মিত হয়েছে। চোর্তেনের কাছেই বেশকিছু প্রস্তরখণ্ড রাখা আছে যাতে বিভিন্ন দেবদেবীর অবয়ব খোদাই করা আছে। এইসব প্রস্তর কোথা থেকে সংগৃহীত হয়েছে তার উত্তর লামার কাছে পাওয়া গেল না।

সানি গুম্ফা দেখে পৌঁছে গেলাম সেই জলাভূমিতে, গতকাল বাসের জানালা দিয়ে যার শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। সুমোচালকের উৎসাহে প্যান্ট গুটিয়ে আমি আর সোহেল নেমে পড়লাম গোড়ালি ডোবা জলে। বরফের মতো ঠান্ডা জলে বেশিক্ষণ দাঁড়ানো অসম্ভব হয়ে পড়ল। তার মধ্যেই চোখে পড়ল জলধারায় ভেসে চলেছে ছোট-বড় ট্রাউট মাছ। চারদিকের রুক্ষতার মাঝে এই সবুজ জলাভূমি সত্যি যেন এক প্রাকৃতিক বিস্ময়।

এবার আমরা চলেছি পিবিতিং বৌদ্ধমন্দির। টিলার ওপরে এই বৌদ্ধমন্দিরটি পদম শহরের এক বিখ্যাত 'ল্যান্ডমার্ক'। গাড়ি গিয়ে পৌঁছে গেল টিলার ওপর। কিছুটা পথ হেঁটে প্রবেশ করলাম মন্দির পরিসরে। এই ছোট্ট বৌদ্ধমন্দিরটির প্রাঙ্গণে রয়েছে এক বিশাল ধাতুনির্মিত দণ্ড যার মধ্যে বাঁধা রয়েছে অসংখ্য প্রার্থনাপতাকা। বুদ্ধমূর্তির কাছেপিঠের দেওয়ালে নানারকম ছবি আঁকা রয়েছে তবে দেখেই বোঝা যায় এই ছবির বয়স বেশি নয়। মন্দিরের বারান্দা থেকে পদম শহরের পুরো এলাকাটিই স্পষ্ট দেখা যায়।

পিবিতিং দেখে এবার আমাদের গন্তব্য কার্ষা গুম্ফা। কার্ষা হল সমগ্র জাঁসকার অঞ্চলের বৃহত্তম বৌদ্ধমঠ। বর্তমানে এখানে প্রায় ১৫০ জন লামা রয়েছেন। এই লামারা হলেন গেলুক পা বা হলুদ টুপি সম্প্রদায়ভুক্ত। কার্ষা মঠের প্রধান উৎসবটি হল গাস্টর, অনুষ্ঠিত হয় জুলাই মাসের প্রথমদিকে। উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় লামাদের মুখোশনৃত্য। পিবিতিং থেকে কার্ষা গুম্ফার দূরত্ব সাত কিলোমিটার। অর্ধেক দূরত্ব অতিক্রম করার পর ডোডা নদীর ব্রিজের কাছে গিয়ে দেখি পরপর বেশ কয়েকটি টাটা সুমো দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিটি গাড়িতেই বিদেশি পর্যটকরা রয়েছেন। জানা গেল, ব্রিজের ওপর একটি বড় ট্রাক খারাপ হয়ে পড়ে আছে। কখন ক্রেন আসবে, কতক্ষণে ব্রিজের ওপর দিয়ে যান চলাচল আরম্ভ হবে, কেউ কিছু বলতে পারছে না। আমাদের চালক জানাল, অন্য পথ ধরে কার্ষা গেলে পদমে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে। অগত্যা আজকের মতো কার্ষা যাওয়ার বাসনা ত্যাগ করতে হল। বেশ মন খারাপ নিয়েই গেস্টহাউসে ফিরে গেলাম।

মন ভালো হয়ে গেল সন্ধেবেলায় পাঞ্চোক তাশির ঘরে চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে। জাঁসকারবাসী এক লাদাখি পরিবারের মধ্যে তিনঘণ্টা সময় কী আনন্দেই না কাটল! কত কী দেখলাম আর কত কিছুই না শুনলাম। যে ঘরটিতে আমাদের নিয়ে গিয়ে বসানো হল সেটি একাধারে পরিবারের ড্রয়িংরুম, ডাইনিংরুম, বেডরুম এবং শীতকালের আশ্রয়স্থল। ঘরে বসার জন্য কোনও চেয়ার নেই। তার বদলে পুরু কার্পেটের আসন পরপর পাতা আছে। তিনটি আসনের সামনে রয়েছে একটি করে লম্বা, নিচু টেবিল। এই টেবিল নানাভাবে ব্যবহৃত হয়। ঘরে ঢুকে প্রথমেই যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল পরিবারের বাসনপত্র রাখার জায়গাটি। হঠাৎ দেখলে মনে হয় কোনও দোকানে বিক্রির জন্য বাসনপত্র সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

পাঞ্চোক তাশির বাবার কাছে আমি আর সোহেল আলি খান নিবিষ্টমনে শুনছিলাম কীভাবে এই ঘরটিকে শীতকালীন আশ্রয়স্থল রূপে প্রস্তুত করা হয়। প্রস্তুতির মধ্যে কোনও ত্রুটি থাকলে পরে সমস্যায় পড়তে হয়।

পাঞ্চোক তাশির ম্যাট্রিক পাশ করা বউ দোলমা হিন্দি বলে চমৎকার। এছাড়া গেস্টহাউস চালানোর প্রয়োজনে কাজচালানো ইংরিজি এবং ফ্রেঞ্চ ভাষাও আয়ত্ত করে নিয়েছে। হাসিখুশি বউটি শাশুড়িকে সঙ্গে নিয়ে চটপট মোমো তৈরি করে আমাদের সামনে হাজির করল। গৃহবধূর এই তৎপরতা দেখে ঘরের যে মানুষটি সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হলেন বলে আমার মনে হল, তিনি হলেন দোলমার শ্বশুরমশাই।

মোমো সহযোগে কফি খেতে খেতে আড্ডা বেশ জমে উঠল। কত বিষয়েই না কথা হল, যেমন 'আলচি' তিব্বতি চিকিৎসাপদ্ধতি, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লাদাখিদের জীবনে গুম্ফা এবং লামাদের প্রভাব, লাদাখিদের সমাজব্যবস্থা, বিবাহপদ্ধতি, পণপ্রথা, পরিবারের মহিলাদের ভূমিকা এবং লাদাখিদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড।

আড্ডা একসময় শেষ হল। মনে একরাশ তৃপ্তি নিয়ে ফিরে গেলাম নিজেদের ঘরে। কার্যা গুম্ফা যেতে পারিনি তো কী হয়েছে! এক লাদাখি পরিবারের অন্দরমহলে পৌঁছতে পারাও তো কম কথা নয়।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

পদম যেতে হলে প্রথমে কারগিল পৌঁছতে হবে। শ্রীনগর এবং লে, দু-দিক দিয়েই কারগিল যাওয়া যায়। শ্রীনগর থেকে কারগিলের দূরত্ব ২০৪ কিলোমিটার আর লে থেকে কারগিল ২৩০ কিলোমিটার। কারগিল থেকে পদমগামী সরকারি বাস একদিন পরে পরে ছাড়ে। বাস ছাড়ে রাত সাড়ে তিনটের সময় এবং পদম পৌঁছয় ১৫ ঘণ্টা পরে। বাসভাড়া ৩০০ টাকা। কারগিল থেকে পদমের দূরত্ব ২৩৬ কিলোমিটার। এছাড়া কারগিল থেকে টাটা সুমো ভাড়া করেও পদম যাওয়া যাবে। ভাড়া নির্দিষ্ট নয়, দরদাম করার অবকাশ আছে।

কোথায় থাকবেন

কা র গি লে

ট্যুরিস্ট বাংলো (প্রাইভেট বাসস্ট্যান্ডের কাছে) ☎২৩২৭২১, ২৩২২১৬, **হোটেল গ্রিনল্যান্ড** (☎২৩২৩২৪), **হোটেল ট্যুরিস্ট মার্জিনা** (☎৯৪১৯১-৭৭১৫৫), **হোটেল সিয়াচেন** (☎২৩২৩২১, ২৩৩০৫৫), **হোটেল ইয়াকটেল, হোটেল থাইল্যান্ড**।

কারগিলের এস টি ডি কোড: ০১৯৮৫।

প দ মে

ট্যুরিস্ট বাংলো: বুকিং দেবেন কারগিলের ট্যুরিস্ট অফিস (☎০১৯৮৫-২৩২৭২১/২৩২২১৬)।

Mont Blanc Guest House (☎245056), **Hotel Ibex** (☎245012), **Hotel Haftal View, ChangThang Hotel** (☎245166)

পদমের এস টি ডি কোড: ০১৯৮৩।

কখন যাবেন

পদম ভ্রমণের মরসুম মধ্য জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস। সেরা সময় জুলাই মাস।

'ভ্রমণ' ফেব্রুয়ারি ২০০৬

বিশ্বের বৃহত্তম নদীদ্বীপ মাজুলি

কোহিমার হর্নবিল উৎসবে হাজিরা দিয়ে এখন চলেছি মাজুলি দ্বীপে। ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর এই দ্বীপটি পৃথিবীর বৃহত্তম নদীদ্বীপ বলে স্বীকৃত। গুয়াহাটি থেকে মাজুলি যেতে হলে প্রথমে গিয়ে পৌঁছতে হবে জোরহাট শহরে। কোহিমা থেকে সরাসরি জোরহাট যাওয়ার কোনও ব্যবস্থা নেই। তাই ৫ ডিসেম্বর, ২০০৫ কোহিমা থেকে শেয়ার ট্যাক্সির যাত্রী হয়ে সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ পৌঁছে গেলাম ডিমাপুর। উত্তর-পূর্ব ভারতে গুয়াহাটির পরেই সড়কপথের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জংশন হল ডিমাপুর। ডিমাপুর থেকে জোরহাট যাওয়ার বেসরকারি সাধারণ বাস ছাড়ল সকাল নটায়। ডিমাপুর শহর ছাড়িয়ে অল্পদূর যেতেই আসামের কার্বি আংলং জেলার এলাকা আরম্ভ হল। এই অঞ্চলটিতে গত কয়েক মাস ধরে কার্বি এবং ডিমাসা সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল জাতিদাঙ্গা চলছে। ইদানীং সন্ধের পর বাস চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। এই মুহূর্তে ৩৯ নম্বর জাতীয় রাজপথ ধরে যেতে যেতে বাসের জানালা দিয়ে যা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে তা অবশ্য হিংসার ছবি নয়, পরিপূর্ণ শান্তির ছবি। সবুজ চা-বাগান, পাকা ধানে ভরা মাঠ, শাক-সবজির বাগানে ঘেরা গৃহস্থ বাড়ি— এইসব দেখতে দেখতেই একে একে পেরিয়ে গেলাম খটখটি, বোকাযান, বালিপাথার, দেওপানি আর সিলোনিযান। এর পরেই আরম্ভ হল গভীর অরণ্য। এই জঙ্গলটি এখন Nambor Doigrung Wild Life Sanctuary নামে পরিচিত। জঙ্গল শেষ হল গরমপানি এসে, গরমপানি ছাড়িয়ে কিছুদূর গিয়ে পথ দুভাগ হয়েছে। বাঁদিকের পথ ধরলে এখান থেকে কাজিরাঙার দূরত্ব ৬৪ কিলোমিটার আর গুয়াহাটির দূরত্ব ২৮১ কিলোমিটার। আমাদের বাস ডানদিকের পথ ধরল। এই পথটিই গেছে আট কিলোমিটার দূরবর্তী গোলাঘাট হয়ে জোরহাট।

ধানসিড়ি নদী তীরবর্তী গোলাঘাট বেশ বড় জনপদ। বেশকিছু দোকানে দেখলাম বেতের তৈরি দৃষ্টিনন্দন আসবাবপত্র বিক্রি হচ্ছে। শহরের প্রাইভেট বাসস্ট্যান্ডে বেশ কিছুক্ষণ বাস দাঁড়িয়ে রইল। বাসের জানালা দিয়েই কৌতূহল নিয়ে চেয়ে রইলাম আসামের এক জেলাসদরের বহমান জীবনযাত্রার দিকে। ফলের দোকানে ঝুড়ি ঝুড়ি কমলালেবু রাখা আছে। এই লেবু এসেছে নাগা পাহাড়ের ওখা জেলা থেকে। বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন সবকটি দেওয়াল অসমিয়া সিনেমার পোস্টারে পোস্টারে ঢাকা পড়ে গেছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পোস্টারে যে ছবিটি বিজ্ঞাপিত হয়েছে তার নাম 'মনলৈ ব'হাগ'।

বেলা বারোটা নাগাদ ভর্তি যাত্রী নিয়ে আমাদের বাস আবার রওনা দিল জোরহাটের দিকে। বাসের প্রাপ্তবয়স্ক প্রায় সব যাত্রীই পান চিবুচ্ছে। নাকে এসে লাগছে পান আর কাঁচা সুপুরির ঝাঁঝালো গন্ধ। পান খাওয়ার ব্যাপারে আসামবাসীরা ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কতরকমের পান আর কতরকমের সুপুরিই না বিক্রি হচ্ছে এখানকার পানের দোকানে।

গোলাঘাট থেকে বাস ছাড়ার পরেই ব্যাগ থেকে ম্যাপ বার করে সড়কপথের মানচিত্র দেখে বোঝার চেষ্টা করলাম ঠিক কোন পথ দিয়ে এই বাস চলেছে জোরহাট। রোড ম্যাপ দেখে বোঝা গেল এই সড়কপথটি উত্তরদিকে এগিয়ে গিয়ে আসাম ট্রাঙ্ক রোডের (NH-37) সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই জায়গাটির নাম দেরগাঁও। গোলাঘাট থেকে দেরগাঁও যেতে সময় লাগল চল্লিশ মিনিট। চলার পথে পেরিয়ে এলাম ঢেকিয়াল চারিয়ালি, গনকপুখুরি আর কুরালগুড়ি। এই এলাকার মাটি যে সুজলা-সুফলা তা মাঠভর্তি সোনার ফসল দেখেই বোঝা যায়। দেরগাঁও থেকে জোরহাট যাওয়ার পথে চোখে পড়ল একের পর এক চা-বাগান। চা-বাগানের জন্যই জোরহাট জেলার দেশজোড়া খ্যাতি।

দুপুর সওয়া একটা নাগাদ আমাদের বাস গিয়ে পৌঁছল জোরহাট শহরে। বাস থেকে নেমে একটা সাইকেল রিকশা নিয়ে একটু খোঁজাখুঁজি করতেই পেয়ে গেলাম মনের মতো এক হোটেল। হোটেল লিমাতে একশয্যাবিশিষ্ট বাথরুম সংলগ্ন ঘরের জন্য আমায় দিতে হল ১২০ টাকা। হোটেলটির অবস্থান বেশ সুবিধেজনক। এখান থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে প্রাইভেট বাসস্ট্যান্ড, যেখান থেকে কাল সকালে আমি নিয়ামতি ঘাট যাওয়ার বাস ধরব। হোটেল থেকে আসাম সরকারের ট্যুরিস্ট অফিসও খুব একটা দূরে নয়।

মধ্যাহ্নভোজন সেরে সোজা গিয়ে উপস্থিত হলাম পর্যটন দপ্তরে। মাজুলি সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া গেলেও মাজুলি দ্বীপ থেকে নর্থ লখিমপুর যাওয়ার ব্যাপারে জোরহাটের পর্যটন দপ্তর বিস্তারিতভাবে কিছু জানাতে পারলেন না।

জোরহাট শহরে আমার বিকেল এবং সন্ধ্যাটি কাটল ভারি আনন্দে। এস টি ডি বুথের মালিক নীলেন্দু দে, 'মনোরমা সুইটস'-এর তরুণ কর্ণধার সঞ্জয় রায়, কেক-প্যাস্ট্রি দোকানের আমিন ইসলাম আর 'Friends' ভোজনালয়ের প্রফুল্ল সইকিয়ার অমূল্য সাহচর্যে মুহূর্তের জন্যও অনুভব করলাম না সঙ্গীহীন ভ্রমণের নিঃসঙ্গতা।

মনে একরাশ আনন্দ নিয়ে রাত আটটা নাগাদ ফিরে চললাম হোটেলে। সেখানে গিয়ে দেখি রিসেপশন কাউন্টার সামলাচ্ছেন এক প্রিয়দর্শী হাসি-খুশি যুবক। আলাপ হওয়ার পর উৎপল শর্মা যেই জানতে পারলেন যে আমি আগামীকাল মাজুলি যাচ্ছি, অথচ সেখানে রাত্রিবাসের কোনও ব্যবস্থা আমি করে উঠতে পারিনি, উনি সঙ্গে সঙ্গে নিজের মোবাইল ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করলেন মাজুলি দ্বীপের নতুন কমলাবাড়ি সত্র গেস্টহাউসের দায়িত্বে থাকা ওঁর এক পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে। মাজুলি দ্বীপে থাকা নিয়ে আমার সব চিন্তা দূর হয়ে গেল।

উৎপল শর্মাকে ব্যবসার প্রয়োজনে মাঝেমধ্যেই মাজুলি দ্বীপে যেতে হয়। মাজুলি সম্পর্কে আমার যাবতীয় কৌতূহল মেটাবার চেষ্টা করলেন তাঁর সাধ্যমতো। সবশেষে

আমাকে মাজুলি নিয়ে একটি তথ্যপুস্তিকা দিলেন পড়ার জন্য।

হোটেলের ঘরে বসে বইটি মনোযোগ সহকারে পড়ার পর মনে হল, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে এমন একটি তথ্যবহুল পুস্তিকা আমার হাতে এসে পড়া, এ যেন এক অলৌকিক ঘটনা। কিছুক্ষণ আগেও আমার ধারণা ছিল 'বিশ্বের বৃহত্তম নদীদ্বীপ' এই বিশেষণটিই মাজুলির প্রধান পরিচয়। বইটি পড়ার পর উপলব্ধি করলাম মাজুলির গায়ে 'বৃহত্তম নদীদ্বীপ' তকমাটি এক ভৌগোলিক সত্য বই আর কিছু নয়। মাজুলির আসল গুরুত্ব অন্য জায়গায়। গত পাঁচশো বছর ধরে এই নদীবেষ্টিত ৫৫২ বর্গকিলোমিটার আয়তনের ভূখণ্ডটি আসামের আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক রাজধানী রূপে বিবেচিত হয়ে আসছে। ষোড়শ শতকের সমাজ-সংস্কারক মহাপুরুষ শ্রীখণ্ড শঙ্করদেব এই মাজুলি দ্বীপ থেকেই তাঁর ভিন্নতর বৈষ্ণব ধারার প্রচার শুরু করেছিলেন। বৈষ্ণবধর্মের চর্চা এবং প্রসারের জন্য তিনি যে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানটিকে গড়ে তুলেছিলেন তা 'সত্র' নামে পরিচিতি লাভ করেছিল। প্রতিটি সত্রই হল একেকটি বৈষ্ণবীয় 'মনাস্টারি'। গত প্রায় চারশো বছর ধরে গড়ে ওঠা ৬৪টি সত্রের মধ্যে বর্তমানে টিকে রয়েছে মাত্র ২২টি সত্র। বাকি সত্রগুলিকে ব্রহ্মপুত্রের ভাঙনের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য ডিব্রুগড় বা জোরহাটের মতো শহরে স্থানান্তরিত করা হয়। বৌদ্ধমঠের মতোই ৮-১০ বছর বয়সী বালকদের সত্রে নেওয়া হয়। আজীবন ব্রহ্মচারী থেকে ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্যে কঠোর আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করতে হয় সত্রের আবাসিকদের। সত্রের বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের ধর্ম ছাড়াও অসমীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক এবং সাহিত্যের চর্চাও করতে হয়। প্রতিটি সত্রের প্রধানকে বলা হয় 'সত্রাধিকার' এবং সত্রের আবাসিকদের বলা হয় 'ভকত'। আসামের সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের মূলধারাটি বিকশিত হয়েছিল মাজুলির সত্রগুলিতে। সমগ্র আসাম জুড়েই ছড়িয়ে আছে সত্রের 'শরনিয়া' বা শিষ্যরা। তাই বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে, বিশেষ করে রাস, বিহু, জন্মাষ্টমী, শঙ্করদেবের জন্মতিথি এবং বিষ্ণুপুজোর সময় দূরদূরান্ত থেকে দলে দলে মানুষ এসে উপস্থিত হন মাজুলি দ্বীপে। উৎসব উপলক্ষে পরিবেশিত হয় নৃত্য, সঙ্গীত এবং নাটক। ইতিমধ্যেই মাজুলি থেকে একাধিক সত্র বিদেশের সাংস্কৃতিক উৎসবে অংশগ্রহণ করেছে। মাজুলি দ্বীপকে কয়েকবছর আগেই UNESCO 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট' রূপে মনোনয়ন দিয়েছেন।

৬ ডিসেম্বর, ২০০৫ সকাল সাড়ে আটটার বাসে রওনা দিলাম নিয়ামতি ঘাটের উদ্দেশে। জোরহাট থেকে নিয়ামতি ঘাটের দূরত্ব ১৩ কিলোমিটার, বাসভাড়া আট টাকা। জোরহাটের ভোগদইমুখ থেকে নিয়ামতি রোড ধরে উত্তরদিকে ছুটে চলল লোকাল বাস। বেশকিছু স্কুলের ছাত্রছাত্রীও চলেছে আমার সঙ্গেই। এরা যাচ্ছে পোটিয়াগাঁও। পোটিয়াগাঁও আসতেই বাসের বেশকিছু যাত্রী নেমে গেলেন। এরপর মাউতগাঁও আর বাহনা তিনালি হয়ে বাস পৌঁছল নিয়ামতি গ্রামে। এরপর বাসরাস্তা বলে আর কিছু নেই। মাঠের ওপর দিয়ে সব বাধা অগ্রাহ্য করে, বাস একসময় উঠে পড়ল ব্রহ্মপুত্রের উঁচু পারে তারপর গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল বালুকাময় নদীতটে।

বাস থেকে নেমে প্রথমে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলাম মহানদ ব্রহ্মপুত্রের দিকে। এই

মুহূর্তে আমার সামনে যে জলপ্রবাহটি বিভিন্ন ধারায় অতি শান্তভাবে বয়ে চলেছে এর তুলনা আর দ্বিতীয়টি নেই। ব্রহ্মপুত্র বয়ে চলে আপনমনে, নিজের খেয়াল-খুশি মতো। বর্ষায় তার অন্য রূপ। নদের উভয় তীরের বাসিন্দারা বেশ ভালো করেই জানে, তাদের বাঁচা-মরা সম্পূর্ণভাবে ব্রহ্মপুত্রের মর্জির ওপর নির্ভরশীল।

নিয়ামতি ঘাটে চোখে পড়ল বেশকিছু দোকানপাট। বেশিরভাগই খাবারের দোকান। ঘাটে একটি বড় জলযান। নোঙর করা আছে। দুটি নৌকাকে জোড়া দিয়ে বিশেষভাবে তৈরি এই জলযানের পাটাতনে স্বচ্ছন্দে একাধিক বাসের জায়গা হয়ে যাবে। 'M B Kameng' নামে এই যন্ত্রচালিত বিশাল ফেরিবোট মাজুলি দ্বীপের কমলাবাড়ি ঘাটের উদ্দেশে রওনা দিল বেলা সওয়া দশটা নাগাদ। কয়েকজন যাত্রীর দেখাদেখি আমিও বোটের ছাদে উঠে পড়েছি। বেশ কয়েকটি চাল-ডালের বস্তা থাকায় বেশ ভালোভাবেই বসা গেল। দেখতে দেখতে আমরা ব্রহ্মপুত্রের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় চলে এলাম। এখন আমার অবারিত দৃষ্টিপথে ধরা দিয়েছে ব্রহ্মপুত্রের দিগন্তবিস্তারী গতিপথ, অসংখ্য চরের মাঝ দিয়ে বয়ে চলেছে বিভিন্ন জলধারা। সঠিক পথ এবং কোথায় কত জল জানে শুধু অভিজ্ঞ সারেং। বোটের ছাদে বসে, শীতের রোদে পিঠ দিয়ে, কমলালেবু খেতে খেতে 'ব্রহ্মপুত্র দর্শন' সত্যিই এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে আমার কাছে। বোটের ছাদ এখন যাত্রীতে পূর্ণ। বলাবাহুল্য, এরা সব পুরুষ যাত্রী। বোটের পেটের ভেতর আশ্রয় নিয়েছে সপরিবার গৃহস্থ মানুষ। আমার আশপাশের যাত্রীরা ইতিমধ্যেই তাস নিয়ে মেতে উঠেছেন। অনেকের হাতে অসমীয়া দৈনিক সংবাদপত্র 'অগ্রদূত','জন্মভূমি' বা 'আমার অহম'।

চলমান জলযানের ছাদের ওপর থেকে শীতের ব্রহ্মপুত্রের বুকে জেগে ওঠা ছোট-বড় চরগুলি বেশ ভালোভাবেই দেখা যাচ্ছিল। সবকটি চর একরকম দেখতে নয়। কিছু কিছু চর শুধুই বালুকাময় আবার কয়েকটি চর লম্বা ঘাস এবং নলখাগড়ার বনে সবুজ হয়ে আছে। কয়েকটি চরে দেখলাম পরিযায়ী পাখিদের মেলা বসেছে। আমাদের বোট কাছে যেতেই হাজার বিহঙ্গ সশব্দে আকাশে ডানা মেলে দিল।

নিয়ামতি ঘাট থেকে কমলাবাড়ি ঘাট পৌঁছতে সময় লাগল এক ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট। ভাড়া দিতে হল বারো টাকা। কমলাবাড়ি ঘাটেই দাঁড়িয়ে আছে একাধিক বাস, মিনিবাস এবং টাটাসুমো। কমলাবাড়ি ফেরিঘাট থেকে কমলাবাড়ি জনপদের দূরত্ব মাত্র আড়াই কিলোমিটার। মিনিবাসে চেপে এই দূরত্বটুকু পাড়ি দেওয়ার সময় প্রথমেই চোখে পড়ল রাস্তার ধারে মিশিং উপজাতীয় মানুষদের ছোট ছোট ঘর। কাঠের খুঁটির ওপর বাঁশের মেঝে, দরমার দেওয়াল আর টিনের চাল দেওয়া মিশিংদের এই বাসস্থানকে বলা হয় 'ছাংঘর'। মাজুলির অধিবাসীদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশই মিশিং এবং দেওরি উপজাতীয় মানুষ। এরা আসলে অরুণাচলের 'আদি' উপজাতির একটি বিচ্ছিন্ন শাখা। চেহারায় হালকা মঙ্গোলীয় ছাপের জন্য মিশিংদের সহজেই চেনা যায়। এদের প্রধান উৎসব 'আলি আঈ লিগাং' অনুষ্ঠিত হয় মার্চ মাসে। বর্তমানে মিশিং সমাজে বিহু উৎসবও প্রবল উৎসাহ নিয়ে পালিত হয়। বাঁশ এবং বেতের সামগ্রী তৈরিতে মিশিংদের দক্ষতা সর্বজনবিদিত।

মিনিবাসে ওঠার সময় কন্ডাক্টারকে বলেছিলাম, আমার গন্তব্য নতুন কমলাবাড়ি

সত্র, সে যেন আমাকে ঠিক জায়গায় নামিয়ে দেয়। কন্ডাক্টার আমাকে একটি জায়গায় নামিয়ে দিয়ে উধাও হল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে উল্টোদিকে নজর দিতেই চোখে পড়ল সুন্দর এক তোরণ। ওপরে বড় বড় করে লেখা 'উত্তর কমলাবাড়ি সত্র'। মনে একটু খটকা লাগল। পথচারী দুয়েকজনের কাছে জানার চেষ্টা করলাম ঠিক জায়গায় এসেছি কিনা। এঁরা জানালেন, নতুন কমলাবাড়ি সত্র আমি বেশকিছুটা পিছনে ফেলে এসেছি। বাস কন্ডাক্টারের দোষ নেই, সে হয়তো আমার বাচনভঙ্গির দোষে 'নতুন কমলাবাড়ি'কে 'নর্থ কমলাবাড়ি' শুনেছে। ইতিমধ্যে কৌতূহলবশত কয়েকজন স্থানীয় মানুষও চলে এসেছেন। সবকিছু শোনার পর তাঁরা জানালেন, আমি ইচ্ছে করলে নর্থ কমলাবাড়ি সত্রের গেস্টহাউসেও থাকতে পারি! আমি ভেবে দেখলাম মন্দ কী! বাসরাস্তা থেকে উত্তর কমলাবাড়ি সত্র কিছুটা দূরে। মালপত্র নিয়ে হেঁটে যেতে বেশ কষ্টই হল। সত্রের প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে প্রথমেই মনে হল এ যেন এক তপোবন। ফুলবাগানের পাশ দিয়ে হেঁটে বড় নামঘরের কাছে যেতেই দেখতে পেলাম সত্রের কয়েকজন আবাসিককে। প্রত্যেকের পরণে সাদা ধুতি এবং পাঞ্জাবি। গলায় তুলসীর মালা। মাথার চুল খোঁপার আকারে বা ঝুঁটি করে বাঁধা। আমাকে দেখে একজন এগিয়ে এলেন। নমস্কার বিনিময়ের পর আমার বক্তব্য জানালাম। সত্রের তরুণ 'ভকত' নীলাম্বর দাস মন দিয়ে আমার সব কথা শোনার পর নম্রভাবে জানালেন এই সত্রের অতিথিনিবাস সম্পূর্ণ খালি পড়ে আছে, আমি স্বচ্ছন্দে সেখানে থাকতে পারি, তবে এখানে থেকে আমার মাজুলি দ্বীপ বেড়ানো হয়ে উঠবে না। এখানে থাকার চেয়ে আমার উচিত হবে কমলাবাড়ি চারিয়ালিতে গিয়ে কোনও হোটেল বা সরকারি বাংলোয় ওঠা। কমলাবাড়ি চাবিয়ালি হল মাজুলি দ্বীপের পরিবহণ ব্যবস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। নীলাম্বর দাসের পরামর্শ আমার কাছে বেশ যুক্তিপূর্ণ বলেই মনে হল। তাঁর উদ্যোগে সত্রের একটি ভ্যানরিকশা আমায় পৌঁছে দিল কমলাবাড়ি চারিয়ালিতে অবস্থিত মধুমিতা হোটেলে। হোটেলের নামটি যত শ্রুতিমধুর, থাকার ব্যবস্থা ততটাই খারাপ। একশো টাকা দিয়ে দোতলায় একটি ঘর নিলাম এবং ঘরে মালপত্র রেখেই বেরিয়ে পড়লাম মাজুলি দ্বীপের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয়টা সেরে নিতে।

হোটেল থেকে বেরিয়ে সবে রাস্তার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, একটি ছোটখাটো চেহারার যুবক আমার কাছে এসে পরিষ্কার বাংলায় প্রশ্ন করল, 'আপনি কি বাঙালি? আমি উত্তর না দিয়ে তার হাতটি আমার দুহাতের মধ্যে নিলাম।

গোপাল সাহা মাজুলি দ্বীপের মুষ্টিমেয় বাঙালিদের মধ্যে একজন। তার মাধ্যমেই পরিচিত হলাম স্থানীয় আরও এক বাঙালি ব্যবসায়ী শান্তি চ্যাটার্জির সঙ্গে। আমার মাজুলি দ্বীপে আসার উদ্দেশ্য শুধুই ভ্রমণ এই কথা জেনে শান্তিবাবু বলে উঠলেন, 'আমার সাইকেলটা নিয়ে আপনি গোপালের সঙ্গে কাছাকাছি ঘুরে আসুন।'

দুটি সাইকেল নিয়ে গোপাল আর আমি বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমেই গেলাম নতুন কমলাবাড়ি সত্র। এখানেই আজ আমার থাকার কথা ছিল। বাসরাস্তা থেকে বেশ খানিকটা দূরে নতুন কমলাবাড়ি সত্র যাওয়ার পথে চোখে পড়ল মাজুলি দ্বীপের শস্য-শ্যামল শোভা।

উঁচু মাটির রাস্তা দিয়ে সাইকেল চেপে ধীরগতিতে চলেছি। পথের ডানদিকে দেখতে পাচ্ছি কমলাবাড়ি গ্রামের ঘরবাড়ি। ধানের গোলা, সবজির বাগান আর পথের বাঁদিকে চোখে পড়ছে নতুন নতুন দৃশ্য। কোথাও জলাভূমিতে ডিঙি নৌকায় ভেসে খ্যাপলা জাল দিয়ে মাছ ধরছে মিশিং যুবক, কোথাও বা প্রাচীন জলাশয়ের কালো জলা আলো করে আছে প্রস্ফুটিত শত শত রক্তকমল।

নতুন কমলাবাড়ি সত্রের প্রবেশপথে সম্প্রতি নির্মিত হয়েছে সুন্দর একটি তোরণ। ব্রহ্মপুত্রের ভাঙনে প্রাচীন কমলাবাড়ি সত্র লুপ্ত হওয়ার সময় এইস্থানে সেই সত্রটির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়। সত্র পরিসরে ঢোকার সময় জুতো খুলতে হল। আমাদের দেখে এগিয়ে এলেন এক প্রবীণ বৈষ্ণব ভকত। গোপাল সাহার সৌজন্যে ভাষা সমস্যা অতিক্রম করে বেশকিছু তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর হল। এই সত্রের বর্তমান অধ্যক্ষ নারায়ণচন্দ্র দেবগোস্বামী তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের জন্য দেশে-বিদেশে সমাদৃত হয়েছেন। এই মুহূর্তে উনি জোরহাটে আছেন, তাই তাঁকে প্রণাম করার সৌভাগ্য হল না। নতুন কমলাবাড়ি সত্রের আবাসিকদের তৈরি বেতের চিত্রিত হাতপাখার খ্যাতি সমগ্র আসাম জুড়ে। এই সত্রের রাজঘরিয়া ছালি নৃত্যের খ্যাতিও কিছু কম নয়।

নতুন কমলাবাড়ি সত্র থেকে বেরিয়ে গোপাল আমাকে নিয়ে গেল বিবেকানন্দ কেন্দ্র বিদ্যালয়ে। এই বিদ্যালয়টি পরিচালিত হয় সুদূর কন্যাকুমারী থেকে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ সান্ডেকার মহারাষ্ট্রের মানুষ। গত কয়েকবছর ধরে তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা কঠোর পরিশ্রম করে এই বিদ্যালয়টিকে শক্ত জমির ওপর দাঁড় করিয়েছেন। সান্ডেকার অত্যন্ত উৎসাহ নিয়ে আমাকে নিয়ে গেলেন বিদ্যালয়ের নির্মীয়মাণ নতুন ভবনটি দেখাতে। নির্মীয়মাণ বিশাল স্কুলভবনটি দেখে অবাক হয়ে গেলাম। মাজুলির মতো প্রত্যন্ত এক দ্বীপে এমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে ভাবাই যায় না। কথায় কথায় সান্ডেকারের কাছে আমি শীতের সময় মাজুলিতে পরিযায়ী পাখিদের আসা নিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলাম। উনি জানালেন, আগামীকাল আমি যেন অতি অবশ্যই একবার কমলাবাড়ির অনতিদূরে অবস্থিত সাকুলি বিল ঘুরে আসি। এই বিস্তৃত জলাশয়ে শীতের সময় ২৫ থেকে ৩০ হাজার পাখি এসে জড়ো হয়। এর সঙ্গেই উনি জানিয়ে দিলেন যে মাজুলি দ্বীপের সবচেয়ে বিখ্যাত বন্যপ্রাণীটি হল শিয়াল এবং সন্ধের পরেই এদের সরব উপস্থিতি টের পাওয়া যাবে।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসার আগেই মধুমিতা হোটেলে ফিরে গেলাম। হোটেলের একতলায় মিষ্টি, চা এবং খাবারের দোকান। চায়ের টেবিলেই আলাপ হয়ে গেল রাজেন বোরার সঙ্গে। ইনি স্থানীয় ভিজিলেন্স কাউন্সিলের একজন গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী। এতদূর থেকে আমি মাজুলি দ্বীপ বেড়াতে এসেছি জেনে উনি উচ্ছ্বসিত হলেন। উনি একসময় স্বেচ্ছাসেবী সঞ্জয় ঘোষের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। সঞ্জয় ঘোষের কথা না বললে মাজুলি নিয়ে কোনও লেখাই সম্পূর্ণ হবে না। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এই উদ্যমী যুবক জনসেবার লক্ষ্য নিয়ে এসেছিলেন প্রত্যন্ত এই দ্বীপে। স্ত্রী এবং সমমনস্ক বেশকিছু উৎসাহী তরুণকে নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। এই সংস্থার উদ্যোগে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে মাজুলির হতদরিদ্র মানুষদের

জীবনে লেগেছিল অর্থনৈতিক উন্নতির ছোঁয়া। ১৯৯৭ সালের ৪ জুলাই সঞ্জয় ঘোষ আলফা জঙ্গিদের দ্বারা অপহৃত হন। পরে তাঁর মৃত্যুসংবাদ ঘোষিত হয়। সঞ্জয় ঘোষকে মাজুলিবাসী আজও বেশ ভালোভাবেই মনে রেখেছে।

রাজেন বোরা যে করিৎকর্মা মানুষ তার পরিচয় পেতে দেরি হল না। মাজুলি দ্বীপ ঘুরে দেখার এক প্রধান সমস্যা হল অপ্রতুল পরিবহণ ব্যবস্থা। গাড়ি ভাড়া করে ঘোরা যেতে পারে, তবে একজন পর্যটকের পক্ষে তা খরচসাপেক্ষ। রাজেনবাবু আমার কথা ভেবে সমস্যার সমাধান করলেন অভিনব উপায়ে। উনি তলব করতেই একজন স্বাস্থ্যবান যুবক পান চিবুতে চিবুতে এসে উপস্থিত হল আমাদের টেবিলে।

রাজেনবাবু বলে উঠলেন 'এর নাম খগেন তামুলি, এর মোটর সাইকেলে বসেই কাল আপনি মাজুলি ঘুরে বেড়াবেন'। খগেন তামুলি ক্ষীণকণ্ঠে তার কোনও অসুবিধার কথা বোধহয় বলতে চাইছিল, কিন্তু প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাজেন বোরা তাকে সেই সুযোগ না দিয়ে কপট ধমক দিলেন, 'তোর অসুবিধা কী? পেট্রলের খরচ এই দাদার থেকে নিয়ে নিবি।' এবার খগেনের মুখে হাসি ফুটল। বলাবাহুল্য, মোটর সাইকেলে চেপে মাজুলি দ্বীপ ঘুরে বেড়াবার এমন বিরল সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করলাম।

মাজুলিতে শীতের সন্ধে সাতটা মানেই অনেক রাত। তাই বাধ্য হয়েই রাজেন বোরা এবং তার সঙ্গীদের সঙ্গে আমার জমজমাট আড্ডায় ইতি টানতে হল। বিদায় নেওয়ার আগে খগেন তামুলি জানিয়ে দিল, কাল সকাল নটা নাগাদ সে আমাকে নিতে আসবে। হোটেলের ঘরে ঢুকে সবে আমি সারাদিনের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করতে বসেছি এমন সময় দূরাগত এক রব শুনে আপাদমস্তক শিহরিত হল। শিয়াল ডাকছে। শিয়ালের ডাক যে এত শ্রুতিমধুর, আগে তো কখনও মনে হয়নি। কান খাড়া করে শিয়ালদের 'হুক্কা-হুয়া' ধ্বনি শুনে গেলাম, যতক্ষণ না চোখের পাতা ভারি হয়ে এল।

সকাল সওয়া নটা নাগাদ খগেন তামুলি এসে হাজির হতেই মন আনন্দে নেচে উঠল কারণ ইতিমধ্যেই আমার জানা হয়ে গেছে যে মাজুলি দ্বীপে ঘোরাঘুরির পক্ষে সবসেরা বাহনটি হল মোটর সাইকেল। দ্বীপের রাস্তাঘাটের অবস্থা কোনওমতেই ভালো বলা যাবে না। কয়েকটি এলাকায় যেতে হলে কাঁচা রাস্তাই ভরসা। দ্বীপ ভ্রমণে বেরুবার আগে দ্রষ্টব্যস্থানগুলির একটা তালিকা তৈরি করলাম খগেনের পরামর্শে। দেখে অবাক হলাম সেও বেশ উৎসাহী সুদূর কলকাতা থেকে আসা এক পর্যটককে মাজুলি দ্বীপ ঘুরিয়ে দেখাতে।

খগেন আমাকে প্রথমেই নিয়ে গেল আউনি আটি সত্র, যা মাজুলির সবচেয়ে বড় সত্র বলে স্বীকৃত। এখানে বর্তমানে প্রায় চারশো বৈষ্ণব সন্ন্যাসী বাস করেন। এককালে এই সত্রের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন অহম রাজা জয়ধ্বজ সিংহ। আউনি আটি সত্রে বেশকিছু ঐতিহাসিক সামগ্রী দেখার সুযোগ হল, যেমন প্রাচীন খড়ম, বাদ্যযন্ত্র, অলংকার, জপের মালা, বাসনপত্র, বল্কলের ওপর লেখা পুঁথি আর হস্তশিল্পসামগ্রী। খগেনের উদ্যোগে আমার সৌভাগ্য হল সত্রাধিপতি পীতাম্বর দেবগোস্বামীকে প্রণাম করার এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলার। অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য সুপরিচিত পীতাম্বর

দেবগোস্বামী বৈষ্ণব ধর্ম এবং সত্রিয়া সংস্কৃতির ওপর একাধিক বই লিখেছেন এবং কয়েকবছর আগে নিমন্ত্রিত হয়ে চিন ঘুরে এসেছেন।

আউনি আটি সত্র থেকে বেরিয়ে পৌঁছে গেলাম সাকুলি বিল। সত্যি পাখিদের রাজ্য। বাইনোকুলার সঙ্গে থাকায় পাখি দেখার আনন্দ কয়েকগুণ বেড়ে গেল। পাখিদের মধ্যে শামুকখোল, ডুবুরি হাঁস আর হাড়গিলার সংখ্যাই বেশি। এছাড়া চোখে পড়ল সোনাজঙ্ঘা, মেটে হাঁস, সরাল, গয়ার, পানকৌড়ি, মাছরাঙা, কোচবক, পেলিক্যান, গাংচিল, কাদাখোঁচা, ফিশিং ঈগল এবং আরও কিছু পাখি যাদের চিনে উঠতে পারলাম না। সাকুলি বিলের কাছাকাছি আরও দুটি পক্ষীনিবাস আছে বলে খগেন জানাল, এদের নাম ভেরেকি বিল আর দাউকপাড়া।

সাকুলি বিল দেখে ফিরে গেলাম কমলাবাড়ি চারিয়ালি। একপ্রস্থ চা-পানের পর পৌঁছে গেলাম চার কিলোমিটার দূরবর্তী গড়মুর। জোরহাট জেলার অন্যতম মহকুমা মাজুলির মহকুমা শহর হল এই গড়মুর। মহকুমা শহর যে এত ছোট হতে পারে, ভাবাই যায় না। গড়মুরে আছে সরকারি হাসপাতাল, সার্কিট হাউস, ব্যাঙ্ক, কলেজ এবং বেশকিছু সরকারি দপ্তর। এছাড়া আছে গড়মুর সত্র। এই সত্রের আবাসিক ভকতরা উৎসবের সময় যে 'রাসলীলা' অনুষ্ঠান পরিবেশন করে, তার খ্যাতি সমস্ত আসাম জুড়ে। এখানে গড়মুর সত্রে বেশিক্ষণ না থেকে এবার আমরা মাজুলি দ্বীপের পূর্বতম প্রান্তে অবস্থিত নতুনবাজার হয়ে পৌঁছে গেলাম সোনোয়াল কাছাড়িদের গ্রামে। এদের পূর্বপুরুষরা মাজুলি সংলগ্ন সুবর্ণসিরি নদীর বালি থেকে সোনা সংগ্রহ করতেন। বর্তমানে এই জনগোষ্ঠীভুক্ত মানুষের সংখ্যা এক হাজারের কিছু বেশি। সোনোয়াল কাছাড়িদের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করতেই জানা গেল, এদের প্রধান চিন্তা এখন ব্রহ্মপুত্রের ভাঙন। যেভাবে প্রতিবছর ব্রহ্মপুত্রের জলে তলিয়ে যাচ্ছে বিঘার পর বিঘা জমি, ভবিষ্যতের কথা ভেবে এরা রীতিমতো শঙ্কিত।

আমার ইচ্ছে ছিল ব্রহ্মপুত্রের কাছে গিয়ে নদীর ভাঙন সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা করা কিন্তু খগেন আমাকে ব্রহ্মপুত্রের বদলে নিয়ে গেল খারকুটিয়া সুতি নদীর ধারে অবস্থিত ঢাকুয়াখানা ফেরিঘাটে। মাজুলি দ্বীপের দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র বহমান আর উত্তরদিকে রয়েছে লোহিত সুতি আর খারকুটিয়া সুতি। ঢাকুয়াখানায় নদী পেরুলেই নর্থ লখিমপুর যাওয়া যাবে বাসে চেপে, দূরত্ব ৮৬ কিলোমিটার। ঢাকুয়াখানা জায়গাটির প্রাকৃতিক শোভা দেখে মন চায় এখানেই শুয়ে-বসে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করে কাটিয়ে দিই দুটো দিন। স্রোতহীন নদীর জলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে পরিযায়ী পাখিদের সংসার। ফেরিঘাটে অস্থায়ী চায়ের দোকানে বসে চা খেয়ে সোজা চলে গেলাম কমলাবাড়ির অদূরে অবস্থিত দরিয়াগাঁও গ্রামে। ভাগ্যিস গিয়েছিলাম নাহলে অদেখাই থেকে যেত প্রতিবন্ধী যুবক নবীন বোরার কর্মযজ্ঞ। শৈশবে পোলিও রোগে আক্রান্ত হয়ে তার দুটি পা-ই নষ্ট হয়ে গেছে তবুও দুটি হাত দিয়ে নবীন যেসব বেতের শিল্পসামগ্রী তৈরি করছে তার খ্যাতি দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশেও পৌঁছে গেছে। প্রয়াত স্বেচ্ছাসেবী সঞ্জয় ঘোষ প্রথম নবীনের প্রতিভাকে আবিষ্কার করেন। তিনিই উদ্যোগ নিয়ে নবীনকে গুয়াহাটি পাঠিয়ে বেত এবং বাঁশের কাজের প্রশিক্ষণ নেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

খগেন তামুলির মোটর সাইকেল চেপে মাজুলি ভ্রমণের শেষ পর্যায়ে আমার গন্তব্য ছিল ব্রহ্মপুত্র তীরবর্তী দখিনপাট, কমলাবাড়ি থেকে যার দূরত্ব প্রায় ২০ কিলোমিটার। দখিনপাট সত্র 'অবশ্য দ্রষ্টব্য' বলে রাজেন বোরা গতকালই আমায় জানিয়েছিলেন। কমলাবাড়ি চারিয়ালি থেকে রওনা দেওয়ার আগে মোটর সাইকেলে তেল ভরার জন্য কাছের পেট্রলপাম্পে গিয়ে হাজির হলাম। তখনও জানতাম না যে মাজুলি ভ্রমণের সেরা অভিজ্ঞতাটি আমি লাভ করব এই পেট্রলপাম্পে দাঁড়িয়ে। মোটর সাইকেলে পাঁচ লিটার তেল ভরার পর আমি চললাম অফিসঘরে দাম মেটাতে। আমার পথরোধ করে দাঁড়াল খগেন তামুলি। কিছুতেই আমাকে পেট্রলের দাম দিতে দেবে না। অনেক চেষ্টা করে অবশেষে হার মানলাম। অনাস্বাদিতপূর্ব এক মধুর অনুভূতিতে আমার মন-প্রাণ জুড়িয়ে গেল। মাজুলি ভ্রমণ আমার সম্পূর্ণ হয়েছে। দখিনপাট যাওয়ার কী দরকার আর?

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

কলকাতা থেকে ট্রেনে বা বিমানে গুয়াহাটি। ট্রেনে গেলে সরাইঘাট এক্সপ্রেসে যাওয়ার চেষ্টা করাই ভালো। গুয়াহাটি থেকে আরামপ্রদ সুপারফাস্ট বাস পাওয়া যাবে জোরহাট যাওয়ার জন্য। বাস ছাড়ে পল্টনবাজার থেকে। জোরহাটের মারিয়ানি বাসস্ট্যান্ড থেকে নিয়ামতি ঘাটগামী সকাল সাড়ে আটটার বাস ধরলেই চলবে। নিয়মিত ঘাট থেকে মাজুলি দ্বীপের কমলাবাড়ি ঘাট যাওয়ার বিশালাকার ফেরিবোট ছাড়ে সকাল দশটায়। দুপুর তিনটে আর বিকেল চারটের সময়। সময় লাগে দেড় ঘণ্টা।
মাজুলি থেকে ইচ্ছে করলে একদিনেই অরুণাচল প্রদেশের হাপোলি বা জিরো শহরে পৌঁছে যাওয়া যায়। এরজন্য প্রথমে মাজুলি দ্বীপের লুইত ঘাটে গিয়ে দাঁড়টানা নৌকায় লোহিত নদী পার হতে হবে। ওপারেই নর্থলখিমপুর যাওয়ার বাস পাওয়া যাবে, যা সকাল আটটায় ছেড়ে বেলা এগারোটা নাগাদ নর্থ-লখিমপুরে পৌঁছবে। সেখান থেকে হাপোলি এবং জিরো যাওয়ার টাটাসুমো পাওয়া যাবে। মাজুলি ভ্রমণে বাস সার্ভিস এবং ফেরি সার্ভিস সম্পর্কিত সর্বশেষ তথ্য সংগ্রহ করা থাকলে পরে কোনও সমস্যায় পড়তে হবে না।
মাজুলি দ্বীপ বেড়িয়ে যাঁরা আবার জোরহাটে ফিরে যেতে চান তাঁরা কমলাবাড়ি ঘাট থেকে ফেরি সার্ভিস পাবেন সকাল সাড়ে সাতটা, সাড়ে আটটা এবং দুপুর দুটোয়।

কখন যাবেন

মাজুলি দ্বীপ বেড়াবার সেরা সময়টি হল নভেম্বর থেকে মার্চ মাস।

কোথায় থাকবেন

জো র হা টে

মাজুলি ভ্রমণে জোরহাট শহরে রাত্রিবাস করার প্রয়োজন হয়। কয়েকটি হোটেল:
হোটেল লিমা, এ টি রোড, (বিষ্টুরাম বড়ুয়া হলের বিপরীতে) ☎২৩২১৯৩৪
হোটেল ফ্রেন্ড, এ টি রোড ☎(০৩৭৬) ২৩২৭৬৮৫
হোটেল রেসিডেন্ট, সইকিয়া মার্কেট, থানা রোড ☎২৩২৯৭২৮
এছাড়া জোরহাট সরকারি ট্যুরিস্ট লজেও থাকা যায়। এখানে দ্বিশয্যাবিশিষ্ট ঘরভাড়া ৩৩০ টাকা থেকে শুরু। ট্যুরিস্ট লজের অবস্থান মারিয়ানি বাসস্ট্যান্ডের কাছে। ঘরের জন্য নীচের

ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবে।

আসাম ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন

জোরহাট ☎২৩২১৫৭৯

জোরহাটের এস টি ডি কোড: ০৩৭৬।

মা জু লি তে

মাজুলি দ্বীপে থাকার জন্য প্রায় প্রতিটি বৈষ্ণব সত্রের নিজস্ব অতিথিশালা আছে। এছাড়া রয়েছে সার্কিট হাউস এবং কয়েকটি সাধারণ মানের হোটেল। থাকার জন্য নীচের ঠিকানাগুলিতে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

সার্কিট হাউস,গড়মুর ☎২৭৪৪৩৯, **কৃষিভবন গেস্টহাউস**, কমলাবাড়ি ☎২৭৪৫৬০, **নতুন কমলাবাড়ি সত্র গেস্টহাউস** (☎২৭৩৩০২), **উত্তর কমলাবাড়ি সত্র গেস্টহাউস** (☎২৭৩৩৯২), **গড়মুর সত্র গেস্টহাউস** (☎২৭৪৪৬৭), **হোটেল মধুমিতা** কমলাবাড়ি চারিয়ালি ☎২৭৪৩৩৯, **হোটেল আইল্যান্ড**, গড়মুর ☎২৭৪৭১২।

মাজুলির এস টি ডি কোড: ০৩৭৭৫।

'ভ্রমণ' জানুয়ারি ২০০৬

মাজুলি থেকে অরুণাচল

আদিম অরণ্য, উত্তুঙ্গ পর্বতশ্রেণী, খরস্রোতা নদী আর বিভিন্ন উপজাতীয় মানুষদের বাসভূমি অরুণাচল প্রদেশ যাওয়ার জন্য একাধিক প্রবেশদ্বার আছে। এদের মধ্যে পর্যটকমহলে সবচেয়ে পরিচিত পথটি হল তেজপুর থেকে ভালুকপং চেকপোস্ট হয়ে বমডিলা-দিরাং-তাওয়াং যাওয়ার পথ। গতবছর ডিসেম্বর মাসে কিছুটা অভাবিত ভাবেই সুযোগ হল এক নতুন পথ ধরে অরুণাচল যাওয়ার।

আসামের জোরহাট শহর থেকে বেড়াতে গিয়েছিলাম বিশ্বের বৃহত্তম নদীদ্বীপ রূপে স্বীকৃত মাজুলি দ্বীপে। ভ্রমণসূচি অনুসারে মাজুলি ভ্রমণশেষে আমার অরুণাচল প্রদেশে যাওয়ার কথা। ধারণা ছিল মাজুলি দেখে আমাকে আবার ফিরে যেতে হবে জোরহাট। সেখান থেকে তেজপুর হয়ে পৌঁছে যাব অরুণাচলের রাজধানী ইটানগর।

ব্রহ্মপুত্রের নিয়ামতিঘাট থেকে যন্ত্রচালিত বিশাল নৌকোয় চেপে মাজুলি দ্বীপ যাওয়ার পথে আমার এক সহযাত্রীর কাছেই প্রথম জানতে পারলাম যে একটু কষ্ট স্বীকার করলে মাজুলি থেকে নর্থ লখিমপুর হয়ে পৌঁছে যাওয়া যাবে মধ্য অরুণাচলের হাপোলি বা জিরো শহরে। এই ‘একটু কষ্ট স্বীকার’ বিষয়টি নিয়ে অবশ্য খুব বেশি তথ্য পাওয়া গেল না।

মাজুলি দ্বীপের বৈচিত্রে ভরা অপার প্রাকৃতিক শোভার রসাস্বাদনের ফাঁকেই আমি মাজুলি থেকে নর্থ লখিমপুর হয়ে অরুণাচলে যাওয়ার পথের খোঁজ পেলাম। মাজুলি দ্বীপের প্রাণকেন্দ্র কমলাবাড়ি থেকে নর্থ লখিমপুরের দূরত্ব মাত্র ৪২ কিলোমিটার হলেও এই পথের দশ-বারো কিলোমিটার অংশ বছরের এই সময়টায় অনিশ্চয়তায় ভরা। প্রতিবছর বর্ষাকালে এই এলাকাটির দখল নিয়ে নেয় মহানদ ব্রহ্মপুত্র থেকে বেরিয়ে আসা অসংখ্য জলধারা। এর ফলে সড়কপথে নর্থ লখিমপুরের সঙ্গে যোগসূত্রটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বর্ষাশেষে অগভীর জলধারাগুলি শুকিয়ে এলে সড়কপথের যোগাযোগ ক্রমশ পুনঃস্থাপিত হতে থাকে। সাধারণত জানুয়ারি মাস থেকেই নর্থ লখিমপুর থেকে রওনা দিয়ে বাস সরাসরি পৌঁছে যায় মাজুলি দ্বীপে। যাওয়ার পথে বড় নৌকোর সাহায্যে বাসকে অতিক্রম করতে হয় প্রশস্ত এবং খরস্রোতা সুবনসিরি নদী।

মাজুলি-নর্থ লখিমপুর পথের অবস্থা নিয়ে সর্বশেষ তথ্য পাওয়া গেল কমলাবাড়ি চারিয়ালির প্রবীণ বিহারি চর্মকার মঙ্গতরামের কাছে। চারদিন আগেই তিনি নর্থ লখিমপুর গিয়েছিলেন দোকানের মালপত্র কিনতে। যাওয়া-আসার পথে তাকে প্রায় এক কিলোমিটার কর্দমাক্ত পথ পায়ে হেঁটে পেরোতে হয়েছিল। তার কথা শুনে

আমাকে হতাশ হতে দেখে মঙ্গতরাম অভয় দিয়ে জানালেন, এই কদিনে কাদা শুকিয়ে গিয়ে থাকলে আমাকে আর এই কষ্ট স্বীকার করতে হবে না। মঙ্গতরামের জুতোর দোকানে বসে তার কাছ থেকে আমি নর্থ লখিমপুর যাওয়ার ব্যাপারে যাবতীয় কৌতূহল মিটিয়ে নিলাম।

মাজুলি দ্বীপ থেকে অরুণাচল প্রদেশ যাওয়ার যাত্রাপথটিকে চারটি পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্বে কমলাবাড়ি থেকে আমাকে গিয়ে পৌঁছতে হবে দশ কিলোমিটার দূরবর্তী লুইতঘাট। দ্বিতীয় পর্বে লুইতঘাটে দাঁড়টানা নৌকোয় নদী পেরিয়ে নর্থ লখিমপুরগামী বাসে উঠতে হবে। তৃতীয় পর্বে বাসে চেপে নর্থ লখিমপুর যাত্রা আর শেষ পর্বে নর্থ লখিমপুর থেকে শেয়ারের টাটা সুমোয় অরুণাচল প্রবেশ।

যাত্রার প্রথম পর্বেই হোঁচট খাওয়ার উপক্রম হল। কমলাবাড়ি থেকে লুইতঘাট যাওয়ার জন্য কোনও বাস সার্ভিস নেই। যথেষ্ট সংখ্যক যাত্রী হলে সকাল সাতটা নাগাদ শেয়ারের টাটা সুমো পাওয়া যাবে, না হলে পুরো গাড়ি ভাড়া করতে হবে। শুধু তাই নয়, গাড়ি নদীর ঘাট পর্যন্ত নাও যেতে পারে, সেক্ষেত্রে অবশিষ্ট পথ পায়ে হেঁটে পাড়ি দিতে হবে। বলা বাহুল্য বেশ চিন্তা নিয়েই রাতে শুতে গেলাম।

৮ ডিসেম্বর, ২০০৫। সকাল সাড়ে ছটায় হোটেল থেকে বেরিয়ে কমলাবাড়ি চৌরাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালাম। শীতের প্রভাতে পথঘাট জনশূন্য। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন এসে হাজির হবে সেই টাটা সুমো যে আমাকে পৌঁছে দেবে লুইতঘাট। দেখতে দেখতে সাতটা বেজে গেল, সুমোর দেখা নেই। অবশেষে আশার আলো দেখা গেল। সুমোর দর্শন না মিললেও সন্ধান পাওয়া গেল এমন একজন ব্যক্তির যিনি নর্থ লখিমপুর যাবেন বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন। আলাপ হওয়ামাত্র মাঝবয়সী মারোয়াড়ি ব্যবসায়ী রাজেশ চন্দক আমার সব উৎকণ্ঠা দূর করে দিলেন। উনি জানালেন, একটু পরেই সুমো আসবে। চালকের নাম অতুল বোরা এবং গাড়ি যাবে একেবারে লুইতঘাট পর্যন্ত।

মাত্র চারজন যাত্রী নিয়ে সুমো ছাড়ল এবং মসৃণ পিচরাস্তা ধরে মুহূর্তে পৌঁছে গেল গড়মুর। কমলাবাড়ি থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত গড়মুর হল মাজুলি মহকুমার সদর। এত ছোট আকারের মহকুমা সদর ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয়টি আছে কিনা সন্দেহ। গড়মুরে আরও পাঁচজন যাত্রী উঠল রকমারি লটবহর নিয়ে। গড়মুর ছাড়িয়ে কিছুদূর যেতেই পিচরাস্তা শেষ হয়ে কাঁচা রাস্তা আরম্ভ হল। পথের দুধারে নিম্নবিত্ত মানুষদের সাধারণ ঘরবাড়ি, গোয়ালঘর, ফুল এবং সবজিবাগান চোখে পড়ছে। গড়মুর থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার যাওয়ার পর এক সময় কাঁচা রাস্তাও শেষ হল। সুমোচালক অতুল বোরা তার অভিজ্ঞ চোখ দিয়ে পথরেখা খুঁজে বার করে সতর্কভাবে এগিয়ে চলল। আমাদের বাহন অবশেষে এক কর্দমময় প্রান্তরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখেই বোঝা যায় কিছুদিন আগেও এই এলাকাটি জলমগ্ন ছিল। জল সরে যাওয়ার পর মানুষ, গবাদি পশু এবং হালকা বাহনের যাতায়াতের ফলে এমন ভয়ঙ্কর কাদার সৃষ্টি হয়েছে যে দেখে ভয় লাগে। এই কাদা পেরিয়ে আমাদের গাড়ি যাবে কী করে?

অন্য সময় হলে হয়তো যেত না কিন্তু আজ গাড়িতে রয়েছেন রাজেশ চন্দকের

মতো একজন বিশিষ্ট যাত্রী তাই কাদার ভেতর দিয়েই আমাদের সুমো এগিয়ে গেল লুইতঘাটের দিকে।

লুইতঘাটে পৌঁছে প্রথমেই মনে হল এ কোথায় এলাম। কোনও প্রকৃতিপ্রেমিক শিল্পীর কল্পনা যেন বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে।জনবসতিহীন বনস্থলির ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে লোহিত সুতি নামের জলধারা। শীতের মরসুমে স্রোতহীন নদীর নীলজলে আশ্রয় নিয়েছে দূরদূরান্ত থেকে আসা পরিযায়ী পাখির দল। বিভিন্ন প্রজাতির বিহঙ্গের ওড়াউড়ি আর ডাকাডাকিতে সরগরম হয়ে আছে গোটা এলাকা। নদীর দুপারে কয়েকটি অস্থায়ী খাবারের দোকান তৈরি হয়েছে যাত্রীদের প্রয়োজন মেটাতে। নদীর ওপারে এক শ্রীহীন ঝরঝরে বাস দাঁড়িয়ে আছে যা আমাদের নিয়ে যাবে নর্থ লখিমপুর।

দাঁড়টানা নৌকোয় নদী পেরিয়ে ওপারে যাওয়ার সময় খুব কাছ থেকে পানকৌড়ি আর গয়ার পাখিদের মাছ ধরা দেখার সুযোগ পেলাম। বাস ছাড়তে দেরি আছে দেখে নদীর ধার দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। মাথার ওপর ঘন নীল আকাশ, চরাচর সোনালি রোদে মায়াবি রূপ ধরেছে, বাতাসে হালকা হিমের পরশ; পথ চলতে কী ভালোই না লাগছিল। হাঁটতে হাঁটতে কিছুদূর যেতেই অনাবিল প্রকৃতির মাঝে যেন হারিয়ে গেলাম। চোখে পড়ছে কাছে দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা একের পর এক 'বিউটি স্পট'। এক জায়গায় দেখি ছোট্ট জলাশয় রাঙিয়ে দিয়েছে অসংখ্য লাল শালুক ফুল। কাছেই বাবলা গাছের ডালে স্থির হয়ে বসে আছে বড় মাছরাঙা, রঙের বাহার দেখে চোখ ফেরানো দায়। অদূরেই ঘাসবনে খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে এক সারস দম্পতি। আমাকে দেখে তারা যে উড়ে গেল না তাতে আমার পাখি দেখার আনন্দ দ্বিগুণ বেড়ে গেল।

বাস ছাড়ার কথা ছিল সকাল আটটায়, ছাড়ল আধঘণ্টা দেরি করে। বাসের ভেতর সব মিলিয়ে জনা পনেরো যাত্রী। এদের মধ্যে কয়েকজনকে দেখেই বোঝা যায় এরা উপজাতীয় মানুষ। লুইতঘাট থেকে রওনা দিয়ে বাস নদী-সংলগ্ন কাঁচারাস্তা ধরে কিছুদূর যাওয়ার পর বাঁদিকে ঘুরে সোজা উত্তর দিক বরাবর চলতে লাগল। সড়কপথ বলতে আমরা যা বুঝি তার সঙ্গে কোনওই মিল নেই এই রাস্তার। কালভার্ট বা সড়কসেতু তৈরি করে লাভ নেই কারণ বর্ষার জলপ্লাবন তা নষ্ট করে দেবে। তাই ছোটখাটো প্রাকৃতিক বাধা অতিক্রম করতে হলেও বাসকে অনেকটা পথ ঘুরে আবার আসল রাস্তায় ফিরতে হচ্ছে। পথের ধারে কোনও মাইলস্টোন নেই যা দেখে পরবর্তী জনপদের নাম জানা যাবে।

লুইতঘাট থেকে রওনা দেওয়ার পনেরো মিনিট পরেই বাস গিয়ে দাঁড়াল তামোলঘুলি নামের ছোট্ট গ্রামে। ঘরবাড়ি এবং গ্রামবাসীদের দেখে মনে হল এই জায়গাটি মিশিং উপজাতি অধ্যুষিত। গ্রামের অবস্থান অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায়। গ্রামকে ঘিরে থাকা নিচু জমিতে পাকা ধান কাটার কাজ চলছে। বাস আবার চলতে আরম্ভ করতেই নাকে এসে ধরা দিল নানারকম গন্ধ, যেমন জলাশয়ে জমে থাকা জলের গন্ধ, কাঁচা সুপুরির গন্ধ, গোয়াল ঘরের গন্ধ, পাকা ধানের সুগন্ধ, আর পথ সংলগ্ন বন্য উদ্ভিদের গন্ধ। গ্রামবাসীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার খণ্ড খণ্ড ছবিও চোখে

পড়ল। বাড়ির উঠোনে কাঁচা বাঁশ দিয়ে ঝুড়ি তৈরি করছে মিশিং পুরুষ। বাড়ির পোষা কুকুরটি পাশে বসে গা চুলকোচ্ছে। আরেক বাড়ির প্রাঙ্গণে দেখলাম মিশিং রমণী পা দিয়ে পাকা ধান মাড়াই করতে ব্যস্ত। পা দিয়ে ধান মাড়াই করা যায় এ তথ্য আমার জানা ছিল না। বেশ কয়েক জায়গায় দেখলাম গ্রামের কচিকাঁচার দল খেলা ভুলে বাসের চলে যাওয়া দেখছে মুগ্ধ চোখে।

তামোলঘুলি ছাড়িয়ে কিছুদূর যাবার পর হঠাৎ উত্তর দিগন্তে চোখ পড়তেই শিহরিত হলাম। ওই তো দূরে দেখা যাচ্ছে অরুণাচলের নীলাভ পর্বতপ্রাচীর। ওই পার্বত্য প্রদেশে যাব বলেই তো আজ পথে নেমেছি। গন্তব্যে পৌঁছে কী দেখব জানি না কিন্তু এই মুহূর্তে চলার পথে যে সব দৃশ্য আমার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে তা ভাষায় প্রকাশ করা সত্যি বেশ কঠিন। আমার ডানদিকে চোখে পড়ছে এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড যার মধ্যে রয়েছে জলাভূমি, একাধিক নদীখাত আর বালুকাময় উঁচু-নিচু প্রান্তর। আমার পাশে বসা রাজেশ চন্দক জানালেন, এই এলাকা দিয়েই বর্ষাকালে অরুণাচল প্রদেশ থেকে নেমে আসা সুবনসিরি নদীর বিভিন্ন শাখা প্রবাহ দক্ষিণদিকে বয়ে যায়। পথ সংলগ্ন জলাভূমি লাগোয়া তৃণভূমিতে একপাল মোষ দেখে চমকে উঠলাম। এ তো কাজিরাঙার বুনো মোষ, এখানে এল কী করে? সেই বলিষ্ঠ দেহ, সেই লোমশ কান, সেই অসিলতার মতো প্রসারিত বিশালাকার দুটি শিং। মোষের পালের ধারে-কাছে একাধিক রাখাল বালক থাকায় বুঝতে কষ্ট হল না যে এই মোষেরা বন্য নয়, গৃহপালিত তবে এরা যে কাজিরাঙার বুনো মোষেদের নিকটাত্মীয় তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

সকাল নটা নাগাদ আমাদের বাস পৌঁছে গেল খাবুলিঘাট। লুইতঘাট থেকে খাবুলিঘাটের দূরত্ব সাত কিলোমিটার। আমরা এখানে প্রবল বেগে বয়ে চলা প্রশস্ত সুবনসিরি নদী পার হব। শুধু আমরা কেন, আমাদের মতোই নৌকোয় চেপে নদী পার হবে আমাদের 'বৃদ্ধ'বাসও। অরুণাচল প্রদেশের ভৌগোলিক মানচিত্রে সুবনসিরি নদী এক বিখ্যাত নাম। এই নদীর নামেই অরুণাচলের দুটি জেলার নামকরণ হয়েছে; আপার সুবনসিরি (জেলাসদর দাপোরিজো) আর লোয়ার সুবনসিরি (জেলাসদর জিরো)।

খাবুলিঘাটে নোঙর করে থাকা **'M B Bharalu'** নামের শক্তপোক্ত জলযানে উঠতে আমাদের বা আমাদের বাসের কোনও অসুবিধা হল না বটে কিন্তু সমস্যা দেখা দিল দুটি গরুকে নিয়ে। তারা কিছুতেই নৌকোয় উঠবে না। শেষ পর্যন্ত মালিককে তাদের পায়ে ধরতে হল।

গরুদের কাণ্ডকারখানা দেখতে গিয়ে হঠাৎই আলাপ হয়ে গেল স্থানীয় এক বাঙালির সঙ্গে। পরেশ পালের নিবাস তামোলঘুলি তিনিয়ালি গ্রামে। নিজের বাড়িতেই ওষুধের দোকান আর এস টি ডি বুথ চালাচ্ছেন। আজ তিনি নর্থ লখিমপুর চলেছেন ব্যবসার প্রয়োজনে। আসামের এই প্রত্যন্ত স্থানে সুদূর পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসা এক পর্যটককে আবিষ্কার করে পরেশবাবু উচ্ছ্বসিত হলেন। খাবুলিঘাটে নদী পেরোতে মাথাপিছু পাঁচটাকা দক্ষিণা দিতে হয়। আমার সাধ্য হল না পরেশ পালের প্রবল বাধা অগ্রাহ্য করে পারানির কড়ি খালাসির হাতে তুলে দেওয়ার।

পরেশবাবুর সঙ্গে পরিচয় না ঘটলে কত কিছুই না আমার অজানা থেকে যেত। এই যেমন খাবুলিঘাটের কথা। এখানে অস্থায়ী জেটি তৈরি করে যানবাহন পারাপার করানো হয়। অতি বৃষ্টি বা দীর্ঘ অনাবৃষ্টির কারণে সুবনসিরি নদীর জলস্তর হঠাৎ বেড়ে গেলে বা কমে গেলে চারচাকার বাহনের পক্ষে নৌকোয় ওঠানামা নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। সময় বিশেষে জেটি সংস্কার করতে কয়েকদিন লেগে যায়, তখন নর্থ লখিমপুর থেকে খাবুলিঘাট পর্যন্ত বাস চলাচল করে। সুবনসিরি নদী নিয়ে একটি আকর্ষণীয় তথ্য হল অহোম রাজাদের সময় এই নদীর বালি থেকে সোনার গুড়ো সংগ্রহ করত এক উপজাতি গোষ্ঠী যারা 'সোনোয়াল কাছাড়ি' নামে পরিচিত ছিল। আজও তাদের বংশধরদের দেখা পাওয়া যায় মাজুলি দ্বীপের নতুন বাজার এলাকায়।

খাবুলিঘাট থেকে বাস ছাড়ল বেলা পৌনে দশটা নাগাদ। পরেশ পাল আর আমি এখন পাশাপাশি বসেছি, তাই তাঁর সাহায্যে নানান তথ্যে সমৃদ্ধ হতে থাকে আমার জ্ঞানের ভাণ্ডার। পথের ধারে নতুন রকম গাছ দেখে আমি প্রশ্ন করি 'এটা কী গাছ?' উত্তর পাই 'বেতগাছ'। বেতগাছের ডালপালায় ভয়ঙ্কর দর্শন কাঁটা দেখে ভয় লাগে। কথায় কথায় জানতে পারি এই বেতবনের সৌজন্যেই দুটো পয়সার মুখ দেখেছে এখানকার হতদরিদ্র উপজাতীয় মানুষরা। বিশেষ করে মিশিংদের তৈরি নানারকম বেতের সামগ্রীর বেশ ভালো চাহিদা আছে বাজারে।

খাবুলিঘাট থেকে যে পথ ধরে আমাদের বাস শম্বুকগতিতে এগিয়ে চলেছে সেটি এক নির্ভেজাল কাঁচা রাস্তা। পিচরাস্তা পাওয়া গেল পানিগাঁও গিয়ে। খাবুলিঘাট থেকে রওনা দেওয়ার চল্লিশ মিনিট পর বাস পৌঁছল পানিগাঁও। মোটামুটি বর্ধিষ্ণু জনপদ। পাকা ঘরবাড়ি, বড় বড় দোকান আর মোটরসাইকেলের ছড়াছড়ি দেখে স্থানীয় অধিবাসীদের আর্থিক স্বচ্ছলতার ইঙ্গিত মেলে। বাসের বেশিরভাগ যাত্রী এবং চালক, কন্ডাক্টর চায়ের দোকানে ঢুকল। নর্থ লখিমপুর জেলার মানচিত্র যদি পাওয়া যায়, এই আশা নিয়ে আমি ঢুকলাম এক বইপত্রের দোকানে। ম্যাপ পাওয়া গেল না বটে কিন্তু আলাপ হওয়ার পর পুস্তক বিপণীর তরুণ মালিক জয়ন্ত চেলেং তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারে আমাকে মুগ্ধ করে দিলেন। চা না খাইয়ে ছাড়লেন না এবং বিদায় দেওয়ার আগে নর্থ লখিমপুর থেকে জিরো যাওয়া নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিলেন।

পানিগাঁও থেকে ফুকনারহাট হয়ে নর্থ লখিমপুর যাওয়ার পথে পরেশ পালের কাছে আসামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর নর্থ লখিমপুর সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পারলাম। উজানি আসামের এই জেলাসদরে বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং রাজস্থান থেকে আসা মানুষের সংখ্যা প্রচুর এবং এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে এদের প্রভাব প্রতিপত্তি অসীম। শহরের বণিক সমাজের মধ্যমণি হলেন রামপ্রসাদ মহেশ্বরী যিনি শুধু একজন সফল ব্যবসায়ী মাত্রই নন, যে কোনও সমাজসেবামূলক কাজেরও তিনি উৎসাহদাতা এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

আমাদের বাস শেষপর্যন্ত নর্থ লখিমপুর শহরে প্রবেশ করল বেলা এগারোটা নাগাদ। সাইকেলরিকশা নিয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে হাজির হলাম শহরের খেলমাটি এলাকায় অবস্থিত টাটা সুমোর কাউন্টারে। নর্থ লখিমপুর থেকে অরুণাচলের

হাপোলি শহরের দূরত্ব ১৩৩ কিলোমিটার, টাটা সুমোর ভাড়া মাথাপিছু ১৫০ টাকা। সুমো ছাড়বে সাড়ে এগারোটায় তাই মধ্যাহ্নভোজন সারতে ঢুকে পড়লাম কাছের এক মারোয়াড়ি বৈষ্ণব ভোজনালয়ে। এখানে ভাত, আটার রুটি, ডাল, দুরকম তরকারি আর টক দইয়ের জন্য মূল্য দিতে হল ৩১ টাকা।

সুমো ছাড়ল ১৫ মিনিট দেরি করে। দেখতে দেখতে শহরের এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। আমরা এখন চলেছি ৫২ নম্বর জাতীয় রাজপথ ধরে, গুয়াহাটির দিকে মুখ করে। পথের বাঁদিকে ব্রহ্মপুত্র নদ বিধৌত আসামের সমতলভূমি আর ডানদিকে অরুণাচলের পার্বত্য প্রদেশ।

নর্থ লখিমপুর থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করার পর ন্যাশনাল হাইওয়ে ছেড়ে আমাদের সুমো ডানদিকের পথ ধরল। আমরা এখন সোজা অরুণাচলের পাহাড়ের দিকে চলেছি। আমাদের গাড়িতে সমতলবাসী এবং অরুণাচলের পাহাড়ি মানুষদের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। আমার পাশেই একজন আপাতানি যুবক বসে আছেন। বেশ ভালোই হিন্দি বলতে পারেন, তাই কথাবার্তা চালিয়ে যেতে কোনও সমস্যা হচ্ছে না। দেখতে দেখতে আর গল্প করতে করতেই পৌঁছে গেলাম কিমিন চেকপোস্ট। নর্থ লখিমপুর থেকে যার দূরত্ব ৩৪ কিলোমিটার। এখানে ইনারলাইন পারমিট পরীক্ষা করল অরুণাচলের পুলিশ। কিমিন ছাড়াতেই পার্বত্যভূমি আরম্ভ হল। কিছুদূর যাওয়ার পর সুমো পৌঁছে গেল এক সুন্দর উপত্যকায়। চোখে পড়ছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা উপজাতীয় মানুষদের ঘরবাড়ি, সবজি আর কমলালেবুর বাগান। আমার আপাতানি সহযাত্রী জানালেন, এই জায়গার নাম হাওয়া ক্যাম্প। সত্যি অদ্ভুত নাম। আরও একটু এগিয়ে যেতেই দেখি পথের ধারে কমলালেবু বিক্রি করছে উপজাতীয় মহিলারা। দশ টাকায় পাঁচটা বড় আকারের কমলালেবু পাওয়া যাচ্ছে। সুমোর প্রায় সব যাত্রী প্রবল উৎসাহ নিয়ে লেবু কিনলেন। তারপর সবাই মিলে যখন একযোগে লেবুর খোসা ছাড়াতে আরম্ভ করলেন, সুমোর ভেতরে যেন এক 'গন্ধ-বিস্ফোরণ' ঘটে গেল।

হাওয়া ক্যাম্প থেকে রওনা দেওয়ার পর উপত্যকা সংকীর্ণ হতে আরম্ভ করল। পথ সংলগ্ন পাহাড়ের গা ঘন জঙ্গলে ঢাকা। প্রচুর বুনো কলাগাছ চোখে পড়ছে আর চোখে পড়ছে বাঁশঝাড়। বেলা প্রায় দুটো নাগাদ সুমো পৌঁছে গেল পোটিন নামের জায়গায়। এখানে বেশ কয়েকজন যাত্রী মধ্যাহ্নভোজন সারলেন। এই জায়গাটি সম্প্রতি এক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পরিণত হয়েছে। কয়েক বছর হল এখানে থেকে দইমুখ হয়ে ইটানগর যাওয়ার নতুন একটি সড়কপথ তৈরি হয়েছে। পোটিন থেকে এই পথে ইটানগরের দূরত্ব ৭০ কিলোমিটার।

পোটিন থেকে পুনরায় যাত্রা শুরু করে কিছুক্ষণের মধ্যেই সুমো পৌঁছল পুসা নামের ছোট্ট গ্রামে। এখানেই চোখে পড়ল রাঙা নদীর প্রবাহপথ। ওপর থেকে নদীর শোভা দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। পরবর্তী জনপদ ইয়াজালি বেশ বড় লোকালয়। গাড়ির জানালা দিয়ে চোখে পড়ছে পূর্ত বিভাগের দপ্তর, অতিথি নিবাস, সরকারি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, চিকিৎসাকেন্দ্র, ব্যাঙ্ক এবং অবস্থাপন্ন লোকেদের ঘরবাড়ি। ইয়াজালি জায়গাটিকে ঘিরে আছে উত্তুঙ্গ পাহাড়ের শ্রেণী। আমাদের সুমো চড়াইপথ

ধরে এগিয়ে গিয়ে আধঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে গেল ইয়াচুলি গ্রামে। গ্রামের বেশ কয়েকটি ঘর তৈরি হয়েছে কাঠের খুঁটির ওপর বাঁশের পাটাতন আর দরমার সাহায্যে। ঘরের নীচে বাঁধা রয়েছে গৃহপালিত পশু। ইয়াচুলি ছাড়িয়ে আমাদের বাহন আরও উঁচুতে উঠতে লাগল। চড়াইপথ যেন আর শেষ হতে চায় না। অবশেষে আমরা পৌঁছে গেলাম এপথের উচ্চতম স্থানে। এই জায়গার নাম জেরম টপ। উচ্চতা ৫,৭৫৪ ফুট। এখান থেকে ওই দূরে হাপোলি শহর দেখা যাচ্ছে। জেরম টপ সত্যি এক অসাধারণ ভিউপয়েন্ট। যেখানে দাঁড়িয়ে অরুণাচলের প্রাকৃতিক শোভা দেখে মনপ্রাণ জুড়িয়ে যায়।

জেরম টপ ছাড়াতেই উতরাই পথ ধরে গাড়ি গড়গড়িয়ে নামতে লাগল। মাত্র আধঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে গেলাম হাপোলি শহরে। ঘড়িতে তখন চারটে বাজে। খবর নিয়ে জেনেছিলাম হাপোলিতে থাকার জন্য হোটেল পাইন রিজ বেশ ভালো জায়গা, তাই সুমো থেকে নেমে সোজা সেখানেই গিয়ে হাজির হলাম। একশয্যাবিশিষ্ট সুন্দর ঘর পাওয়া গেল ২৮৫ টাকা ভাড়ায়। ঘরে গিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে, এক কাপ চা খেয়ে হোটেলের বাইরে বেরতেই কনকনে ঠান্ডায় সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। জোরহাট এবং মাজুলি দ্বীপে শীত ছিল নামমাত্র, তাই হাপোলির এই তীব্র শীতে বেশ কাবু হয়ে পড়লাম। হোটেলের ঘরে ফিরে যাব কিনা ভাবছিলাম, রাস্তার ধারেই হঠাৎ জ্বলে উঠল এক অগ্নিকুণ্ড। কারা যেন বিভিন্ন দোকান থেকে খালি পিচবোর্ডের বাক্স সংগ্রহ করে আগুন জ্বালিয়েছে। দেখতে দেখতে আগুনের চারপাশে লোকজন দাঁড়িয়ে গেল। আমার আর হোটেলের ঘরে ফেরা হল না। গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে গেলাম অগ্নিকুণ্ডকে ঘিরে থাকা মানুষদের মাঝে। সকাল থেকে প্রকৃতি দেখেছি, এখন মানুষ দেখব।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

কলকাতা থেকে ট্রেনে বা বিমানে গুয়াহাটি। এরপর সড়কপথে ভ্রমণ করাই সুবিধেজনক। উত্তর-পূর্ব ভারতে দূরপাল্লার বাস সার্ভিস বেশ ভালো এবং নির্ভরযোগ্য। এছাড়া রয়েছে টাটা সুমো সার্ভিস। জোরহাট থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরবর্তী নিয়ামতিঘাট গেলে মাজুলি দ্বীপে যাবার ফেরি সার্ভিস পাওয়া যাবে। সময় লাগবে দেড়ঘণ্টা। মাজুলি থেকে হাপোলি-ইটানগর হয়ে গুয়াহাটি ফিরতে কোনও সমস্যা হবে না।

কোথায় থাকবেন

মাজুলি দ্বীপ ছাড়া অন্যান্য জায়গায় সরকারি ট্যুরিস্ট লজ এবং হোটেলের অভাব নেই। মাজুলিতে থাকার জন্য নীচেব অতিথি নিবাসগুলিতে যোগাযোগ করা যেতে পারে। **সার্কিট হাউস**, গড়মুর (☎২৭৪৪৩৯), **কৃষিভবন গেস্টহাউস**, কমলাবাড়ি (☎২৭৪৫৬০), **নতুন কমলাবাড়ি সত্র গেস্টহাউস** (☎২৭৩৩০২), **গড়মুর সত্র গেস্টহাউস** (☎২৭৪৪৬৭)।

হাপোলিতে থাকার ব্যবস্থা: অরুণাচল প্রদেশের লোয়ার সুবনসিরি জেলার সদর শহর জিরো হলেও জিরো থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরবর্তী হাপোলি শহরে থাকাই সুবিধেজনক। হাপোলিতে **পাইন রিজ হোটেলে** (☎২২৪৭২৫, ২২৪৭৫৪) থাকার ব্যবস্থা বেশ ভালো।

এছাড়া রয়েছে আরও বেশ কিছু হোটেল এবং সরকারি **সার্কিট হাউস** (☎ ২২৪২৩০)। নর্থ লখিমপুর থেকে রওনা দিলে প্রথমে পড়বে হাপোলি, তারপরে জিরো।

কখন যাবেন

এই পথে বেরিয়ে পরার অনুকূল সময় হল শীতকাল। সেরা সময় জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাস।

আসাম এবং অরুণাচল প্রদেশ বেড়াতে আগ্রহী প্রকৃতিপ্রেমিক এবং অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় পর্যটকদের কাছে সুযোগ রয়েছে এক ব্যতিক্রমী ভ্রমণসূচি অনুসরণ করার। এই ট্যুর সার্কিটে যেসব জায়গা স্থান পাবে সেগুলি হল গুয়াহাটি, কাজিরাঙা, জোরহাট, মাজুলি দ্বীপ, নর্থ লখিমপুর, হাপোলি এবং ইটানগর। অরুণাচল প্রদেশ যাবার জন্য প্রয়োজন ইনারলাইন পারমিট, সংগ্রহ করতে হবে নীচের ঠিকানায়:

Arunachal Bhawan
Block CE 109/110, Sector-I
Salt Lake City, Kolkata-700 064
☎ 23213627

মাজুলির এস টি ডি কোড: ০৩৭৭৫।
জিরোর এস টি ডি কোড: ০৩৭৮৮।

বিভিন্ন স্থানের দূরত্ব

গুয়াহাটি-কাজিরাঙা ২১৭ কিলোমিটার, কাজিরাঙা-জোরহাট ৯২ কিলোমিটার, জোরহাট-নিয়ামতিঘাট ১৩ কিলোমিটার, নিয়ামতিঘাট-কমলাবাড়িঘাট (মাজুলি) জলপথে দেড়ঘণ্টা, কমলাবাড়িঘাট-কমলাবাড়ি চারিয়ালি ২ কিলোমিটার, কমলাবাড়ি-নর্থ লখিমপুর ৪২ কিলোমিটার, নর্থ লখিমপুর-হাপোলি ১৩৩ কিলোমিটার, হাপোলি-ইটানগর ১৬২ কিলোমিটার, ইটানগর-গুয়াহাটি ৪২৯ কিলোমিটার।

'ভ্রমণ' মার্চ ২০০৬